STD : 1875

NO. 222(ZN)

সাপ!

BOOK No.
1304

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

SB
শিক্ষাভারতী
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৯৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৭ শকাব্দ
জুন, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

প্রকাশক :
শ্রীভবেশচন্দ্র বিশ্বাস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

দাম : দশ টাকা মাত্র

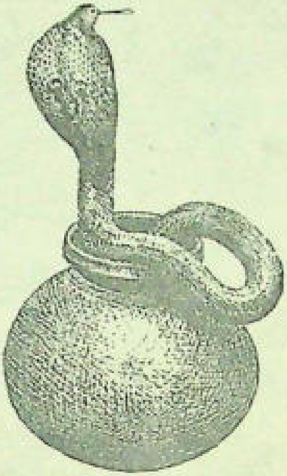

CALCUTTA
ALIPORE

SAP!

A Book on Snakes

By ABANIBHUSHAN GHOSH

৺ বাবার

স্মরণে

লেখকের

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে

সাপের কথা (নবসাক্ষরদের জন্য লিখিত
রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)

পোকা-মাকড়ের কামড় („)

ভূত ভূত নয় (ছোটদের জন্য লিখিত)

এগিয়ে চলে মানুষ („)

কলকাতাতেই জন্মেছি—সারাজীবন কাটিয়েছিও কলকাতায়। সাপ নিয়ে মাতলাম কেন—এ প্রশ্ন করেছেন অনেকেই। বিজ্ঞান চিরকালই আমার প্রিয়। তবে সাঁপ নিয়েই কেন আলোচনা শুরু করলাম তার পেছনে ছোট ইতিহাস আছে।

দিল্লি থেকে একটি ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার উদ্দেশ্য মননশীল বিদেশীদের চোখে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবোজ্জল রূপ তুলে ধরা। পত্রিকাটির কোন সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আকস্মিকভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, আর বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় সাপুড়েদের রহস্যময় কার্যকলাপ। আমাদের দেশের সাপুড়েদের স্তুতি গেয়ে তিনি লিখেছিলেন : ভারতীয় সাপুড়েরা বাঁশি বাজিয়ে সাপকে মুগ্ধ করে, বিষ-পাথর লাগিয়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ থেকে বিষ নামায়··· ইত্যাদি ইত্যাদি। পত্রিকাটির সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন : একজন বিদেশীর লেখনীতে ভারতীয় সাপুড়েদের রহস্যময় শক্তির কথা জেনে ভারতীয় সংস্কৃতির এক উচ্চ ধারণাই পাশ্চাত্যবাসীদের কল্পনায় ভেসে উঠবে। লেখাটি প'ড়ে কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিকৃত ধারণাই বিদেশীরা গ্রহণ করবে। তখন ইংরেজীতে আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি—প্রকারান্তরে উক্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রতিবাদ ক'রে। আমার পরিচিত কেউ কেউ এতে ক্ষুণ্ণ হন। তাঁরা বলেন, নিজে হাতে-কলমে পরীক্ষা যখন করেন নি, তখন সাপুড়েদের রহস্যময় শক্তির কথা অস্বীকার করেন কেমন ক'রে? কথাটা আমার মনে লাগে—এবং আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত এবং সীমাবদ্ধ সুযোগমত সাপের আলোচনায় নিবিষ্ট হলাম।

সাপ সম্বন্ধে সাধারণ্যে প্রচলিত রহস্যময় জনশ্রুতির সত্যতা যাচাই করাই প্রথম প্রথম আমার উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশে বহু সাপুড়ে ও গুনিনদের সঙ্গে মিশেছি। রুজিরোজগারের কৌশল ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ব'লে কোন কোন সাপুড়ে রাগান্বিতও হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আমি দেখলাম, এসব জনশ্রুতির অন্ধতায় সর্পদষ্ট এমন বহু লোক মারা যায় যারা সহজেই বেঁচে উঠতে পারত। তখন আমি সাপের সব দিক্‌ নিয়েই আলোচনা শুরু করলাম। তারই ফল এই গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে কোন মৌলিকতা আমি দাবি করি না; বাংলা ভাষায় সর্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সন্নিবেশিত করার প্রয়াসই পেয়েছি মাত্র। এই গ্রন্থ লিখতে আমি বহু পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য: ঘরপুরে প্রণীত 'দি স্নেকস্ অব্ ইণ্ডিয়া' (*The Snakes of India*), স্মিথ প্রণীত 'দি ফ-না অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' (*The Fauna of British India*), পোপ প্রণীত 'দি রেপটাইল ওয়ার্লড' (*The Reptile World*) এবং 'দি জার্ন্যাল অব্ বোম্বে ন্যাচার‍্যাল হিস্ট্রি সোসাইটি' (*The Journal of Bombay Natural History Society*).

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক বই লেখা সহজ নয়। বহু অপরিচিত শব্দের সম্মুখীন হতে হয়; বহু শব্দ তৈরি ক'রে নিতে হয়। আমাকেও তাই করতে হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি নি। প্রয়োজনীয় ইংরেজী প্রতিশব্দ গ্রন্থের শেষভাগে দিয়েছি।

সাপ তথা প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামকরণে দ্বিপদ নামকরণের রীতি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থে দ্বিপদ নামকরণে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়। আমাদের দেশের অনেকের মত, গ্রীক-ল্যাটিন ভাষায় লিখিত এই দ্বিপদ নামকরণ ভারতীয় ভাষাগুলিতেও গ্রহণ করা উচিত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তা' যুক্তিসহ মনে হয় নি। গ্রীক-ল্যাটিন ভাষায় লিখিত দ্বিপদ নামগুলির যদি কোনটারই কোন অর্থ না থাকত, তা' হলে হয়তো বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তা' তো নয়। অধিকাংশ দ্বিপদ নামেরই অর্থ আছে—এবং পাশ্চাত্য ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রীক-ল্যাটিন ভাষায় জ্ঞান থাকায় তাদের পক্ষে সেসব নাম বোঝার পক্ষে···স্মরণ রাখার পক্ষে সহজ হয়। কিন্তু ঐসব নাম মনে রাখতে বাধ্য করিয়ে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করি কেন? সংস্কৃত ভাষার শব্দ চয়ন ক'রে দ্বিপদ নামকরণের কয়েকটি সূত্র আমি গ্রহণ করেছি। কতদূর কৃতকার্য হয়েছি, পণ্ডিত ব্যক্তিরাই তা' বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

কোন কোন তথ্য গ্রন্থের একাধিক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার উদ্দেশে তা' করেছি। গোত্র, গণ ও প্রজাতির যেসব সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা' আনুমানিক ব'লে গণ্য করতে হবে। বিভিন্ন সাপের জেলাভিত্তিক যেসব স্থানীয় নাম দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি নাম যে সমগ্র জেলা সম্পর্কে প্রযোজ্য হবেই তা' নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে একই জেলার বিভিন্ন অংশে

একই সাপকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। উষ্ণতার পরিমাণ সেন্টিগ্রেড মাপ অনুযায়ী দিয়েছি।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয়বস্তু যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশে প্রেরণা যেমন লাভ করেছি, বিরোধী মত জানার পক্ষেও আমার সুযোগ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সহৃদয় সম্পাদকবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থ লিখতে পরিচিত-অপরিচিত বহু ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করেছেন—তথ্য সংগ্রহে পরামর্শ দিয়ে। তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার অন্যতম অগ্রজ অধ্যাপক শ্রীভবানীচরণ ঘোষ মহাশয় কোন কোন দুরূহ তথ্য আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্বনামধন্য কথাশিল্পী শ্রীপরিমল গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থ লিখতে একাধিকবার আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। সুসাহিত্যিক শ্রীঅবিনাশ সাহা মহাশয় আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, সাহায্যও করেছেন। স্বনামখ্যাত জীবনীসাহিত্যকার শ্রীমণি বাগচি মহাশয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছা স্মরণীয়। সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার ও সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়েরও শুভেচ্ছা স্মরণ করি। আর যেসব পরিচিত সতত সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের নাম: শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীসুদর্শন গোস্বামী, শ্রীঅবনীকান্ত আচার্য, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসুধীর গুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাব আয়নুল হক খাঁ। সোদরপ্রতিম শ্রীপ্রভাস-কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষের পরামর্শও উল্লেখ্য। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি ও জুওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকবৃন্দ বিভিন্ন বই সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থের ভেতরের চিত্রগুলি এঁকেছেন শ্রীপ্রেম ভট্টাচার্য। এ ব্যাপারে কোন কোন প্রকাশিত চিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আলোকচিত্রগুলি তুলেছে আমার ভাগিনেয় শ্রীবিমলকুমার সরকার। বিষ্ণুপুরে সাপের ঝাঁপান দেখতে গেছলাম; আমার অনুরোধে তথাকার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্মকর্তা-বৃন্দ ঝাঁপানের আলোকচিত্র দুটি তুলে দেন। কয়েকটি ব্লক ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে কোন কোন বিষয় দিতে পারলাম না—কোন কোন বিষয় সংক্ষেপিত করতে হয়েছে। এর জন্যে আমি নিজেই দায়ী—প্রকাশক মহাশয় নন। প্রকাশক মহাশয়কে যে পূর্ব ধারণা দিয়েছিলাম, গ্রন্থের কলেবর তার চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা

এই গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা যদি অনুভব করেন এবং আমার ক্ষীয়মাণ দৃষ্টিশক্তি যদি আমাকে সম্পূর্ণ পঙ্গু না ক'রে দেয়, তা' হলে পরবর্তী সংস্করণে এসব বিষয় আলোচনা করার বাসনা রইল।

গ্রন্থটি পূর্বেই প্রকাশিত হ'ত। ছাপাখানায় দেওয়ার পর দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়—গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যাপারে তো বটেই, ব্যক্তিগত জীবনেও। অপ্রত্যাশিত অসুবিধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে গ্রন্থটি দিনের আলো দেখতে পেল, কৃতী-পুরুষ ও প্রকাশক শ্রীভবেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের একান্ত প্রচেষ্টায় তা' সম্ভব হয়েছে। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পূর্বে বলেছি—পুনরায় বলি, এই গ্রন্থে কোন মৌলিকতার আমি দাবি করি না। ছিটেফোঁটা যদি কোন মৌলিকতা থাকে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের চোখে তা' ধরা পড়বে। বস্তুতঃ সাপের মত একটি প্রাণীর সর্বাঙ্গীণ আলোচনার যে যোগ্যতা ও সুবিধা থাকা দরকার, তা' আমার নেই। তবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যা তো খুব বেশী নেই। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে এই গ্রন্থটির যদি কোন স্থান হয়, তা' হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

এই গ্রন্থ পাঠ ক'রে কেউ যদি এর উন্নতি সাধনের উদ্দেশে কোন কথা আমাকে জানান, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা' গ্রহণ করব।

৭০।১, হাজরা রোড,
কলিকাতা-১৯

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

আকৃতি ও প্রকৃতি ১

সাপের ভয় ৩

প্রাণী-জগতে সাপের স্থান ৮

গিরগিটি-আদি প্রাণী ও সাপ ১০

সাপের দেহ ১১

দৈর্ঘ্য ও বেড় ১২

খোলস ছাড়া ১৩

দেহের বিভিন্ন অংশ ১৬

শীতস্তব্ধ : গ্রীষ্মস্তব্ধ ২০

দাঁত, বিষদাঁত ও বিষ ২৬

ইন্দ্রিয়গ্রাম ৩৬

বাঁশির সুরে সাপ কি নাচে ? ৫২

সাপ চলে কেমন ক'রে ? ৫২

সাপের ডাক ৬০

খাদ্য আহরণ ৬৩

সাপ কি বায়ুভুক্ ? ৭০

জন্ম ও মৃত্যু ৭৬

শঙ্খ-লাগা কি যৌন মিলন ? ৭৯

ডিম ও বাচ্চা ৮৩

আয়ুকাল ৮৯

বাসা ৯০

বসতি ৯১

গায়ের আঁশ ৯২

সাপ-সদৃশ প্রাণী ৯৭

বৈজ্ঞানিক নামকরণ : গোত্র-বিভাগ ১০৩

অন্ধক গোত্র ১০৯

উপান্ধক গোত্র ১১১

পট্টপুচ্ছক গোত্র ১১২

নলক গোত্র ১১৪

বিচিত্রশল্ক গোত্র ১১৫

মহোরগ গোত্র ১১৬

পন্নগ গোত্র ১১৯

ভুজঙ্গ গোত্র ১২৪

বোড়া গোত্র ১২৫

সামুদ্র-সাপ গোত্র ১২৭

ভারতের সাপ ১৩১

নাগ গণ ১৩৩

করেত গণ ১৫৬

বোড়া গণ ১৬৭

প্রবাল গণ ১৮১

দৈত্যাকার সাপ ১৮৩

বৃক্ষবাসী সাপ ২০৪

জলবাসী সাপ ২১৬

কুব্জপৃষ্ঠ সাপ ২১৮

ইঁদুরখেগো সাপ ২২৩

বৃকদন্তী সাপ ২৩৩

কুকরি-সাপ ২৩৫

মৃত্তিকা সাপ ২৩৭

ভূনিম্নবাসী সাপ ২৪০

অন্য একটি সাপ ২৪৩

ওঝা : সাপুড়ে : চিকিৎসা ২৪৫

ওঝা ও বুজরুকি ২৪৭

সাপুড়ের কারসাজি ২৬০

সাপ ধরার কৌশল ২৬৬

মারাত্মক বিষধর সাপ চেনার উপায় ২৭০

সর্প-দংশনের প্রতিবিষ ওষুধ ২৭২

সর্প-দংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা ২৭৮

গ্রন্থে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ইংরেজীতে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ ২৯১

প্রধান প্রধান সাপের নামের নির্ঘণ্ট ৩০৮

আকৃতি ও প্রকৃতি

সাপের ভয়

সাপ দেখা দূরের কথা—সাপের নাম শুনলেই আমাদের লাগে আতঙ্ক! সত্যি সাপকে মানুষ বড় ভয় করে। আদিমকাল থেকে ভয় ক'রে আসছে। বন-জঙ্গলে মানুষ একদিন বাস করত ; সেদিন থেকেই ভয় ক'রে আসছে।

সুন্দরবনের অধিবাসীরা বাঘকে বলে "বড় শিয়াল" ; বাঘ বলতে তারা আতঙ্কিত হয়। তেমনি সাধারণ মানুষ রাতে সাপ বলে না—বলে "লতা" : সাপ উচ্চারণ করতে ভয় পায়।

মানুষের মনে সাপের এত ভয় থাকায় স্বভাবতঃই আমরা ধ'রে নিই, সাপের এই ভয় মানুষের বুঝি সহজাত। একথা ঠিক নয়। সাপের ভয় মানুষের অর্জিত। জন্ম থেকেই মানুষের মনে সাপের ভয় থাকে না। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে। বিড়াল-বাচ্চা দেখলে শিশুর মনে যেমন কৌতূহল জাগে, ঠিক সেরকমই কৌতূহল জেগেছে তার মনে সাপের বাচ্চা দেখে। সে কোন ভয়ই পায় নি।

কলকাতার আশপাশের একটি ঘটনা। সন্ধ্যা সবে নেমেছে। পাঁচ-ছ' বছরের একটি ছোট মেয়ের চিৎকারে সকলে ছুটে এসেছে। কি ব্যাপার? মেয়েটি আপন মনে খেলা করছিল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা জলঢোঁড়া সাপ। দেহ বেঁকিয়ে কিলবিল ক'রে চলেছে অদ্ভুত একটা জন্তু! মেয়েটি খেয়ালে তার মাথাটা চেপে ধরে। কিন্তু মাথা চেপে ধরলে কি হবে? সাপ তার লম্বা দেহটা দিয়ে তার হাত পাকিয়ে ধরেছে। তাতেই সে ভয় পেয়েছে—আর চিৎকার করছে। বয়স্থ যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা তো সাপ দেখে আর এগতে চান না। ইতস্ততঃ করতে থাকেন।

কাছেই গাঁয়ের একজন খেজুর গাছে উঠেছিল। মেয়েটির চিৎকারে সেও ছুটে আসে। দূর থেকে দেখে সাপে হাত জড়িয়ে আছে—সহজেই চিনতে পারে জলঢোঁড়া। বিষহীন সাপ। হাতে ছিল হেঁসো। পেঁচিয়ে সাপটাকে টুকরো-টুকরো করে।

আর একটি ঘটনা। দু' পাশে দুটি পুকুর—মাঝে এক ফালি জায়গা। কয়েকটি ছেলে সেখানে খেলা করছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল চার বছরের একটি ছেলে। সেস্থানে যত ছেলে ছিল, সে ছিল সকলের ছোট। হঠাৎ ছেলেরা খেলা ছেড়ে দৌড় দিল। কি ব্যাপার? একটা সাপ—জলঢোঁড়া সাপ এদিকে ছুটে আসছে। এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে যাচ্ছে। আশ্চর্য—ছোট ছেলেটি কিন্তু সেখান থেকে নড়ল না। উলটে জলঢোঁড়ার মাথাটা ধরল সে মুঠিতে। অন্য লোকে এসে তার হাত থেকে সাপটাকে ছাড়ায়।

সাপের ভয় মানুষের যে জন্মগত নয়, এ দুটি ঘটনা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়। জলঢোঁড়া সাপ না হয়ে বিষধর গোখরো সাপ যদি পাশ দিয়ে যেত, তা' হলেও ছোট মেয়েটি ও ছোট ছেলেটি তাকে মুঠিতে চেপে ধরতে ইতস্ততঃ করত না! সাপের কোন ধারণাই তাদের নেই—এবং সাপের ভয়ও তাদের মনে নেই। অদ্ভুত একটা খেলার সামগ্রী ভেবেই সাপকে তারা ধরেছিল। ছোট মেয়েটি ও ছোট ছেলেটি—দুজনেই যে সাপের মাথাটাই চেপে ধরেছিল, তার কারণও বোঝা যায়। আত্মরক্ষার যে সাহজিক প্রবণতা প্রত্যেক জীবের আছে, তা-ই তাদের জানিয়ে দিয়েছিল, মাথাটা না চেপে ধরলে সাপটা কামড়াতে পারে। ছোট ছেলেটি ভয় পেল না। অথচ ঐস্থানের অন্যান্য ছেলে সাপ আসতে দেখে ভয় পেল-কেন? এর কারণও স্পষ্ট। তাদের বয়স হয়েছিল; সাপের একটা ধারণা তাদের জন্মেছিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে বাসা বেঁধেছিল সাপের ভয়।

সাপের ভয় জন্মগত না হলেও সাপ দেখলে আমরা আঁতকে উঠি কেন? এই শহুরে সভ্যতার দিনেও। কারণ নিশ্চয়ই আছে।

বাঘ-সিংহকে আমরা ভয় করি। শক্তিশালী প্রাণী তারা; হিংস্রও বটে। কিন্তু এদের বসতি আমরা জানি; সে জায়গা এড়িয়ে চললেই হ'ল। আক্রমণ করতে এলেও তাদের দেখতে পাওয়া যায়, পালাবার সুযোগ থাকে। হাতিয়ার থাকলে হয়তো লড়াই করাও চলে। কিন্তু সাপ—বিষধর সাপ! এর গতি তো সর্বত্র! মানুষের বাসস্থানেও ঢুকে থাকে। সুতরাং একে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। তার ওপর এর আক্রমণ ঘটে অলক্ষ্যে। কখন কোথা থেকে লুকিয়ে এসে দেবে একটি ছোবল; আর তাতেই খরচের খাতায় নামটা হয়ে যাবে লেখা! বাঘ-সিংহের মত গায়ে শক্তি নেই বটে। কিন্তু মুখের একটু মাত্র স্পর্শ, তাতে মানুষের জীবন-দীপ চিরতরে যায় নিবে!

সাপের অত্যধিক ভয়ের আরও কারণ—আমাদের অজ্ঞতা। সাপের সঠিক জ্ঞান আমাদের খুব কমই। সাপের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে! সেসব গল্প শুনলে মনে হয়, সাপ যেন কোন এক রহস্যলোকের জীব—অলৌকিক ক্ষমতাশালী—অশেষ বুদ্ধিমান! মানুষের সাধ্য নেই তার সঙ্গে পেরে ওঠে! বলা বাহুল্য, এসব গল্প গল্পই।

আমরা মনে করি, বিষধর সাপ বুঝি বড় খল, সব সময়ই হিংস্র মনোভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কখন কোন মানুষের দেহে বিষদাঁত ফুটিয়ে আনন্দ পাবে! একথা ঠিক নয়। সাধারণতঃ সাপ মানুষকে এড়িয়ে চলে; নিতান্ত বেকায়দায় পড়লে আত্মরক্ষাতেই সে মানুষকে দংশন করতে উদ্যত হয়।

আবার সব সাপ তো বিষধর নয়। অধিকাংশ সাপই

বিষহীন। তারা আমাদের ক্ষতি করে না—বরং উপকারই করে। অগণিত ইঁদুর-আদি তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণী ঢেমনা সাপ না খেয়ে ফেললে তাদের উৎপাতে আমাদের শস্যহানি হ'ত খুবই। চাষীরা এজন্যে ঢেমনা-আদি বিষহীন সাপকে মারে না। ক্ষেতে থাকলে বাঞ্ছনীয় মনে করে। ঢেমনা বড় সাপ, তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণী সহজেই গিলতে পারে। ঘরচিতি, হেলে ইত্যাদি ছোট বিষহীন সাপ। ক্ষতিকারক অনেক পোকা-মাকড় খেয়ে এরা মানুষের উপকার করে। অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন চাষী ক্ষেতে হীরক-ময়ালও রাখে। হীরক-ময়াল অবশ্য আমাদের দেশের ময়ালের মত অত বড় হয় না।

তা' ছাড়া বিষধর হলেই সে সাপের দংশনে মানুষ মারা যায় না। নির্দিষ্ট পরিমাণের বিষ মানুষের দেহের রক্তে মিশলে তবেই তার মৃত্যু হতে পারে, তার চেয়ে কম হলে হবে না। সব বিষধর সাপের মুখে এই পরিমাণের বিষ থাকে না। লাউডগা বিষধর সাপ, কিন্তু লাউডগার দংশনে মানুষ মারা যায় না।

সাপের সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজও নয়। খুব কম লোকই "যমের দূত" সাপ নিয়ে গবেষণা করতে এগিয়ে আসেন। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে সাপ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় নি। জঙ্গলবাসী মানুষ সাপ সম্বন্ধে যেসব ধারণা পোষণ করত, সেগুলি তাই আজও আমরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। নিরক্ষর বেদেদের মুখে গল্প শুনে আমরা সাপের ধারণা লাভ করি। সাপের কিছুটা জ্ঞান বেদেদের থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যা' বলে, অধিকাংশ কথাই বাজে। হয় তারা না জেনে বলে, না হয় অর্থ উপার্জনের লোভে মিথ্যা বলে। সাপের ধারণা করতে বেদেদের কথা কি রকম আমরা ধ্রুবসত্য ব'লে ধ'রে নিই, তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। শাঁখামুটি একটি বিষধর সাপ। অনেকে এ সাপকে "দুমুখো সাপ" ব'লে অভিহিত করেন। তাঁদের ধারণা, এ সাপের সামনের দিকে একটি মুখ

আর পেছনের দিকে আর একটি মুখ। বেদেরা তাই ব'লে থাকে—এবং তাঁরাও তাই বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসীদের দলে বেশ শিক্ষিত লোকও আছেন। দু' প্রান্তে দুটি মুখ থাকা সাপের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগে না। সাপটিকে তাঁরা কোনদিন ভালভাবে লক্ষ ক'রেও দেখেন না। আসলে শাঁখামুটির দুটি মুখ নেই। এ সাপের লেজের শেষ অংশ সামান্য থেবড়া, তাই লেজের দিক্‌টাকেও হঠাৎ মুখ ব'লে ভুল হয়।

কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক গল্প করছিলেন, আমি যেখানে থাকি সেখানে দুমুখো সাপ প্রায়ই দেখা যায়। অনেক দুমুখো সাপ আমি নিজেই মেরেছি। তাঁকে যখন বললাম, আপনি দুমুখো সাপ বলছেন কেন? ওর সত্যই তো আর দুটি মুখ নেই। এত সাপ মেরেছেন, একটা নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন না কেন? ভদ্রলোক তো প্রথমে খুব বিস্মিত হলেন, দুমুখো সাপের দুটি মুখ নেই শুনে। দুটি মুখ ব'লে কেন ভুল হয়, তার ব্যাখ্যা শোনার পর অবশ্য তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। এখন মনে হচ্ছে লেজটা একটু থেবড়া, আর সেজন্যেই মুখ ব'লে ভুল হয়। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে এবং সুশিক্ষিত। বেদেদের মুখে শোনা সাপের কথা আমরা কিরকম নিশ্চিত সত্য ব'লে ধ'রে নিই! সেহিসাবে সাপকে ভয়ও করছি—শ্রদ্ধাও করছি।

মজার ব্যাপার এই, সাপ সম্বন্ধে আমরা ঠিকমত জানতেও বোধ হয় চাই না। কেউ অজ্ঞতা দেখিয়ে দিলেও তা' গ্রহণ করতে অনিচ্ছার প্রবণতাই যেন দেখা যায়। গালগল্পগুলি বয়ে নিয়ে বেড়াই আনন্দে, আর অপরকে ব'লে মজলিস জমাই।

মানুষের মনের কোণে লুকিয়ে আছে রহস্যপ্রিয়তা। সাপকেও কেন্দ্র ক'রে বুঝি এই রহস্যপ্রিয়তা চরিতার্থতা পেতে চায়। ভূতের গল্প শুনতে আমরা ভালবাসি—রহস্যের খোরাক মেটে। সাপের

গল্পও আমরা শুনতে চাই ঐ একই কারণে। তবে ভূতের আজগুবী গল্পে আমাদের জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু সাপ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। সাপ—বিষধর সাপ মানুষের মৃত্যুরও কারণ হয়। সুতরাং তার সম্বন্ধে আজগুবী জ্ঞান সত্যই বিপজ্জনক।

শিশুর মনে সাপের ভয় না থাকলেও বয়স্কদের মুখে সাপের ভয়াবহ সব কাহিনী শুনে এবং সাপ সম্পর্কে তাঁদের আচরণ দেখে তার মনে সৃষ্টি হয় সে ভয়। সে ভয় আমাদের জীবনে এমনই ওতপ্রোত হয়ে থাকে যে, আমরা মনে করি জন্মকাল থেকেই আমরা সাপকে ভয় ক'রে আসছি। বলা বাহুল্য, সেকথা ঠিক নয়।

প্রাণী-জগতে সাপের স্থান

আমাদের এই পৃথিবীর বুকে কত রকমেরই না প্রাণী দেখা যায়। তাদের বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি স্মরণ রাখার সুবিধার্থে বিজ্ঞানীরা সমস্ত প্রাণীকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন—তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হিসাবে দলে দলে সাজিয়েছেন। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে—দেহ-কাঠামোর গঠন, আকার, আয়তন ও রং।

বিজ্ঞানীরা সমস্ত প্রাণীকে প্রথমে দুটি বড় দলে ভাগ করেছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় এই দলকে বলা হয় পর্ব। পর্ব দুটি হ'ল—(১) মেরুদণ্ডী প্রাণী আর (২) অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিরদাঁড়া যেসব প্রাণীর আছে, তাদের বলা হয়েছে মেরুদণ্ডী প্রাণী। আর যেসব প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই তাদের বলা হয়েছে অমেরুদণ্ডী প্রাণী। সাপের মেরুদণ্ড আছে; সাপ মেরুদণ্ডী প্রাণী।

সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীকে আবার পাঁচটি দলে ভাগ করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় এই দলকে বলা হয় শ্রেণী। পাঁচটি শ্রেণী হ'ল ঃ (১) মাছ (২) উভচর (৩) সরীসৃপ (৪) পাখি ও (৫) স্তন্যপ। সাপ সরীসৃপ শ্রেণীতে পড়ে।

সরীসৃপকে আবার পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে ঃ (১) কুমির-আদি (২) তুঁয়াতারা (৩) কচ্ছপ-আদি (৪) গিরগিটি-আদি ও (৫) সাপ। *

যারা পেটে অথবা খুব ছোট ছোট পায়ের ওপর ভর দিয়ে চলে, তাদেরই সাধারণভাবে আমরা সরীসৃপ বলি। সাপ পেটে ভর দিয়ে চলে, তাই সাপ সরীসৃপ। গিরগিটি-টিকটিকিও সরীসৃপ। পায়ে ভর দিয়ে চললেও সে পা খুব ছোট। কচ্ছপ-কাছিম কুমির-আদি প্রাণীও সরীসৃপ। তুয়াতারা বড় গিরগিটি আকারের সরীসৃপ। এর পিঠের ও লেজের মাঝ বরাবর সারিভাবে ছোট ছোট কাঁটা উঁচু হয়ে থাকে। নিউজীল্যাণ্ডে এ জীবের বাস। একে স্ফেনোডনও বলে।

অন্যান্য প্রাণীর সম্পর্কে সাপের স্থান কোথায়, নীচে তালিকাকারে দেখানো হ'ল ঃ

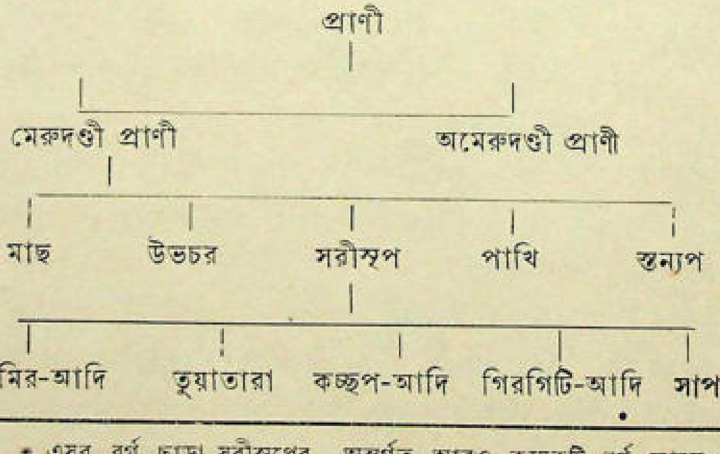

* এসব বর্গ ছাড়া সরীসৃপের অন্তর্গত আরও কয়েকটি বর্গ আছে; বর্তমানে জীবন্ত অবস্থায় সেগুলির অস্তিত্ব নেই।

গিরগিটি-আদি প্রাণী ও সাপ

সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বর্গগুলির মধ্যে সাপ বর্গের সঙ্গে গিরগিটি-আদি বর্গের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ গিরগিটি-আদি বর্গ থেকেই অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুযায়ী সাপ বর্গের উদ্ভব হয়েছে। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে হলে গিরগিটি-আদি বর্গের গোসাপ থেকেই সাপের উদ্ভব হয়েছে ব'লে মনে হয়।

গিরগিটি-আদি প্রাণীর সঙ্গে সাপের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সাদৃশ্য থাকায় কোন কোন গিরগিটি-আদি প্রাণীকে সাপ ব'লে ভুল হয়। আমাদের দেশে তো কোন কোন গিরগিটি-আদি প্রাণী সাধারণ্যে সাপ ব'লেই গণ্য হয়ে আসছে। গোসাপ নামটার দিকেই লক্ষ দিলে বোঝা যাবে। সাধারণ অজ্ঞ লোকে সাপের মধ্যেই গোসাপকে ধরে। আসলে গোসাপ তো সাপ নয়।

কোন কোন গিরগিটি-আদি প্রাণীর সাপের মত পা-ও থাকে না। তাদের সাপ ব'লে ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। সেজন্যে সাপ বর্গ ও গিরগিটি-আদি বর্গের পার্থক্য আমাদের জেনে রাখা দরকার। প্রধান প্রধান পার্থক্য এখানে বলা হ'ল:

(ক) অধিকাংশ গিরগিটি-আদি প্রাণীর চোখের পাতা আছে—এ পাতা সে নাড়াচাড়া করতে পারে; সাপের চোখে সেরকম কোন পাতা নেই।

(খ) প্রায় সব গিরগিটি-আদি প্রাণীর বহিঃকর্ণ আছে; সাপের বহিঃকর্ণ নেই।

(গ) গিরগিটি-আদি প্রাণীর চোয়াল শক্ত ক'রে আটকানো; কিন্তু সাপের নীচের দু'পাশের চোয়াল সম্মুখভাগে সংকোচন-প্রসারণশীল স্নায়ু দ্বারা আলগাভাবে আটকানো।

সাপের যে কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গেছে, তা' থেকে জানা যায়, পাঁচ কোটি বছর আগেও পৃথিবীর বুকে সাপের অস্তিত্ব ছিল।

এই কঙ্কাল দেখে আরও জানা যায় যে, সেসব সাপ আজকালকার বড় বড় সাপের চেয়ে খুব বেশী বড় ছিল না।

সাপের দেহ

সাপের দেহ অদ্ভুত ধরনের। হাত নেই, পা নেই ; অন্য কোন প্রত্যঙ্গও দেহ থেকে বেরিয়ে থাকে না। গড়নে সাপের দেহ বেলনাকার বা অর্ধ-বেলনাকার। একগাছি মোটা দড়ি যেন! অন্ধকারে বা দূরে একগাছি মোটা দড়ি প'ড়ে আছে, সাপ ব'লে অনেক সময় ভুল হয় ; সাপের দেহের সঙ্গে মোটা দড়ির মিল এতই বেশী। এমন ঘটনাও ঘটেছে, দূরে অন্ধকারে সাপ নিশ্চলভাবে শুয়ে আছে ; দড়ি ভেবে লোকে তাকে তুলে নিয়েছে, অথবা তুলতে গেছে—আর তার ছোবলে গেছে মারা!

আজ সাপের ক্রিয়াশীল প্রত্যঙ্গ নেই ; কিন্তু সাপের পূর্বপুরুষদের সেসব প্রত্যঙ্গ ছিল। সেইহিসাবে সাপকে অপজাত প্রাণী বলা যায়।

তা' ব'লে সাপ নিতান্ত নীচু স্তরের প্রাণী নয়। সাপের দেহ-গঠনে বেশ জটিলতা দেখা যায়।

আমাদের অনেকের ধারণা আছে, সাপের গা বুঝি পাঁকাল মাছের মত হড়হড়ে বা ভিজে। এ কথা ঠিক নয়। সাপের গা বেশ শুকনো ও পরিষ্কার।

রং : সাপের দেহ সর্বত্র আঁশ দিয়ে ঢাকা। সাপ দেখতে হয় নানা রঙের। এই রং আসলে কিন্তু সাপের আঁশের রং। আঁশের যে রং, সাপকে দেখতে হয় সেরকমই। কোন কোন সাপ দেখলে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয় ; এমনই বিচিত্র রঙে চিত্রিত তার রূপ!

প্রাণীদের যে গায়ের রং, তা' কিন্তু তাদের খেয়াল-খুশী মত হয় না ; একটা উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন

প্রাণীর পরিবেশ অনুযায়ী তার দেহের রং হয়ে থাকে। অর্থাৎ এমন রং হয়ে থাকে যাতে ঐ পরিবেশের মধ্যে তাকে চট্ ক'রে দেখা না যায়। সাপের বেলায়ও এ কথা খাটে। লাউডগা বৃক্ষবাসী সাপ, গাছের ওপর বাস করে। সবুজ রঙের। গাছের সবুজ রঙের সঙ্গে তার গায়ের রং মিশে থাকে; চট্ ক'রে তার উপস্থিতি ধরা যায় না। এতে সাপটার হয় দু' ধরনের সুবিধা। সাপটার কোন শত্রু তো তাকে সহজে চিনে বের করতে পারে না; সেজন্যে তাকে আক্রমণও করতে পারে না। আর সাপটার নিজের শিকারও তাকে দেখতে পায় না; ফলে শিকারের অলক্ষ্যে তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে কামড়ে ধরা সাপটার পক্ষে সহজ হয়।

কোন কোন প্রাণীর রং হয় খুব জ্বলজ্বলে। এদের আত্মরক্ষার জোর হাতিয়ার থাকে। জ্বলজ্বলে রঙের দ্বারা এরা শত্রুকে সাবধান ক'রে দেয়—আমাকে ত্যক্ত ক'র না, মরতে হবে। শাঁখামুটির রং খুব উজ্জ্বল। খুব নিরীহ প্রকৃতির সাপ; সাধারণতঃ এক জায়গায় প'ড়ে থাকে। কিন্তু এর বিষ খুব তীব্র। জ্বলজ্বলে রঙের দ্বারা শত্রুকে জানিয়ে দেয়—আমি নিরীহ বটে, তবুও আমার কাছে এস না, মৃত্যু অবধারিত।

আবার কোন কোন প্রাণী আছে যারা তাদের ধরনের অন্য সবল প্রাণীর গায়ের রং অনুকরণ করে। কোন কোন বিষহীন সাপ আছে যারা কোন বিষধর সাপের রং গ্রহণ করে—যাতে শত্রু তাকেও বিষধর ব'লে ভুল করে।

দৈর্ঘ্য ও বেড়

সাপের দেহের দৈর্ঘ্যের তারতম্য বেশী লক্ষিত হয়। খুব ছোট সাপ আছে—আবার খুব বড় সাপও আছে। ময়াল সাপ লম্বায় ৯ মীটরের ওপর হয়। কোন কোন ময়ালের বেড় সুপারি-গাছের

বেড়ের চেয়েও বেশী হয়। দক্ষিণ-আমেরিকার অ্যানাকণ্ডা সাপের বেড় আরও বেশী—৭৫ সেন্টিমীটর পর্যন্তও হয়। অপরপক্ষে পুঁয়ে সাপ ৪ সেন্টিমীটরও হয়; মাত্র ৪ মিলিমীটর সরু ছিদ্র দিয়ে এ সাপ যেতে পারে।

সাপের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় ভুল করি। কোন সাপ দেখলেই বলি আমরা, মস্ত বড় একটা সাপ দেখে এলাম। সাপের প্রকৃত দৈর্ঘ্যের অতিরঞ্জন করার প্রবণতা আমাদের মনেই রয়ে গেছে। এই অতিরঞ্জন ঘটে আমাদের অজানতে। সাপ সম্বন্ধে অত্যধিক ভীতিই এর কারণ।

অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সাপ দ্রুত ছুটে যায় যখন তখন তার দেহ দ্রুত পাশাপাশি কিলবিল করতে থাকে। এই গতির জন্যে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। সাপটি যত বড়, তার চেয়ে অনেক বড় ব'লে মনে হয়। দু' মীটরের ছোট একটি সাপ ঘাসের মধ্যে ছুটে যাওয়ার সময় তিন মীটর দীর্ঘ ব'লে ভুল হলে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মরা সাপের গায়ের চামড়া মেপে সে সাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় ঠিক নির্ভুল হয় না। চামড়া ছাড়াবার সময় কিছুটা বিস্তৃত হয়। অর্থের লোভে প্রতারকেরা কখনও কখনও জোচ্চোরিও করে, চামড়া টেনে বড় করে। দুটি সাপের চামড়া একসঙ্গে সেলাই ক'রে একটি সাপের চামড়া ব'লে চালাতেও চেষ্টা করে।

খোলস ছাড়া

সাপের গায়ের আঁশগুলি ঢাকা থাকে একটা সাদা স্বচ্ছ পাতলা চামড়া দিয়ে। সাপ মাঝে মাঝে তার দেহের এই পাতলা চামড়া সম্পূর্ণরূপে বদলে নেয়। অর্থাৎ পুরোতন চামড়াটি প'ড়ে গিয়ে সেস্থানে জন্মায় সম্পূর্ণ নতুন চামড়া। একেই বলি আমরা সাপের খোলস ছাড়া বা নির্মোচন।

খোলস ছাড়ার সময় পুরোতন চামড়াটি ঘোলাটে সাদা দেখায়। সেই সময়ে সাপ হয়ে পড়ে নির্জীব—চোখেও ভাল দেখতে পায় না। কিছু খায় না। খোলস ছাড়ছে এমন সাপ দেখলেই বোঝা যায়। কাউকে আর সে কথা ব'লে দিতে হয় না।

খোলস ছাড়ার সপ্তাহ দুই আগে সাপের চোখ ঘোলাটে হতে থাকে, সে আর ভাল দেখতে পায় না। তখন সে এমন একটি

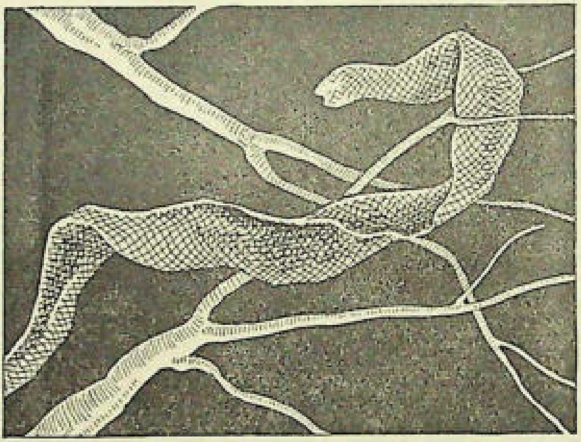

খোলস

জায়গা খুঁজে নেয় যা' স্যাঁতসেঁতে অথচ যেখানে থাকলে তার শত্রুরা তাকে সহজে দেখতে পাবে না। ফোঁপড়া গাছের গুঁড়ি এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল আশ্রয়। এরূপ স্থান না পেলে সাপ লতাপাতা জঞ্জালের তলায় আশ্রয় নেয়। এখানে সাপের পুরোতন চামড়া একটু নরম হয়। তার চোখের ঘোলাটে ভাবও একটু কেটে যায়। তখন সাপ খোলস ছাড়তে আরম্ভ করে।

সাপ খোলস ছাড়ে সম্পূর্ণ আস্ত। এই আস্ত খোলস সাপ তার গা থেকে কেমন ক'রে খুলে ফেলে বলি।

পুরোতন চামড়ার নীচে নতুন চামড়া গ'ড়ে উঠলে পুরোতন

চামড়া আপনা থেকে আলগা হ'তে থাকে। পুরোতন চামড়া —যাকে বলি আমরা খোলস—ফেলে দেওয়ার সময় এলে সাপ তার চিবুক কোন পাথরে, গাছের ডালে বা ঐ ধরনের কোন খসখসে জিনিসে ঘষতে থাকে—যতক্ষণ না ঐ জায়গাটার খোলস ছিঁড়ে যায়। খুব সতর্কতার সঙ্গেই সাপ এ কাজ করে। ঐ ছেঁড়া জায়গা দিয়ে সাপ তখন তার মাথা ধীরে ধীরে বের ক'রে নেয়। তারপর খোলসটাকে খসখসে জিনিসটার ওপর চেপে ধ'রে অথবা দুটি ডালের ফাঁকে নিজেকে আটকে দেহটাকে টেনে বের ক'রে নিয়ে আসে। সাপ বেরিয়ে আসার সময় খোলসের ভেতরের দিক্‌টা চ'লে আসে বাইরে, আর বাইরের দিক্‌টা চ'লে যায় ভেতরে—পা থেকে মোজা খুললে যেমন হয়। মাঠে-ঘাটে আমরা যে খোলস প'ড়ে থাকতে দেখি, আসলে তার বাইরের দিক্‌টা হ'ল ভেতরের দিক্ আর ভেতরের দিক্‌টা হ'ল বাইরের দিক্।

গায়ের খোলস খুলতে সাপের কখনও কখনও আধ ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

কোন খোলস পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, সাপের দেহের প্রায় প্রত্যেক অংশের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাতে। খোলস দেখে অনেক সময় ব'লে দেওয়া যায়, কোন জাতের সাপের খোলস।

সাপ এত সুষ্ঠুভাবে খোলস ছাড়ে যাতে তার দেহে সামান্যও আঘাত লাগে না—একটি আঁশেরও ক্ষতি হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সাপ খোলস ছাড়ে কেন?

খোলস ছাড়ার মর্মার্থ যদি আমরা ধরি—অর্থাৎ পুরোতন চামড়ার স্থানে নতুন চামড়া জন্মানোর কথা আমরা বুঝি, তা' হ'লে বলতে হবে সাপ কেন—সব প্রাণীই -এমন কি মানুষ পর্যন্ত খোলস ছাড়ে। সব প্রাণীর গায়ের চামড়া বাইরের জিনিসপত্রের

ও আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়—এবং তার স্থানে জন্মায় নতুন চামড়া।

তবে কোন কোন প্রাণীর খোলস ছাড়ার বিশেষত্ব আছে—এবং সেজন্যে তাদের খোলস ছাড়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাপের (ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাণীর) বিশেষত্ব হ'ল, তারা আস্ত খোলস ছাড়ে। আস্ত খোলস স্বভাবতঃই আমাদের চোখে পড়ে।

বাইরের জিনিসপত্রের ও আবহাওয়ার সংস্পর্শে গায়ের ওপরের চামড়া ধীরে ধীরে নষ্ট হয়, অন্যান্য প্রাণীর মত সাপের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। কিন্তু সাপের খোলস ছাড়ার প্রধান কারণ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সাপের দেহের ক্রমাগত ও অত্যধিক বৃদ্ধি। সাপের দেহ বাড়ে, কিন্তু তার দেহের চামড়া বাড়ে না। সেজন্যে সাপকে তার গোটা পুরোতন চামড়া ফেলে দিতে হয়। সেখানে জন্মায় সম্পূর্ণ নতুন চামড়া।

খোলস যেন সাপের পরনের কাপড়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট কাপড় সে ফেলে দেয়, আর বড় কাপড় পরে।

বছরে সাপ তিন-চার বার খোলস ছাড়ে। কম-বয়সের সাপেরা আরও ঘন ঘন খোলস ছাড়ে। তখন তাদের দেহ তাড়াতাড়ি বাড়ে কিনা।

খোলস ছাড়ার পর সাপ আবার ফিরে পায় তার তৎপরতা। সে যেন নতুন জীবন পায়। তার গা বেশ উজ্জ্বল দেখায়।

সাপ আস্ত খোলস ছাড়ে বটে। কিন্তু সামুদ্র-সাপের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সামুদ্র-সাপ আস্ত খোলস ছাড়ে না, টুকরো-টুকরো খোলস ছাড়ে।

দেহের বিভিন্ন অংশ

সাপের দেহের তিনটি অংশ—মাথা, ধড় আর লেজ। প্রথমে মাথা, তারপর ধড়, তারপর লেজ।

সাপের মাথার পেছন অংশটা সাপের ঘাড়। কোন কোন সাপের মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থল—ঘাড় বেশ সহজেই বোঝা যায়। যেমন, চন্দ্রবোড়ার। সংযোগস্থল বেশ সরু। কিন্তু অধিকাংশ সাপের এই সংযোগস্থল তেমন স্পষ্ট নয়। ঘাড় মাথা ও ধড়ের সঙ্গে একইভাবে মিশে থাকে। গোখরোর ঘাড় এ ধরনের।

সাপের ধড়ের ওপরকার সমস্ত অংশটাই হ'ল তার পিঠ। লম্বা পিঠ; সেজন্যে সংস্কৃত ভাষায় সাপের একটা নাম "দীর্ঘপৃষ্ঠ"।

আর সাপের লেজ? সাপের দেহের পেটের শেষ অংশে একটা ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র সাপের বাহ্যে-প্রস্রাবের দ্বার—জননেন্দ্রিয়ের দ্বারও বটে। একে বলা হয় অবসারণী-ছিদ্র। অবসারণী-ছিদ্রের পরের অংশটাই হ'ল সাপের লেজ। সাপের দেহের ওপর দেখে তার লেজ বোঝা সহজ নয়। অভিজ্ঞতার দরকার। লেজ ঠিক করতে হলে সাপকে চিত ক'রে নেওয়াই সুবিধাজনক। সাপের লেজ মোটা থেকে সরু হয়ে যায়। এটাই রীতি। কিন্তু সব সাপের এরকম হয় না। এমন সাপ আছে যার লেজের শেষ অংশ ভোঁতা—মোটা। সামুদ্র-সাপের লেজ নৌকোর হালের মত চেপটা।

সাপের দেহের নিম্নাংশের গলা থেকে অবসারণী-ছিদ্র পর্যন্ত সমস্ত অংশটাই তার পেট। সাপের এই পেটকে অনেক সময় আমরা সাপের বুক ব'লে থাকি। কিন্তু সাপের উরঃফলক অর্থাৎ বুকের হাড় নেই।

শিরদাঁড়া: আমাদের মত সাপের শিরদাঁড়াও একটি গোটা অস্থি নয়। অনেক ছোট ছোট অস্থি দিয়ে শিরদাঁড়া তৈরী। আমাদের দেহের শিরদাঁড়ার ছোট ছোট অস্থির সংখ্যা মাত্র তেত্রিশ। কিন্তু সাপের শিরদাঁড়ার এই অস্থির সংখ্যা অনেক বেশী—এমন কি চার শ'র ওপরও হতে পারে। এই অস্থিকে কশেরুকা বলে।

সাপ তার দেহকে যেদিকে খুশী বাঁকাতে পারে—তার

শিরদাঁড়া এমনই নমনীয়। ছোট্ট গর্ত—তার মধ্যেই সাপ অনেক

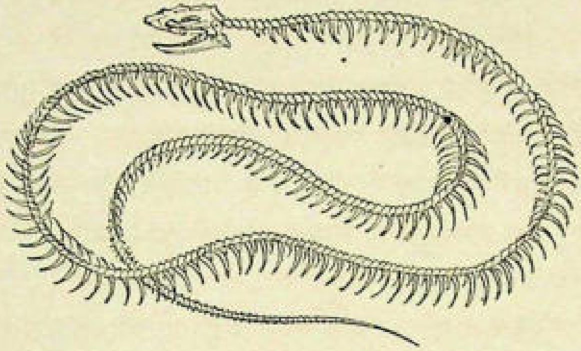

শিরদাঁড়া

সময় তার লম্বা দেহকে কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে।

সাপ যে তার দেহকে এদিক্-ওদিক্ করতে পারে, প্রধানতঃ তার শিরদাঁড়া অনেকগুলি অস্থি দিয়ে তৈরী ব'লে। সাপের শিরদাঁড়ার একটি কশেরুকা আর একটির সঙ্গে কোটরসন্ধি অনুযায়ী আটকানো। যে সন্ধিতে একটি অস্থির কোটরে একটি বর্তুলাকার অস্থি থেকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সবদিকে ঘুরতে পারে, তাকেই কোটরসন্ধি বলে। কশেরুকাগুলির

কোটরসন্ধি

প্রত্যেক সন্ধি দেহ বাঁকাতে সাপকে সাহায্য করে। সাপের শিরদাঁড়া একটি গোটা অস্থি দিয়ে যদি তৈরী হ'ত, তা' হলে তার দেহ সর্বদা হয়ে থাকত সোজা একটি লাঠির মত।

সাপ তার দেহকে এদিক্-ওদিক্ বাঁকাতে পারে। কিন্তু এই বাঁকানোর যে একটা সীমা আছে, সেবিষয়ে একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। একটা মরা সাপকে সোজা লম্বা ক'রে শুয়ে দিয়ে তার লেজ ধ'রে সামান্য পাক দিলে দেখা যাবে, সামান্য পাকেই সাপটার সারা দেহ ঘুরে যাচ্ছে। কশেরুকাগুলি তেমন-তেমন

আলগাভাবে আটকানো থাকলে লেজের সামান্য পাকেই সমস্ত দেহটা ঘুরে যেত না।

একটা কথা চলতি আছে। সাপ পিছু নিলে কোন একদিকে ছুটতে নেই। পুনঃ পুনঃ দিক্ পরিবর্তন করতে হয়। তাতে সাপ অনেক পেছনে প'ড়ে যাবে, আর পালানোর সুবিধা হবে।

কথাটায় কিছুটা সত্য আছে। সাপ তার দেহকে সহজে বাঁকাতে পারলেও সম্পূর্ণ দিক্ পরিবর্তন করতে তার সময় লাগে। কারণ তো বলেছি আগে।

পঞ্জরাস্থি অর্থাৎ পাঁজরার হাড় যাকে বলি, সাপের দেহে তা' আছে। সাপের শিরদাঁড়ার প্রত্যেকটি কশেরুকার দু' পাশ থেকে বেরিয়েছে একটি ক'রে দুটি ছোট সরু হাড়। সেগুলিই সাপের পঞ্জরাস্থি। আমাদের দেহে পঞ্জরাস্থিগুলি দু' পাশ থেকে এসে যুক্ত হয়েছে উরঃফলকের সঙ্গে। সাপের উরঃফলক নেই। তার পঞ্জরাস্থিগুলি এসে যুক্ত হয়েছে তার পেটের আঁশে।

সাপের পরিপাক-যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যেন একটা নল—মুখ থেকে

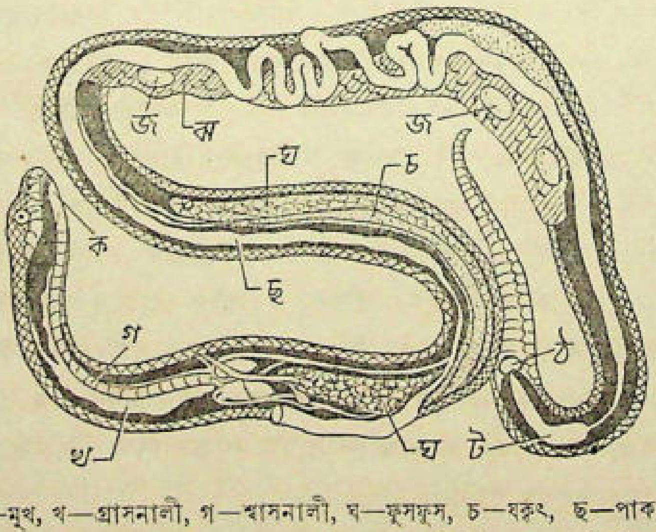

ক—মুখ, খ—গ্রাসনালী, গ—শ্বাসনালী, ঘ—ফুসফুস, চ—যকৃৎ, ছ—পাকস্থলী ও অন্ত্র, জ—ডিম, ঝ—অণ্ডাশয়, ট—অবসারণী, ঠ—অবসারণী-ছিদ্র

আরম্ভ হ'য়ে অবসারণী-ছিদ্র পর্যন্ত চ'লে গেছে। দেহের ভেতরকার অন্যান্য প্রায় সব যন্ত্র লম্বা আকারের। সাপের ফুসফুসের বাঁ অংশটি ডান অংশের চেয়ে সাধারণতঃ ছোট বা অপুষ্ট হয়— কখন কখন আদৌ থাকে না। সামুদ্র-সাপের ফুসফুস অপেক্ষাকৃত বড়। আমাদের হৃৎপিণ্ডে চারটি কক্ষ রয়েছে ; সাপের হৃৎপিণ্ডে রয়েছে তিনটি কক্ষ।

শীতস্তব্ধ ঃ গ্রীষ্মস্তব্ধ

তাপগ্রাহী প্রাণী ঃ আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় দেহের উষ্ণতা-অনুষ্ণতা হিসাবে প্রাণীদের দুই অংশে বিভক্ত করা হয়— তাপমোচী প্রাণী ও তাপগ্রাহী প্রাণী।

যেসব প্রাণীর দেহের উষ্ণতা আবহাওয়ার তাপের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করে না, তাদের তাপমোচী প্রাণী বলে। আবহাওয়ার তাপ যা-ই হ'ক, কি গ্রীষ্মকালে কি শীতকালে—তাদের দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় সদা-সর্বদা নির্দিষ্ট পরিমিত উষ্ণতা থাকে। মানুষ তথা সমস্ত স্তন্যপ তাপমোচী প্রাণী। মানুষের দেহে এই পরিমিত উষ্ণতা কম-বেশী ৩৭°। আবহাওয়া ঠাণ্ডাই হ'ক আর গরমই হ'ক, এই উষ্ণতা নির্দিষ্টভাবে মানুষের দেহে থাকে। পাখিও তাপমোচী প্রাণী। পাখির দেহের এই উষ্ণতা কম-বেশী ৪৩°। তাপমোচী প্রাণীদের দেহের অভ্যন্তরে এমন যন্ত্র-ব্যবস্থা আছে যা' তাদের দেহের উষ্ণতাকে সকল প্রকার আবহাওয়ায় সুনির্দিষ্ট ক'রে রাখে। খুব ঠাণ্ডায় আমাদের দেহ যখন কাঁপতে থাকে অথবা খুব গরমে আমাদের দেহ থেকে যখন ঘাম বেরতে থাকে, তখন এই আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছে ব'লে আমরা বুঝতে পারি।

আর যেসব প্রাণীর দেহের উষ্ণতা আবহাওয়ার তাপের সঙ্গে

সঙ্গে ওঠানামা করে, তাদের বলে তাপগ্রাহী প্রাণী। আবহাওয়ার তাপ বেশী হলে তাপগ্রাহী প্রাণীরও দেহের উষ্ণতা বেড়ে ওঠে। আর আবহাওয়ার তাপ ক'মে গেলে তাপগ্রাহী প্রাণীরও দেহের উষ্ণতা ক'মে যায়। এককথায় বলা যায়, তাপগ্রাহী প্রাণীরা বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন করতে অর্থাৎ খাপ খাওয়াতে শেখে নি। অভিব্যক্তির দিক্ দিয়ে তাপমোচী প্রাণী উচু স্তরের—তারা আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন করতে সমর্থ হয়েছে। আবহাওয়ার তাপের সঙ্গে সঙ্গে সাপের তথা সমস্ত সরীসৃপের দেহের উষ্ণতা কমে ও বাড়ে। সেজন্যে সাপকে বলে তাপগ্রাহী প্রাণী। উষ্ণতা সুনির্দিষ্ট ক'রে রাখার উদ্দেশে সাপের দেহে আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্র-ব্যবস্থা নেই।

আবহাওয়ার যে তাপ, সাপের দেহের উষ্ণতা তার কাছাকাছি থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, আবহাওয়ার চেয়ে সাপের দেহের উষ্ণতা সামান্য বেশী থাকে।

সাধারণভাবে আমরা তাপমোচী প্রাণীকে উষ্ণশোণিত প্রাণী এবং তাপগ্রাহী প্রাণীকে অনুষ্ণশোণিত প্রাণী বলি। এই অভিজ্ঞান চলনসই হলেও বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল নয়।

সাপের দৃষ্টান্তই ধরা যাক। সাপের দেহের স্পর্শে মানুষ দেখেছিল, তার দেহের উষ্ণতার তুলনায় সাপের গা ঠাণ্ডা। সেজন্যে সাপকে সে অনুষ্ণশোণিত প্রাণী বলেছিল। কিন্তু আবহাওয়ার অত্যধিক তাপের সময় অর্থাৎ ৩৭° তাপের চেয়ে বেশী হলে সাপের গা স্পর্শ করলে সেই মানুষই দেখবে, সাপের গা তার গায়ের চেয়ে গরম। সুতরাং সাপকে অনুষ্ণশোণিত প্রাণী বলা সব সময়ে ঠিক হয় না।

আবহাওয়ার তাপের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাপের দেহের উষ্ণতা মানুষের চেয়ে বেশী হতে পারে—যদিও সাধারণভাবে তার দেহের উষ্ণতা মানুষের দেহের উষ্ণতার চেয়ে কম থাকে। মোটামুটিভাবে

বলা যায়, বছরের অধিকাংশ সময় আবহাওয়ার উষ্ণতা মানুষের দেহের পরিমিত তাপ ৩৭° ডিগ্রীর কম থাকে।

অপরপক্ষে পাখি ও স্তন্যপের দেহ স্পর্শে মানুষ দেখেছিল, তাদের গা গরম। সেজন্যে সে তাদের উষ্ণশোণিত প্রাণী বলেছিল। কিন্তু কোন কোন স্তন্যপের দেহের উষ্ণতা আবহাওয়ার চেয়ে কখনও কখনও কম থাকে। সুতরাং তাদের সব সময়ে উষ্ণশোণিত প্রাণী বলা ঠিক হয় না।

তাপগ্রাহী প্রাণী হওয়ায় অত্যধিক গরম বা ঠাণ্ডার সময় সাপের বেশ অসুবিধা হয়। আবহাওয়ার তাপ ১৫° ডিগ্রী থেকে ৪০° ডিগ্রীর মধ্যে থাকলে সাপ সহজ স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় থাকে। ৪০° ডিগ্রীর কিছু বেশী হলে অথবা ০° ডিগ্রীর সামান্য কম হলে সাপের পক্ষে সে আবহাওয়া অল্পক্ষণের জন্যেই সহ্য করা সম্ভব।

আশপাশের বাতাসের তাপ অনুযায়ী সাপের তথা তাপগ্রাহী প্রাণীর দেহের উষ্ণতা হয়, একথা বললাম। সাধারণভাবে একথা সত্য হলেও এর মধ্যে কিন্তু আছে। যে আধারের ওপর সাপ থাকে, তার তাপ বাতাসের তাপের চেয়ে বেশী বা কম হলে সাপের দেহের উষ্ণতা সেই আধারের তাপ অনুযায়ী হয়। শৃঙ্গী ঝুমঝুমি মরুভূমির সাপ। এ সাপকে রৌদ্রতপ্ত বালির ওপর ৬ মিনিট রেখে দেওয়া হয়েছিল। সাপটি ম'রে যায়—যদিও বাতাসের তাপ তখন ছিল মাত্র ৩৬°।

আবদ্ধ কাচপাত্রে একটি ঘরচিতি সাপ রেখেছিলাম। শীতকাল ছিল। সেজন্যে ভোরের দিকে সামান্য রোদে কাচপাত্রটি রেখে দিয়েছিলাম। ভেতরে সাপটা বেশ ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছিল। কি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সাপটার কথা মনে ছিল না। এসে দেখি রোদে-তপ্ত কাচপাত্রে বেচারী ম'রে প'ড়ে আছে।

সাপ দৈহিক সক্রিয়তার দ্বারা তার দেহের উষ্ণতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা; সাপ তখন সূর্যতাপে গিয়ে রোদ পোহায়। মাটির তাপ খুব বেশী; সাপ তখন মাত্র রাত্রিতে বিচরণ করে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গাঁয়ের ফাঁকা মাঠে সাপ শুয়ে থাকে। আমরা ঠাট্টা ক'রে বলি, সাপ ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছে! কিন্তু সত্যিই সে গায়ে হাওয়া লাগায়। মরুভূমির সাপ দুপুরের রোদে গাছের ছায়ায় অথবা অনুরূপ কোন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়; সন্ধ্যা নামলে শিকারের খোঁজে প্রবৃত্ত হয়।

শীতস্তম্ভঃ অত্যধিক গরমে সাপ ছটফট করে বেড়ায়, আর অত্যধিক শীতে সাপ মড়ার মত এমন কোনস্থানে প'ড়ে থাকে —যেখানে সে খানিকটা গরম পেতে পারে। প্রায় সারা শীতকালটা সাপ কিছু না খেয়ে অনড় অবস্থায় প'ড়ে থাকে। একেই সাপের শীতস্তম্ভ বা শীতনিদ্রা বলে।

বলা বাহুল্য, যেসব দেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত, সেসব দেশেই সাপের শীতনিদ্রার বিশেষ দরকার হয়। সেসব দেশে শীত প্রবল। কিন্তু যেসব দেশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত —বিশেষ ক'রে যেসব দেশ নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী, সেসব দেশে বেশী সময়ের জন্যে সাপের শীতনিদ্রার প্রয়োজন হয় না। শীতকালেও সেখানে গরম থাকে। ঐ সব দেশে প্রায় সারা বছরই সাপকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

কোন জন্তু-জানোয়ারের গর্ত, পাহাড়ের গহ্বর বা ফাটল, গাছপালার শিকড়ের গর্ত, নদী-পুকুরের তলায় মাটির নীচে— এরকম যে কোন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অথচ নিরাপদ স্থানে সাপ শীতকালটা কাটায়। একটি শাঁখামুটিকে অগভীর জলাশয়ে শীতনিদ্রায় থাকতে দেখেছিলাম। বলা বাহুল্য, শীতকালে বাইরের আবহাওয়ার তুলনায় জলাশয়ের মধ্যের তাপ বেশী

থাকে। সাপ এককভাবে শীতনিদ্রায় যেতে পারে—কখনও দলবদ্ধভাবে—শত শত একত্র হয়েও শীতনিদ্রায় যায়। বিভিন্ন জাতের সাপও অনেক সময় একসঙ্গে শীতকালটা কাটাতে পারে। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক আছে এমনও সব সাপকে একসঙ্গে থাকতে দেখা যায়, অথচ পরস্পরকে কেউ আঘাত করে না। পরস্পর পরস্পরের দেহ জড়িয়ে থাকায় তাদের দেহের আর্দ্রতা কম নষ্ট হয়। কোন কোন সাপ আছে যারা প্রতি বছর এক জায়গাতেই শীতনিদ্রা যায়। দু' তিন কিলোমীটর দূর থেকে প্রতি বছর একই জায়গা চিনে সাপ কেমন ক'রে আসে, তা' এক দুর্বোধ্য ব্যাপার।

মাটির ওপর যে তাপ, মাটির নীচে তার চেয়ে বেশী তাপ থাকে। এজন্যে অনেক সাপ মাটির নীচে গর্তে শীতনিদ্রা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাপ মাটির নীচে আধ মীটর যেতে পারলেই যথেষ্ট। শীতপ্রধান দেশে—যেখানে বরফ পড়ে সাপকে অবশ্য মাটির নীচে অন্ততঃ এক মীটর যেতে হয়।

দেশবিশেষে সাপ কয়েক সপ্তাহ থেকে ন' মাস পর্যন্ত শীতনিদ্রায় যেতে পারে। এ নির্ভর করে সে দেশের জলবায়ুর ওপর। যে দেশ যত ঠাণ্ডা সে দেশে সাপকে তত বেশী কাল ধ'রে শীতনিদ্রায় থাকতে হয়। আমাদের দেশে নভেম্বরের মাঝামাঝি শীত পড়তে আরম্ভ করলেই সাপ গর্তে আস্তানা নেয়। ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি অথবা মার্চের গোড়ার দিকে সাপ গর্ত থেকে বেরতে আরম্ভ করে।

বাংলাদেশে শীতঋতুতেও কোন কোন সাপকে ঘুরেফিরে বেড়াতে দেখা যায়। এদের অধিকাংশই ঘরচিতি, জলঢোঁড়া ইত্যাদি সাপ। শীতঋতুতে কলকাতা শহরে পুরান পাকা বাড়ির দোতলায় দেয়ালের ফাটলে ফাটলে একাধিক ঘরচিতিকে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে দেখেছি।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এক শিকারী আসামের জঙ্গলে পরিভ্রমণ করতে করতে একত্রে ৫টি ময়াল সাপ দেখতে পান! এ

দৃশ্য কদাচিৎ ঘটে। বন্য অবস্থায় একটি ময়াল দেখলেই মানুষ সেকথা স্মৃতির কোঠায় তুলে রাখে। আর এক্ষেত্রে তো পাঁচ-পাঁচটি ময়াল সাপ ! বলা বাহুল্য, তারা শীতনিদ্রায় একত্র হয়েছিল।

শীতনিদ্রার সময় সাপের সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া একরকম বন্ধ হয়ে যায়, সেজন্যে তার শক্তি বিশেষ ব্যয় হয় না। শীতনিদ্রার শেষে—তার দেহের ওজনও বিশেষ কমে না। শীতনিদ্রাকে বেদেরা সাপের "মুদ" নেওয়া বলে। শীতনিদ্রার মাসখানেক আগে থেকে সাপের গতিবিধি ক'মে যায়, চলাফেরা আর তত করে না। শীতনিদ্রার প্রয়োজনে দেহে মেদ জমায়। বেদেরা বলে, মুদ নেওয়ার আগে সাপ গায়ে শিশির নেয়; সেজন্যে খোলা মাঠে নিথর হয়ে প'ড়ে থাকে।

অত্যধিক ঠাণ্ডাই শীতনিদ্রার কারণ ব'লে মনে করা হলেও অন্যান্য কারণও বর্তমান। যেমন, ঐ সময়ে ঐ প্রাণীর যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যের অভাব ঘটে।

শীতনিদ্রার সময় সাপ কোন কারণে আশ্রয়ের বাইরে আসতে বাধ্য হলে তখন সে খুব নিস্তেজ থাকে।

গ্রীষ্মস্তম্ভ ঃ শীতস্তম্ভের মত অত্যধিক গরমে কোন কোন সাপ গ্রীষ্মস্তম্ভ বা গ্রীষ্মনিদ্রায় থাকে। তারা গ্রীষ্মঋতুর শেষাংশে গ্রীষ্মনিদ্রায় যায়। ঠিক গরম এর কারণ নয়—জলাভাবই এর কারণ। গরমের সময় জলাভাব ঘটলে এই সব সাপ কাদার তলায় চ'লে যায়—এবং সেখানে মড়ার মত প'ড়ে থাকে। বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে আবার বের হয়।

জলঢোঁড়া, হেলে প্রভৃতি সাপ ভারতের শীতপ্রধান উত্তরাংশে শীতনিদ্রায় যায় এবং গ্রীষ্মপ্রধান দক্ষিণাংশে গ্রীষ্মনিদ্রায় যায়।

কি শীতনিদ্রায় কি গ্রীষ্মনিদ্রায়—সাপ এমন স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করে, যেস্থানে ঐ সাপ মাত্র অত্যধিক শীত বা গরম থেকে রক্ষা পায় না, যেখানে যথেষ্ট আর্দ্রতাও থাকে।

দাঁত, বিষদাঁত ও বিষ

সাপের মুখে ছ' সারি দাঁত থাকে—ওপরের চোয়ালে চার সারি, নীচের চোয়ালে ছ' সারি। সব সাপের মুখেই যে ছ' সারি দাঁত থাকে তা' নয়, তবে অধিকাংশ সাপের থাকে। ওপরের

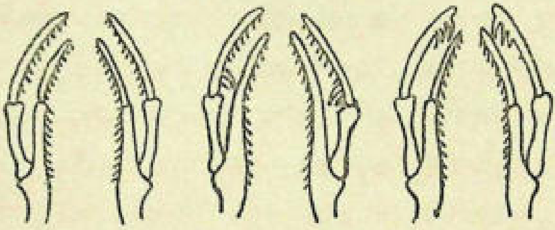

ওপরের চার সারি দাঁত

বিষহীন পশ্চাৎ-বিষদন্তী সম্মুখ-বিষদন্তী

চার সারি দাঁতের ছ' সারি থাকে ওপরের চোয়ালের প্রান্ত বরাবর; এদের বলা হয় জম্ভিকা-দাঁত। আর ছ' সারি থাকে তালুর ওপর; এদের বলা হয় তালব-দাঁত। নীচের ছ' সারি দাঁত থাকে নীচের চোয়ালের প্রান্ত বরাবর; এদের চিবুক-দাঁত বলা হয়।

মাত্র কয়েকটি সাপ ব্যতীত কোন সাপের ওপরের চোয়ালের ঠিক সম্মুখভাগে দাঁত থাকে না। নীচের চোয়ালের ঠিক সম্মুখভাগে কোন সাপেরই দাঁত থাকে না।

সাপের দাঁত ঠিক কোটরে প্রোথিত থাকে না—পোষক অস্থির অংশীভূত হয়ে সংলগ্ন থাকে মাত্র। দাঁত কোন কারণে ভেঙে গেলে পোষক অস্থিতে কোন গহ্বর দেখা যায় না—চাকলা উঠে গেছে ব'লে মনে হয়। শিকার তেমন বড় বা শক্তিশালী হলে সাপের দাঁত কখনও কখনও ভেঙে যায়।

বিষহীন সাপের মুখাবয়ব

সাপের দাঁত মুখের ভেতর দিকে সামান্য বাঁকানো। সাপের যে দাঁত তা' শিকারকে চর্বণের জন্যে নয়, মুখ থেকে যাতে সে পালাতে না পারে--তাকে আটকে রাখার জন্যে। সাপ তার খাদ্য গিলে খায়।

বিষদাঁত : সাপের সাধারণ দাঁত নিরেট ও ছোট—বিষহীন সাপের যেমন দাঁত হয়ে থাকে। কোন কোন নিরেট দাঁত বিষদাঁতের মত লম্বা ও সূচালো হয়, কিন্তু কোনটিতে বিষদাঁতের মত খাঁজ বা খাত থাকে না। কোন কোন সাপের জম্ভিকা-দাঁতই অভিব্যক্তি-ক্রমে বিষদাঁতে পরিণত হয়েছে। বিষদাঁত সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় ও সূচালো হয়।

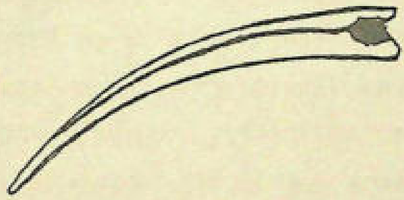

বিষদাঁত

সাপের বিষদাঁত দু' ধরনের—খাঁজকাটা ও খাতগর্ভ। খাঁজকাটা বিষদাঁতে দাঁতের ওপর একটা খাঁজ কাটা থাকে ; বিষগ্রন্থি থেকে বিষ এসে এই খাঁজ বয়ে শিকারের দেহে ঢোকে। খাতগর্ভ বিষদাঁতে দাঁতের ভেতর দিয়ে একটি খাত থাকে ; বিষগ্রন্থি থেকে বিষ এসে এই খাতের ভেতর দিয়ে শিকারের দেহে ঢোকে। খাতগর্ভ বিষদাঁত যেন সূচীপ্রয়োগের পিচকারি ; পিচকারির মতই বিষদাঁতের ভেতর দিয়ে নালা থাকে।

সমস্ত আদিম সাপের এবং ঢেমনা-ঘরচিতি-আদি পন্নগ গোত্রের অধিকাংশ সাপের সব দাঁত নিরেট অর্থাৎ তারা বিষহীন। কি বিষধর কি বিষহীন—তালব-দাঁত ও চিবুক-দাঁত সব সাপেরই নিরেট। জম্ভিকা-দাঁতই পরিবর্তিত হয়েছে বিষদাঁতে।

খাঁজকাটা বিষদাঁত দু' পাশে জম্ভিকা-দাঁতের ভেতরের শেষ দুটি বা তিনটি দাঁতে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যান্য দাঁতের তুলনায় এই

খাঁজকাটা দাঁতগুলি সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে খাঁজকাটা বিষদাঁত ও অবশিষ্ট জম্ভিকা-দাঁতের মধ্যস্থানে একটু ফাঁক থাকে। যেসব সাপের এই ধরনের বিষদাঁত থাকে, তাদের বলা হয় পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। লাউডগা, কালনাগিনী ইত্যাদি পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। শিকারের দেহে ঠিকমত বিষ ঢোকাতে হলে পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপকে দংশনের সময় কখনও কখনও "চর্বণ"ও করতে হয়; নতুবা শিকার বিষে জর্জরিত হয় না।

খাঁজকাটা বিষদাঁত মুখের ভেতরের দিকে থাকে, আর খাতগর্ভ বিষদাঁত থাকে মুখের সামনে দিকে। যেসব সাপের খাতগর্ভ বিষদাঁত থাকে, এজন্যে তাদের বলা হয় সম্মুখ-বিষদন্তী সাপ। জম্ভিকা-দাঁত সারির সম্মুখভাগের নিরেট দাঁতের পরিবর্তে এই বিষদাঁত থাকে। গোখরো-কালাচ-আদি ভুজঙ্গ গোত্র, সামুদ্র-সাপ গোত্র এবং চন্দ্রবোড়া-আদি বোড়া গোত্রের সব সাপ সম্মুখ-বিষদন্তী সাপ। বিষধর বা মারাত্মক বিষধর সাপ বলতে সাধারণতঃ আমরা সম্মুখ-বিষদন্তী সাপদেরই বুঝে থাকি। সম্মুখ-বিষদন্তী সাপের বিষদাঁত আমাদের মুখের ওপর পাটির ছেদকদন্তের অনুরূপ। বিষদাঁত পাতলা ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে—মাত্র বিষদাঁতের অগ্রভাগ বেরিয়ে থাকে। সামান্য কারণে বিষদাঁত যাতে ভেঙে না যায়, তাই প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। এই ঝিল্লী মাঢ়িরই প্রবর্ধিত অংশ।

খাতগর্ভ বিষদাঁত আবার দু' ধরনের হয়।

ভুজঙ্গ ও সামুদ্র-সাপ গোত্রের বিষদাঁত নিশ্চল এবং সর্বদা খাড়াভাবে থাকে। অপরপক্ষে বোড়া গোত্রের বিষদাঁত নিশ্চল নয় এবং সর্বদা খাড়া অবস্থায়ও থাকে না। এই বিষদাঁত মুখের তালুতে আড়াআড়িভাবে আধ-শোয়া থাকে। দংশনের সময় সাপ মুখ খুললে এই বিষদাঁত স্বতঃই খাড়া হয়ে ওঠে। বোড়ার

বিষদাঁত ভুজঙ্গ ও সামুদ্র-সাপের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় হয়। এই বিষদাঁত নিশ্চল হলে ঐ সাপের পক্ষে মুখ বন্ধ করাই সম্ভব হ'ত না। বিষদাঁতের মধ্যে দিয়ে যে খাত গেছে, বোড়ার সে খাত ভুজঙ্গ ও সামুদ্র-সাপের তুলনায় অধিকতর সম্পূর্ণ। ভুজঙ্গ ও সামুদ্র-সাপের ঊর্ধ্ব প্রান্ত বরাবর বিষদাঁত ছাড়াও পেছনে নিরেট দাঁত থাকে; কোন কোন সাপের থাকেও না। বোড়ার ঊর্ধ্ব প্রান্ত বরাবর মাত্র বিষদাঁতই থাকে—আদৌ কোন নিরেট দাঁত থাকে না।

সকল প্রকার বিষধর সাপের তালব-দাঁত ও চিবুক-দাঁত থাকে।

বোড়া-গোত্র সাপের বিষদাঁত প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। ভুজঙ্গ ও সামুদ্র-সাপ কাউকে দংশন করলে বিষদাঁত বয়ে বিষ আসতে বাধ্য—ঐ সাপ তা' ইচ্ছা করুক বা না করুক। এতে অযথা সঞ্চিত বিষ নষ্ট হয়। শিকার ছোট, তাকে গিলতে গিয়ে কাবু করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু দংশন করার সঙ্গে সঙ্গে ভুজঙ্গ ও সামুদ্র-সাপের বিষদাঁত থেকে বিষ বয়ে ঐ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু বোড়ার ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না।

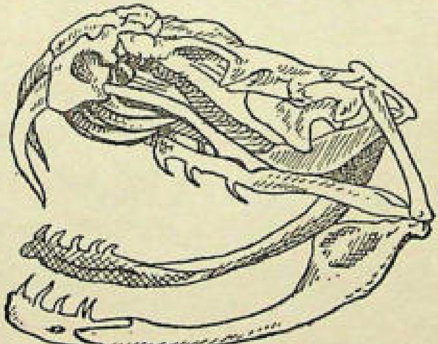

বোড়া-গোত্র সাপের মুখাবয়ব

বোড়া ইচ্ছা করলে কাউকে দংশন ক'রেও বিষদাঁত ব্যবহার করতে না পারে; তার বিষদাঁত মুখের তালুতে শোয়াই থাকে। ছোট শিকারের ক্ষেত্রে বিষদাঁত ব্যবহার ক'রে বোড়া সাপ বিষ অপব্যয় করে না। কার্যতঃ বোড়া সাপ খাদ্য

গ্রহণের চেয়ে শত্রু নিধনেই বিষদাঁত ব্যবহার ক'রে ব'লে মনে হয়।

সাপের দাঁত ভেঙে গেলে সেখানে নতুন দাঁত গজায় না। মাঢ়ির মধ্যে লুক্কায়িত বা অংশতঃ উদ্গত দাঁতের অঙ্কুর বড় হয়ে ভাঙা দাঁতের স্থলাভিষিক্ত হয়। বিষদাঁত সম্পর্কেও একথা খাটে। আমরা সচরাচর বলি, বিষধর সাপের (অর্থাৎ সম্মুখ-বিষদন্তী সাপের) মুখে দু' পাশে একটি ক'রে দুটি বিষদাঁত থাকে। একথা ঠিক নয়। একটি ক'রে দুটি সক্রিয় বিষদাঁত থাকে, বড়জোর একথা বলা চলে। সক্রিয় বিষদাঁতের গোড়ায় বা ঠিক পেছনে আরও কয়েকটি ছোট ছোট বিষদাঁত থাকে। সক্রিয় বিষদাঁত ভেঙে গেলে অথবা আপনা থেকে প'ড়ে গেলে এই ছোট ছোট বিষদাঁত ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

বিষগ্রন্থি ঃ সাপের চোখের পেছনে মাথার দু' পাশে একটি ক'রে দুটি বিষগ্রন্থি—ছোট পেঁয়াজের কোয়ার মত পেশীময় থলি থাকে। এই বিষগ্রন্থিতে তরল বিষ উৎপন্ন হয় এবং সঞ্চিত থাকে। বিষগ্রন্থি থেকে সরু বিষনালী বেরিয়ে বিষদাঁত পর্যন্ত যায়। বিষদাঁতের সঙ্গে বিষনালীর সরাসরি যোগ থাকে না; বিষদাঁতের গোড়ায় পৌঁছে মাঢ়ির ভাঁজে বিষনালী প্রসারিত হয়। সাপ কাউকে ছোবল দিলে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ বেরিয়ে বিষনালী দিয়ে বিষদাঁত বয়ে শিকারের বা শত্রুর দেহে প্রবিষ্ট হয়। বিষদাঁতের সঙ্গে সরাসরি যোগ না থাকায় কোন কারণে ঐ বিষদাঁত ভেঙে

গেলেও বিষনালীর কোন ক্ষতি হয় না। পরবর্তী বিষদাঁতও কার্যকর হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকে না।

সাপ যখন কাউকে ছোবল মারে, তখন তার বিষগ্রন্থিতে চাপ পড়ে। এই চাপ দুভাবে পড়ে—অংশতঃ চাপ পড়ে বিষগ্রন্থির সংকোচনে, আর অংশতঃ চাপ পড়ে দংশনের সময় বিষদাঁতের গোড়ায় চাপ পড়ায়।

বিষধর সাপের আকস্মিক আঘাত, দংশন, বিষ প্রয়োগ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন—এমন সুসমঞ্জস গতিতে হয় যা' সত্যই বিস্ময়কর! আধ সেকেণ্ডের কমেও সাধারণতঃ সমস্ত ব্যাপারটা ঘ'টে যায়।

স্তন্যপের কর্ণমূল গ্রন্থিরই অনুরূপ হ'ল সাপের বিষগ্রন্থি। আর বিষ হ'ল লালারই জটিল রূপান্তর। বিষহীন সাপেরও বিষগ্রন্থির মত গ্রন্থি থাকে—দেখতে একইরকম। তবে সে গ্রন্থি ক্ষতিকারক বিষ-পদার্থ তৈরি করে না।

সুদূর অতীতে এমন একদিন ছিল যখন কোন সাপেরই বিষ ছিল না। কিন্তু তাতে তাদের বেঁচে থাকার পক্ষে অসুবিধা হ'ল। শত্রুরা তাদের সহজেই মেরে ফেলত। হাত নেই, পা নেই —শত্রুর্ সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় যুঝে উঠতে পারত না। তার ওপর যে পরিবেশে তারা গিয়ে পড়েছিল, সেখানে তাদের খাদ্যের উপযোগী ছোট জীব-জন্তু বেশী ছিল না। বড় জীব-জন্তু গিলতে হলে মেরে খেতে হয়—সেজন্যে হাতিয়ার দরকার। নিছক এই প্রাণের তাগিদেই আজকের বিষধর সাপ সৃষ্টি করল তার মুখে বিষ নামে মারাত্মক পদার্থ, আর তৈরি করল বিষদাঁত নামে অস্ত্র। বড় বড় শিকারকে কাবু করা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল। জীবন-সংগ্রামে সে অনেক এগিয়ে গেল।

লালা স্তন্যপের খাদ্য গ্রহণ ও হজমে সাহায্য করে। সাপের বিষ এই কার্যটি তো করেই—পরন্তু শিকারকে হত্যা ক'রে

সাপের খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও সাহায্য করে। শত্রুকে হত্যা ক'রে সাপের প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপারেও তার বিষ সাহায্য করে।

প্রায় সব সাপের লালাতেই কম-বেশী বিষ-পদার্থ থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ সাপের লালাতে এই বিষ-পদার্থ থাকে খুব কম। এত কম যে বিশেষ কিছু আসে-যায় না। তাই এসব সাপকে আমরা বিষহীন বা নির্বিষ সাপ ব'লেই ধ'রে নিয়ে থাকি। যেসব সাপের মুখে বিষগ্রন্থিতে বিষ উৎপন্ন ও সঞ্চিত হয়, তাদেরই আমরা বিষধর বা বিষাক্ত সাপ বলি। বিষধর সাপের বিষদাঁতও থাকে। বিষহীন সাপের সুস্পষ্ট বিষগ্রন্থি ও বিষদাঁত থাকে না।

অনেকের ধারণা আছে, সাপের বিষ থাকে তার দাঁতে; অনেকের আবার ধারণা, সাপের বিষ থাকে তার লকলকে জিবে; আবার কারও কারও ধারণা, সাপের বিষ আছে তার দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে। বলা বাহুল্য, কোনটাই সত্য নয়।

বিষ ঃ সাপের বিষ সাধারণ মানুষের কাছে এক অদ্ভুত জিনিস। সামান্য একটু জিনিস—কিন্তু তাতেও মানুষের প্রাণ নষ্ট ক'রে দিতে পারে। এ হেন জিনিসের নামে মানুষ যে ভীত হবে, এ তো স্বাভাবিক। কেবল সাধারণ লোকের কাছে অদ্ভুত নয়, বিজ্ঞানীর কাছেও সাপের বিষ আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে। সাপের বিষের সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা আজও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব না হলেও সাপের বিষের উপাদান সম্বন্ধে তাঁরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছেন।

সদ্য বের-করা সাপের বিষ স্বচ্ছ তরল পদার্থ। সব সাপের বিষের রং একরকম নয়। তবে সাধারণভাবে বলা চলে, সাপের বিষের রং ঈষৎ হলদে—কতকটা সরষের তেলের মত। তরল অবস্থায় সাপের বিষ সংরক্ষিত করা যায় না—কারণ সেক্ষেত্রে

ঐ বিষ বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। বীক্ষণাগারে গবেষণার কাজের প্রয়োজনে এই বিষ শুষ্ক ক'রে সংরক্ষিত করা হয়। চেপটা পাত্রে সাপের বিষ ঢেলে শুষ্ক করা হয়। যাতে ধুলো-বালি না পড়ে সেজন্যে ঐ পাত্র ঘণ্টাকৃতি-পাত্র দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক করতে হলে ঘনীভূত সলফিউরিক অ্যাসিডের ওপর বিষের পাত্রটি রাখতে হয়। শোষকাধারের মধ্যে রাখলে শুষ্ক করার আরও সুবিধা। এভাবে শুষ্ক করলে সাপের বিষ তার জলীয় উপাদানের শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ হারায়—এবং অল্প হলদে রঙের দানাবাঁধা পিণ্ডে পরিণত হয়। শুষ্ক বিষ বছরের পর বছর—অনির্দিষ্ট কাল ধ'রে তার বিষত্ব বজায় রাখে। শুষ্ক বিষ জলে সহজেই গ'লে যায়। জলে-গোলা এই বিষ বিষগ্রন্থি থেকে সদ্য-নিঃসৃত বিষের মতই কার্যকর। পিণ্ডাকারে শুষ্ক বিষ সহজে গুঁড়ো করাও যায়। ৭৩° তাপে আধঘণ্টা ধ'রে ভুজঙ্গ ও সামুদ্র-সাপ গোত্রের বিষ যদি উত্তপ্ত করা হয়, তা' হলে তার বিষত্ব সামান্য নষ্ট হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে বোড়া গোত্রের বিষ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তার বিষত্ব হারায়।

সাপের বিষের গাঢ়তার তারতম্য দেখা যায়। একদিকে জল, অপরদিকে ডিমের সাদা অংশ—এই দুয়ের ঘনত্বের মধ্যে বিভিন্ন সাপের বিষের ঘনত্বের তারতম্য ঘটে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় সাপের বিষ অল্প অ্যাসিড। কিন্তু উদ্‌বায়ী অ্যাসিড দূরীভূত হওয়ায় এই বিষ দ্রুত ক্ষারীয় হয়ে ওঠে।

বেশ কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে এমন সাপের বিষগ্রন্থির বিষেরও বিষত্ব বিয়োজনের ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

জ্যান্ত সাপের বিষগ্রন্থিতে বহুদিন ধ'রে সঞ্চিত বিষ অল্পদিন ধ'রে সঞ্চিত বিষের তুলনায় বেশী উগ্র হয়ে থাকে।

দংশনে অথবা অন্য কোন ভাবে বিষগ্রন্থির বিষ নিঃশেষ হয়ে

গেলে সাত দিনের মধ্যে বিষগ্রন্থিতে যথারীতি আবার বিষ সঞ্চিত হয়।

সাপের বিষ সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার। সাপের বিষ দেহের রক্তের সঙ্গে না মেশা পর্যন্ত কারও ক্ষতি করতে পারে না। রক্তের সঙ্গে মিশলেই তবে তার বিষত্ব প্রকাশ পায়। সাপের বিষ কেউ হাতে নিলে তার কোন ক্ষতি হয় না। এমন কি সাপের বিষ খেলেও মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় না। কোন জিনিস খেলেই তা' রক্তের সঙ্গে মেশে না। তা' হজম হয়ে রক্তের সঙ্গে মেশে। সাপের বিষ হজম হয়ে রক্তের সঙ্গে মেশার আগে বিভিন্ন উপাদানে ভেঙে যায়—তার বিষত্ব নষ্ট হয়। অবশ্য কারও দাঁতে গলায় বা পেটে ঘা থাকলে আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে সাপের বিষ তার রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। হাতেও বিষ নেওয়ার সময় সতর্ক হতে হবে, হাতে বা নখের আড়ালে যেন কোন ক্ষত না থাকে।

বিষধর সাপের ছোবলে নিহত ভেড়া-ছাগল বা হাঁস-মুরগী রেঁধে খেলে মানুষের ক্ষতি হয় না।

জলের বা দুধের পাত্রে বিষধর সাপে মুখ দিয়েছিল, আর সেই জল বা দুধ খেয়ে লোকে মারা গেছে, এ ধরনের কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু এর মধ্যে কোন সত্যতা আছে ব'লে মনে হয় না। ঐ জলে বা দুধে যথেষ্ট পরিমাণে বিষ না মেশার সম্ভাবনাই অধিক। তবে ঐ জল বা দুধ যে খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তা' বলা বাহুল্য।

আমাদের দেশে কেউ কেউ সকলের সমুখে সাপের বিষ খেয়ে অলৌকিক কসরৎ প্রদর্শন করে। কিন্তু সাপের বিষ খাওয়ায় অলৌকিকত্ব কিছু নেই, তা' বোঝা যায়।

সাঁপের বিষ সম্বন্ধে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। মানুষের দেহে সামান্য বিষ ঢুকলেই তার মৃত্যু হয় না। নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষ ঢুকলেই তবে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। তার কম

ঢুকলে আর মৃত্যু হয় না। সাধারণভাবে বলা চলে, মানুষের মৃত্যু ঘটাতে অন্ততঃ বড় আকারের দু' ফোঁটা বিষ তার রক্তে মেশা দরকার।

সাপের মুখে বিষ, অথচ তার কিছু হয় না। কেন হয় না, তাও বোধ হয় বলার প্রয়োজন নেই। মুখে বিষ থাকলেও তা' তো আর তার দেহের রক্তের সঙ্গে মিশছে না। অপরপক্ষে কোন বিষধর সাপ অপর কোন বিষধর বা বিষহীন সাপকে ছোবল দিলে দষ্ট সাপটির মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। এমন কি কোন বিষধর সাপ আকস্মিকভাবে নিজের দেহেও বিষদাঁতের আঘাত ক'রে বসলে তারও মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। যে উন্মত্ততার সঙ্গে সাপ তার শত্রুকে আক্রমণ করে, তাতে অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘ'টে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সাপের দেহের রক্তে সোজাসুজি বিষ ঢুকে যায়—তাতেই বিষক্রিয়া দেখা যায়। অবশ্য এখানে একথাও উল্লেখ করা উচিত, সাপের বিষ সম্পর্কে কি বিষধর কি বিষহীন —সব সাপের রক্তে কিছুটা অনাক্রম্য ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ কোন বিষধর সাপ অন্য কোন সাপকে দংশন করলেও দষ্ট সাপের মৃত্যু ঘটতে বিষ ও সময়ের আধিক্যের প্রয়োজন ঘটে। নিজের বিষ সম্পর্কে সাপের কিছুটা অনাক্রম্য ক্ষমতা তো থাকেই।

সাপের বিষ বিশ্লেষণ ক'রে যেসব উপাদান পাওয়া গেছে, তাদের প্রধানগুলির ক্রিয়া এরূপ : (ক) কয়েকটি বিষ-উপাদান বিভিন্ন নার্ভকেন্দ্রে ক্রিয়া ক'রে দেহের অবশতা এনে দেয়—বিশেষ ক'রে শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশী বিকল ক'রে দেয়; (খ) কয়েকটি বিষ-উপাদান লোহিত রক্তকণিকা এবং রক্তবাহ নালীর কোষ-প্রাচীর নষ্ট ক'রে দেয়; (গ) কয়েকটি বিষ-উপাদান রক্তভঞ্জন ঘটায়।

মোটামুটিভাবে প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন সাপের বিষ দুই ধরনের বলা যায় : (ক) যার ক্রিয়া প্রধানতঃ নার্ভের ওপর এবং

(খ) যার ক্রিয়া প্রধানতঃ রক্তের ওপর। ভুজঙ্গ ও সামুদ্র-সাপ গোত্রের বিষের ক্রিয়া প্রধানতঃ নার্ভের ওপর, আর বোড়া গোত্রের বিষের ক্রিয়া প্রধানতঃ রক্তের ওপর। বলা বাহুল্য, এর ব্যতিক্রমও আছে।

এরূপ মনে হয় যে, যে বিষ নার্ভের ওপর প্রধানতঃ ক্রিয়া করে তা' মাছ-ব্যাঙ-আদি তাপগ্রাহী প্রাণীদের সহজেই কাবু করে। আর যে বিষ রক্তের ওপর প্রধানতঃ ক্রিয়া করে, তা' পাখি-তীক্ষ্ণদন্ত-আদি তাপমোচী প্রাণীদের সহজেই কাবু করে। অবশ্য দু' প্রকার বিষই সকল প্রকার প্রাণীর ওপর ক্রিয়া করে।

ইন্দ্রিয়গ্রাম

চোখঃ সাপের চোখের আবয়বিক গঠনে বিশেষত্ব আছে। আমাদের চোখে পাতা আছে; দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা চোখ বন্ধ করতেও পারি। সাপের চোখে কিন্তু সেরকম পাতা নেই। সাপের চোখ সব সময়েই খোলা থাকে, নিষ্পলক—এমন কি ঘুমোবার সময়ও। চোখ সব সময় খোলা থাকায় কারও সাড়াতে সাপের ঘুম ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার উপস্থিতি সাপের চোখে ধরা পড়ে; অন্য প্রাণীর তুলনায় সাপের এটা সুবিধা বলতে হবে। সাপের চোখে পাতা নেই বটে, কিন্তু অন্য ব্যবস্থা আছে। সাপের দেহের আঁশের কথা বলেছি। সাপের দেহের অন্যান্য অংশের মত সাপের চোখ দুটিও আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। তবে সে আঁশ কাচের মত স্বচ্ছ; তার ভেতর দিয়ে সাপের দেখার কোন অসুবিধা হয় না।

সাপের চোখ এরকম হওয়ার কারণ কি? সাপকে ধুলো-মাটি ঝোপ-ঝাড় দিয়ে যেতে হয়। যখন-তখন জলের মধ্যেও ঢুকতে

হয়। চোখ সব সময়ে আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকায় ধুলো-বালি পড়তে পারে না, জলও ঢুকতে পারে না।

কোনও সাপের চোখ বেশ বড়, কোনও সাপের চোখ ছোট—হঠাৎ দেখলে চোখ আছে ব'লে বোঝা যায় না। ঢেমনা সাপের চোখ বেশ বড়, কিন্তু পুঁয়ে সাপের চোখ এত ছোট যে চোখ আছে কিনা সহজে বোঝা যায় না।

সব সাপের চোখের তারা একরকম নয়। অধিকাংশক্ষেত্রে গোল অথবা খাড়া উপবৃত্তাকার। চক্রধরের তারা গোল, চন্দ্রবোড়ার তারা খাড়া উপবৃত্তাকার।

সাপের দৃষ্টিশক্তি কিরূপ? সাপের দৃষ্টিশক্তি ভালই—তবে খুব কাছাকাছি জিনিসের সম্বন্ধে। দূরের জিনিস সাপ ভাল দেখতে পায় না। অর্থাৎ কোনটি ঠিক কোন জিনিস—কোন জিনিসের স্বরূপ বুঝতে পারে না।

আমাদের দৃষ্টি দ্বিনেত্র—আমাদের দুটি চোখ একত্রে কোন জিনিস দেখার উপযোগী। এতে কোন জিনিসের আমাদের সম্যক্ ধারণা হয়। সাপের দুটি চোখ থাকলেও দৃষ্টি একনেত্র—একটা চোখ দিয়েই সাপ কোন জিনিস দেখে। সেজন্যে সাপ কোন জিনিসের অবস্থান ও দূরত্ব ঠিক নির্ণয় করতে পারে না। অবশ্য সাপ মাথা দুলিয়ে—দু' চোখ দিয়ে কোন জিনিস দেখে এ অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করে। লাউডগা সাপ এর ব্যতিক্রম। কোন জিনিস দেখতে এ সাপ একত্রে দুটি চোখই ব্যবহার ক'রে ব'লে মনে হয়।

সাপের আচরণ লক্ষ করলে একটা জিনিস অনুমিত হয়। সাপের দৃষ্টি কোন জিনিসের স্বরূপের চেয়ে তার গতির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। কোন জিনিসের নড়াচড়া সাপের চোখকে করে বিশেষভাবে আকর্ষণ।

কিছুদূরে একটা ইঁদুর সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে ব'সে আছে। আর

দূরে গাছের ওপর একটা পাখি ন'ড়ে উঠল। ইঁদুর আর পাখি—দুটিই সাপের খাদ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সাপ যদি কাছের খাদ্য ছেড়ে দিয়ে—পাখির দিকে ছোটে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিছুদূরে ইঁদুরের নিশ্চল অবস্থার চেয়ে অনেক দূরের পাখির নড়াচড়া সাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করা স্বাভাবিক।

এমনও দেখা গেছে, একটা গিরগিটি দূরে চলতে "দেখে" কোন সাপ ছুটে গেছে তাকে ধরতে। কিন্তু ধরার আগেই গিরগিটিটা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে পড়ায় সাপ হয়ে পড়েছে হতভম্ব। তার আর শিকার ধরা হয় না। গিরগিটিটা ঠিক কোথায়, সে ঠাহরই করতে পারে না!

দূরের জিনিস সাপ ভাল দেখতে পায় না, অথচ দূরের ঐ জিনিসের গতি থাকলে তা' সাপের চোখকে উত্তেজিত করে। সেজন্যে অনেক সময় সাপ দূরের কোন গতিশীল জিনিসের দিকে "তদারক" করতে এগিয়ে যায়।

ঘটনা শোনা যায়, কোন গাছে একটি পাখি নড়তে দেখে সাপ ছুটে গেল তাকে ধরতে। গাছে উঠতে উঠতে পাখিটা গেল উড়ে। সাপ কিন্তু গাছে উঠে পাখিটা যেখানে বসেছিল, সেখানে গিয়ে দিল এক ছোবল।

লোকে ভাবে, সাপ বুঝি রাগে এই ছোবল দিল। আসলে কিন্তু পাখিটা সেখানে আছে ভেবেই সাপ দিয়েছে ছোবল। পাখিটাকে সে নড়তে দেখেছিল; ইতিমধ্যে যে পাখিটি উড়ে গেছে সে বুঝতে পারে নি। কিন্তু পাখিটি যেখানে বসেছিল, সে জায়গাটি আঁচ ক'রে রেখেছিল; সেখানে গিয়ে দিয়েছে ছোবল।

সাপের চোখ সম্বন্ধে একটি ভারী মজার কথার চলন আছে। কোন মানুষ সাপের কাছে এলে তার ছবি সাপের চোখে আঁকা হয়ে যায়। কেউ হয়তো কোন সাপকে আঘাত করেছে। সাপটি

তাতে মরে নি, তখনকার মত পালিয়েছে। পরে সে সুবিধামত— বিশেষ ক'রে রাতের অন্ধকারে এসে মানুষটিকে দংশন করে। মানুষটিকে চিনে বের করতে তার কোন অসুবিধা হয় না। তার ছবি তো সাপটির চোখে আগেই আঁকা হয়ে গেছে।

এ কথায় কোন সত্য নেই। একই জাতের দুটি সাপের পার্থক্য ঠাহর করা সাধারণের পক্ষে সব সময়ে সহজ নয়। দিনের বেলায় কেউ একটা সাপকে আঘাত করেছে, আঘাত তত জোর না হওয়ায় সাপটা কিন্তু পালিয়েছে। রাতে আকস্মিকভাবেই তার বাড়িতে আর একটা সাপ এসে ঢুকেছে, সাপটি ঐ জাতেরই। মনে করা হ'ল, প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আগের সাপটিই বুঝি দংশন করতে এসেছে।

অন্যভাবেও এ ভুল ঘটতে পারে। গোখরো, কালাচ ইত্যাদি সাপ অনেক সময় জোড়া-জোড়া বাস করে। আহত সাপটা হয়তো দূরে চ'লে গেছে। কিন্তু তার সঙ্গী রাতে বেরিয়েছে। তাকেই ভুল করা হ'ল আহত সাপ ব'লে। অথবা এমনও হতে পারে, আহত সাপটা বেশী দূরে না গিয়ে রাতে তার সঙ্গীর সন্ধানে ফিরে এসেছে। তাকে দেখেই মনে করা হ'ল, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে সাপটি দংশন করতে এসেছে।

সাপের চোখ স্বচ্ছ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে; এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই সাপের চোখে ছবি উঠার গল্পের চলন হয়েছে ব'লে মনে হয়।

কানঃ কান বলতে সচরাচর আমরা যা' বুঝি, তা' সাপের নেই। তবে এক সময়ে সাপের পূর্বপুরুষদের যে কান ছিল, তার প্রমাণ রয়ে গেছে। সাপের দেহের মধ্যে কানের ভেতরের অংশ আজও দেখা যায়।

আমাদের কানের তিনটি প্রধান অংশঃ (ক) বহিঃকর্ণ অর্থাৎ কানের যে অংশটা আমরা ওপর থেকে দেখতে পাই

(খ) মধ্যকর্ণ—এই অংশে কর্ণপটহ অর্থাৎ কানের পর্দা অন্তর্ভুক্ত এবং (গ) অন্তঃকর্ণ।

সাপের অন্তঃকর্ণ আছে—বহিঃকর্ণ বা মধ্যকর্ণ নেই।

বাতাসে ভেসে-আসা শব্দ কানের পর্দায় এসে লাগে, সেখান থেকে অস্থিময় শ্রুতিস্তম্ভ বয়ে শব্দ-তরঙ্গ অন্তঃকর্ণে যায়, সেখান থেকে শব্দ-তরঙ্গ শ্রুতি-নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে যায়। তখনই আমরা সে শব্দ শুনতে পাই। সাপের কানের পর্দা নেই, সুতরাং বাতাসে ভেসে-আসা কোন শব্দ সাপের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়।

কথা উঠতে পারে, কানের পর্দার সাহায্য ছাড়া অন্য কোনভাবে বাতাসে ভেসে-আসা শব্দ সাপের পক্ষে শোনা সম্ভব কিনা। কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে তা' সম্ভব হয়। সাপের পক্ষেও তা' সম্ভব কিনা? না, সাপের পক্ষে তা' সম্ভব নয়। সাপের আশপাশে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে দেখা গেছে, সাপের কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নি।

সাপ যে জগতে বাস করে, সেখানে বাতাসে ভেসে-আসা শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়—সেখানে প্রায় সব সময়েই নিথর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। ফলে কান ব্যবহার না করায় ধীরে ধীরে তা' লোপ পেয়ে গেছে।

তবে একটা কথা। বাতাসে ভেসে-আসা কোন শব্দ সাপ শুনতে পায় না বটে, কিন্তু মাটির সামান্য কম্পনও সে "শুনতে" পায় অর্থাৎ পেট দিয়ে অনুভব করতে পারে। মাটি কেন—যে কোন নিরেট আধারের ওপর সাপ থাকে, তারই সামান্য কম্পন সে অনুভব করতে পারে।

মাটির সামান্য কম্পনও অনুভব করতে পারে ব'লে আশপাশে কোন শত্রু এলে সাপ তার উপস্থিতি সহজেই বুঝতে পারে—তাকে দেখতে না পেলেও, আর সতর্ক হয়। কোন শিকার এলেও সাপ বুঝতে পারে—এবং অতর্কিতে তাকে ধরার চেষ্টা করে।

গ্রামবাসীরা রাতের অন্ধকারে হাঁটার সময় কখনও কখনও একটা লাঠি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে যায়। এর কারণ, লাঠি ঠোকার ফলে মাটিতে যে কম্পন হয়, তা' সাপ অনুভব ক'রে দূরে স'রে যাবে।

অনেকে আবার এ ব্যাপারে ভুল করে। তারা হাততালি দিতে দিতে যায়। হাততালির শব্দ কিন্তু সাপ শুনতে পায় না। সুতরাং তাতে কোন ফলও হয় না।

আধারের সামান্য কম্পনও যে সাপ বুঝতে পারে, তার বিশেষ কারণ আছে।

বাতাস যেমন শব্দের বাহন, নিরেট আধারও তেমনি শব্দের বাহন। একটি টেঁকঘড়ি দাঁতে চেপে ধ'রে কান তুটো হাত দিয়ে চাপা দিলেও ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। কান চাপা থাকায় টিকটিক শব্দ বাতাসে ভেসে এসে কানের পর্দায় লাগতে পারে না। তবে টিকটিক শব্দ শোনা যায় কেমন ক'রে? এক্ষেত্রে ঘড়ির টিকটিক শব্দ দাঁত ও মস্তক-অস্থি বয়ে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। তাতেই টিকটিক শব্দ "শুনতে" পাওয়া যায়। একটি চিমটা টেবিলে জোরে আঘাত ক'রে সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে যদি চেপে ধরা যায়, তা' হলে চিমটার ঝনঝন শব্দ শোনা যাবে। চিমটার ঝনঝন শব্দ দাঁত ও মস্তক-অস্থি বয়ে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করবে; তাতেই ঐ শব্দ শোনা যাবে।

সাপ এই অস্থি-আশ্রয়ী শব্দ সহজেই "শুনতে" পারে। আমাদের কানের যে শ্রুতি-স্তম্ভ শব্দ-তরঙ্গকে কানের পর্দা থেকে অন্তঃকর্ণে নিয়ে যায়, সাপের ক্ষেত্রে সেই শ্রুতিস্তম্ভের বাইরের দিক্ নিম্ন চোয়াল যে অস্থির সহিত গ্রথিত সেখানে এসে পৌঁছেছে। শ্রুতিস্তম্ভের এরূপ অবস্থানের ফলে যে নিরেট আধারের ওপর সাপ থাকে, তাঁর সামান্য কম্পনও এই শ্রুতিস্তম্ভ বয়ে অন্তঃকর্ণে যায়—সেখান থেকে যথারীতি মস্তিষ্কে পৌঁছয়।

কর্নেল ওয়াল সাপ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি এমন একটি পরীক্ষা করেন যা' দিয়ে সাপের পক্ষে বাতাসে ভেসে-আসা শব্দ শোনার অক্ষমতা এবং মাটির সামান্য কম্পন অনুভব করার পটুতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

কর্নেল ওয়াল একটি চক্রধর সাপের চোখ চটচটে প্লাস্টারের টুকরো দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দেন। তারপর তার মাথার কাছে টিনের কানেস্তারা লাঠি দিয়ে জোরে পিটতে থাকেন। ফণা তুলে ধরা দূরের কথা—সাপটার কোনও প্রতিক্রিয়াই ঘটল না। একটা ভেঁপু বাজানো হ'ল। তাতেও সাপটার কিছু আসে-গেল না। কিন্তু যেই কাছের একটা চেয়ার নাড়ানো হ'ল, অমনি সাপটি ফণা তুলে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা কি হ'ল সহজেই বোঝা যায়। কানেস্তারার শব্দ বা ভেঁপুর আওয়াজ বাতাসে ভেসে-আসা শব্দ। সাপ তা' শুনতে পায় নি। কিন্তু চেয়ার নাড়াতে মাটির কম্পন হ'ল। সাপ অমনি তা' বুঝে ফণা তুলে দাঁড়াল। চক্রধর সাপের চোখে চটচটে প্লাস্টারের টুকরোর বদলে আঠা-লাগানো ফিতে লাগিয়েও এ পরীক্ষা করেছি; একই ফল পেয়েছি।

বাঁশির সুরে সাপ কি নাচে?

এখনও একটা প্রশ্ন রয়ে যায়। সাপ যদি বাতাসে ভেসে-আসা শব্দ শুনতে না পায়, তবে সে বাঁশির সুর শোনে কেমন ক'রে? বাঁশির সুরের তালে তালে সে নাচে কেমন ক'রে? বাঁশির সুর তো বাতাসে ভেসে-আসা শব্দ। বস্তুতঃ বাঁশির সুরে তথাকথিত সাপের নাচ দেখে সাপের যে কান নেই, বিজ্ঞানীদের এই কথা অনেকেই গ্রহণ করতে পারেন না। সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।

সাপুড়ে তার বাঁশি বাজায়, আর চক্রধর সাপ ফণা তুলে

মাথা দোলায়। কিন্তু সাপ মাথা দোলায় আসলে বাঁশির সুরে নয়। বাঁশিটা বাজানোর সময় সাপুড়ে সেটা এদিক্-ওদিক্ করে। সাপও বাঁশিটার নড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মাথা এদিক্-ওদিক্ করে। সমুখে কিছু নড়লে সাপ মনে করে তার শত্রু বা শিকার। তাই তার দিকে সাপ ঠিক নজর রাখার চেষ্টা করে। তথাকথিত সাপের নাচে সাপের কান নয়—সাপের চোখই তাকে সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে রাখে। সাপুড়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে হঠাৎ খুব জোরে ফোঁৎ শব্দ ক'রে মাথাটা একটু নীচে নামিয়ে দেয়—বাঁশিটা মাটির দিকে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাপটাও বাঁশির নিম্ন গতির অনুসরণে ফোঁস ক'রে মাটিতে ছোবল দেয়। লোকে ভাবে, বাঁশির সুর বন্ধ হওয়াতে সংগীতে-মুগ্ধ সাপ বুঝি রেগে ছোবল দিল—সাপুড়ের দেহ পাল্লায় না আসায় ছোবলটা মাটিতে পড়ল।

গতিশীল কিছু সাপের চোখকে আকৃষ্ট করে সত্য, কিন্তু যতক্ষণ তার গতি থাকে ততক্ষণ সাপ তাকে সাধারণতঃ ছোবল দেয় না। যেই গতি বন্ধ হয়, অমনি তাকে ছোবল দেয়। গতিশীল কিছুকে ছোবল মারলে সে ছোবল ঠিকমত নাও পড়তে পারে—লক্ষ্য ফসকে যেতে পারে। সাপের দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতার কথা তো আগে বলেছি।

যে ঝাঁপির সাপকে সাপুড়ে নাচাবে সে ঝাঁপির ঢাকনা আস্তে আস্তে খুলে সাপ দেখতে পাবে না এমন জায়গায় ব'সে সাপুড়ে যতই জোরে বাঁশি বাজাক, ঝাঁপির মধ্যে সাপ যেমন শুয়েছিল তেমনই শুয়ে থাকবে। বাঁশির সুর তার "কানে" পৌঁছবে না।

সাপ নাচাবার উদ্দেশে ঝাঁপি খুলতে গিয়ে সাপুড়ে ঝাঁপিটার ঢাকনা সামান্য খুলে তার মধ্যে জোরে ফুঁ দেয়। এ অনেকে লক্ষ ক'রে থাকবেন। কেন সে এই ফুঁ দেয়? এই ফুঁ সাপের

গায়ে লেগে তাকে উত্তেজিত করে—এবং তাতেই সে ফণা ধ'রে দাঁড়ায়। কখনও কখনও বা ফুঁয়ের পরিবর্তে সাপুড়ে ঝাঁপির গায়ে আঙুল দিয়ে পুনঃ পুনঃ টোকা দেয়। তাতেও একই ফল হয়। ঝাঁপির কম্পন অনুভব ক'রে সাপ চকিত হয়ে ওঠে।

মুখে বাঁশি না বাজিয়ে উদ্যত-ফণা সাপের সমুখে কেউ যদি মাথা দোলায়, তা' হলে বাঁশি বাজানোর সময় সাপ যা' করেছিল, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই করবে। অর্থাৎ ফণা তুলে মাথা দোলাবে। কেউ যদি বাঁশি রেখে দিয়ে সাপের সমুখে মাত্র হাত নাড়ে, তা' হলেও সাপ ফণা তুলে মাথা দোলাবে। বস্তুতঃ বাঙালী সাপুড়েরা বাঁশি না নিয়ে শুধু হাত নাড়িয়েই সাপ নাচায়। মুখে যে তারা গান করে, তা' পরিবেশটাকে মধুর ও রহস্যময় করতে। সুতরাং বোঝা যায়, বাঁশির সুরের সঙ্গে সাপের তথাকথিত নাচের কোন সম্পর্ক নেই।

হাত নাড়িয়ে সাপ নাচানো

এ সম্পর্কে আর একটি সহজ পরীক্ষার কথা উল্লেখ করি। কোন চক্রধর সাপের সামনে একটি আয়না রেখে তার পেছনে ব'সে মাথা দুলিয়ে কেউ যদি বাঁশি বাজায়, তা' হলে সাপটা পেছন দিকে না ফিরে সামনে আয়নায় প্রতিফলিত মানুষটির চেহারাকে লক্ষ ক'রে ফণা দোলাবে। এ থেকে বোঝা যায়, কানে শুনে নয়—চোখে দেখে সাপ মাথা দোলায়।

এখনও হয়তো কেউ কেউ নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার

কথা তুলবেন। কোন মজলিসে ব'সে গান শুনছেন—সুমধুর গান। সেখানে একটা চক্রধর সাপ এসে উপস্থিত হ'ল। নিশ্চয়ই সাপটা মিষ্ট গান শুনে এসেছে।

এ হ'ল কাকতালীয় যুক্তি। সাপটা এসেছে হঠাৎ। গানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সংস্কার গেঁথে আছে আগে থেকে মিষ্ট গানের টানে সাপ আসে। গানের সময় সাপটা এসেছে। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসা হ'ল, মিষ্ট সুরে মুগ্ধ হয়ে সাপটা এসেছে।

কলের-গানে রেকর্ডে গান চলার সময়ও সাপ এসে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে ব'লে ঘটনার কথা শোনা যায়। একবার কয়েকজন নৌকা-ভ্রমণ করছিলেন। সঙ্গে একটা কলের-গান নিয়েছিলেন, সেটা বাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন, জল থেকে একটা কেউটে সাপ উঠে নৌকোর একটা ধারে ভর ক'রে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে কলের-গানটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অবশ্য নৌকোর দাঁড় দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলেন।

এসব ক্ষেত্রে সাপের উপস্থিতি আকস্মিক ব্যাপার। তবে ফণা তুলে দাঁড়ানোর কারণটা বোঝা দরকার। সাপ যে ফণা তুলে দাঁড়ায় গানে মুগ্ধ হয়ে নয়—রেকর্ডটা নড়তে দেখে শত্রু বা শিকার ভেবে সে ফণা তুলে দাঁড়ায়। এজন্যে রেকর্ড চালনা বন্ধ করলেই সাধারণতঃ সাপ মাথা নামিয়ে ফেলে—আস্তে আস্তে চ'লেও যায়। সাধারণ্যে অবশ্য মনে করা হয়, গান বন্ধ হয়ে গেল—সেজন্যে সাপ চলে গেল।

রেকর্ডটা যদি নিজের দংশনের পাল্লার মধ্যে থাকে, তা' হলে রেকর্ড বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকার বা শত্রু ভেবে সাপ তাতে ছোবল দিতেও পারে।

রেকর্ডের গতির মত একইভাবে হারমোনিয়ম বাজানোর সময়

বেলো করাতে অথবা বেহালা বাজানোর সময় ছড়ি এদিক্-ওদিক্ করাতে সাপ আকৃষ্ট হতে পারে।

এখনও একটা প্রশ্ন জাগতে পারে। বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে সাপ মাথা দোলায়, এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে?

আমাদের দেশে রাখালরা মাঠে গরু চরাতে যায়। মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে সময় কাটাতে তারা গাছের তলায় ব'সে নিজের মনে বাঁশি বাজায়। কোন সুদূর অতীতে কোন রাখাল বালক মাঠে গরু চরাতে গিয়ে এভাবে বাঁশি বাজাচ্ছিল, তখন একটা চক্রধর সাপ তার সমুখে এসে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সাপের দৃষ্টি ছিল বাঁশি বাজানোয় রত রাখাল বালকের আঙুল নাড়ানোর দিকে। রাখাল বালক কিন্তু তা' বুঝতে পারে নি। সে ভেবেছিল, বাঁশির সুরেই বুঝি মুগ্ধ হয়ে সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আর তার ফলেই সৃষ্টি হয় বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে সাপের নাচের গল্প—সাপের সংগীত-প্রীতির কথা।

কিছুকাল আগে কলকাতা ও অন্যত্র কয়েকটি চলচ্চিত্র-গৃহে সাপ নিয়ে রচিত কাহিনী দেখানো হচ্ছিল। এই ছবির সংগীতাংশ দেখানোর সময় অবধারিতভাবে দেখা যেত, হলঘরের কোণে সত্য সত্য চক্রধর সাপ দেহে ভর ক'রে প্রসারিত ফণা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শকেরা মনে করতেন, সংগীতের আকর্ষণে প্রকৃতই বুঝি বন্য সাপ হলঘরে ঢুকেছে। আসলে এ ছিল চলচ্চিত্র-কর্তৃপক্ষের কারসাজি। পূর্ব হতেই তাঁরা সাপুড়েদের সঙ্গে যোগসাজশ ক'রে বিষদাঁত-ভাঙা সাপ সংগ্রহ ক'রে রাখতেন এবং সুযোগমত হলঘরে ছেড়ে দিতেন।

সংস্কৃত ভাষায় সাপের একটা নাম চক্ষুঃশ্রবা। চক্ষুঃশ্রবা কথার অর্থ, চোখ দিয়ে যে কেবল দেখে না—শোনেও। অর্থটা

স্পষ্ট নয়। বাঁশির সুরে সাপ মাথা দোলায়, এ ভ্রান্ত তথ্যের দ্বারা চালিত হয়ে সাপ চোখ দিয়েই শোনে এই ধারণায় প্রাচীনেরা এসেছিলেন কিনা জানি না। আগেই বলেছি, বাঁশির সমুখে সাপ যে মাথা দোলায়, তার কারণ তার চোখ। যা' হ'ক, এখানে একটা কথা আমাদের দেশের প্রাচীনদের পক্ষে স্মরণ করা উচিত। সাপের কান নেই, এটা অন্ততঃ তাঁরা লক্ষ করেছিলেন।

জিব ও নাকঃ সাপের জিব......লম্বা সরু চেরা জিব। লকলক্ করে যখন দেখলেই ভয় লাগে। সাপের জিব সামনের দিকে দুভাগে চেরা। জিবের গোড়ায় থলির মত একটা আবরণ আছে। মুখের মধ্যে থাকার সময় এই আবরণের মধ্যে থাকে জিব। মুখ না খুলেও সাপ তার জিব বাইরে বের করতে পারে। সাপের নীচের চোয়ালের সমুখভাগের মধ্যস্থলে ফাঁক আছে। মুখ বন্ধ থাকলেও সে ফাঁক দিয়ে সাপ জিব বের করে।

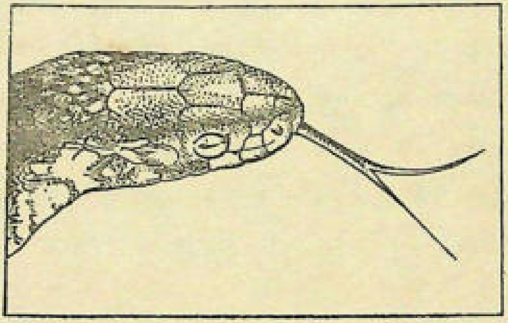

জিব

সাপের জিবের রং নীলাভ কাল। কোন কোন সাপের জিব অবশ্য আগার দিক্ অল্প কাল—কিন্তু গোড়ার দিকে অল্প লাল। সাপের জিব অন্য রঙেরও হয়।

সাপকে লক্ষ করলেই দেখা যায়, সাপ যখন চলাফেরা করে—এমন কি কোন স্থানে যখন স্থির হয়ে থাকে, দোফলা জিবটা বের ক'রে আশপাশে সে নাড়তে থাকে। জিভ একবার বের ক'রে পর মুহূর্তে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। এর কারণ আছে।

চোখ-বাঁধা অবস্থায় অথবা অন্ধকারে হাত দিয়ে অনুভব ক'রে আশপাশের জিনিস আমরা বোঝার চেষ্টা করি। সাপের জিব খুব অনুভূতিশীল। আমাদের হাতের মত সাপ তার প্রলম্বিত জিব দিয়ে আশপাশের অজানা জিনিস বোঝার চেষ্টা করে—পরিবেশের স্বাদ নেয় যেন। এজন্যে অন্ধকারে কোথায় কি আছে, সাপ বুঝতে পারে।

সাপ তার জিব দিয়ে আশপাশের জিনিস কেবল বোঝার চেষ্টা করে না, তাদের গন্ধও পায়। জিব দিয়ে গন্ধ পায়, কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলি।

সাপের নাক আছে—মাথার দু'পাশে থাকে দুটি নাসারন্ধ্র। জলবাসী সাপের নাসারন্ধ্র অবশ্য থাকে মাথার ওপর দিকে। নাক থাকলেও সাপের জীবনযাত্রায় তার নাক খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে না।

সাপের মুখের তালুতে সামনের দিকে দুটি ছোট গর্ত আছে। এই গর্ত দুটি তীব্র সংবেদজ কোষে পূর্ণ। সাপ তার লম্বা চেরা জিবের ডগা দিয়ে মাটি, বাতাস, জল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা তুলে নিয়ে গর্ত দুটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এভাবে সে তার আশপাশের জগৎ সম্বন্ধে সঠিক অনুভূতি ও গন্ধ লাভ করে। সাপের মুখের তালুর এই গর্ত দুটিকে বলে জ্যাকবসন-অঙ্গ। জ্যাকবসন প্রথম এই দুটি গর্ত লক্ষ করেন; তাই তাঁর নাম থেকে জ্যাকবসন-অঙ্গ নাম।

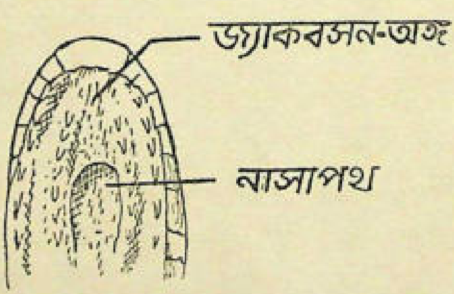

সাপের আসল নাক গন্ধ গ্রহণে সাহায্য করলেও জ্যাকবসন-অঙ্গ থাকাতেই সাপের ঘ্রাণশক্তি হয়েছে খুব তীব্র। কোন কোন

সাপের এই ঘ্রাণশক্তি খুবই বেশী। ঠিকমত কামড়ে ধরতে না পারায় শিকার হয়তো তার মুখ থেকে পালিয়েছে। শিকার যে পথ ধ'রে পালিয়েছে, সাপ তার গায়ের গন্ধ শুঁখে সে পথ দিয়ে গিয়ে ঠিক তাকে ধরেছে।

জলবাসী সাপের প্রধান খাদ্য মাছ। কোন কোন জলবাসী সাপের গায়ে আঁশটে গন্ধ লেপে দেওয়ায় আঁশটে গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মাছ মনে ক'রে ঐ সাপ নিজের গায়েই যদি দংশন ক'রে বসে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

একটি ময়ালের ঘরে একটি সরু লাঠি ছিল। ঐ লাঠি দিয়ে তাকে মরা ইঁদুর নাড়িয়ে খেতে দেওয়া হ'ত। একদিন দেখা গেল, ময়ালটা লাঠিটাই গিলতে আরম্ভ করেছে! লাঠিটিতে ইঁদুরের গায়ের গন্ধ লেপে গেছল; সেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়েই সাপটা লাঠিটাকে গিলতে আরম্ভ করেছিল।

সাপের জিব সাপের জীবনে খুবই কাজে লাগে। কুকুর পথ দিয়ে যেতে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কি যেন শুঁখে নেয়; এই শোঁখার মধ্য দিয়ে কুকুর তার পথ চিনে রাখে। কুকুরের যেমন নাক, সাপের তেমনি জিব। জিব দিয়ে সাপ তার পথ চেনে।

আমেরিকার রাজা সাপ বিষহীন। কিন্তু এ সাপের রক্তে আমেরিকার মারাত্মক বিষধর ঝুমঝুমি সাপের বিষের বিষসহন ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ ঝুমঝুমি সাপ রাজা সাপকে দংশন করলেও রাজা সাপের কিছু হয় না। ফলে বিষহীন রাজা সাপ মারাত্মক বিষধর ঝুমঝুমি সাপকে তোয়াক্কা তো করে না—কখনও কখনও নিছক নিজের দেহ দিয়ে পাকিয়ে তাকে হত্যা করে। সম্ভবতঃ এই কারণেই রাজা সাপকে দেখামাত্রই ঝুমঝুমি সাপের ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটে। "দেখামাত্রই" বললাম বটে। কিন্তু আসলে চোখ দিয়ে দেখে ঝুমঝুমি সাপ রাজা সাপকে চেনে না, জিব তথা জ্যাকবসন-অঙ্গের সাহায্যে চেনে।

এ সম্বন্ধে একটা পরীক্ষার কথা বলি। ঝুমঝুমি সাপের চোখ বন্ধ ক'রে রাজা সাপের সমুখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চোখে দেখতে না পেলেও ঝুমঝুমি সাপের ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। অপরপক্ষে চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জিব কেটে নেওয়া হয়েছে—রাজা সাপের উপস্থিতিতে ঝুমঝুমি সাপের কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নি। ঝুমঝুমি সাপ রাজা সাপকে চোখে দেখলেও যেন চিনতেও পারে না! সাপের জীবনযাত্রায় জ্যাকবসন-অঙ্গ এতই গুরুত্বপূর্ণ।

জিবের যে নিছক স্বাদশক্তি, তা' সাপের জিবে নেই। এর যা' কিছু কাজ জ্যাকবসন-অঙ্গের সম্পর্কেই। চাটনি বা ঐ ধরনের কিছু আমরা আঙুলে তুলে মুখে দিই। চাটনির স্বাদ-ব্যাপারে আঙুলের কোন কাজ নেই; সে কেবল মুখে তুলে দেয় মাত্র। স্বাদ-ব্যাপারে সাপের জিবের কাজও তাই; সে কেবল জিনিসটা জ্যাকবসন-অঙ্গে তুলে দেয় মাত্র।

অনেকের ধারণা, সাপ জিব দিয়ে শোনে, সাপের কানের কাজ জিব করে। একথা ঠিক নয়। তবে বাতাসের খুব জোর কম্পন সাপ তার লকলকে জিব দিয়ে অনুভব করতে পারে।

ত্বক্ঃ আমাদের দেহের চামড়া যেমন স্পর্শ, উষ্ণতা বা যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে, সাপের ত্বক্‌ও সেরকম অনুভব করতে পারে। উপরন্তু সাপের ত্বক্ আর্দ্রতাও বুঝতে পারে।

মুখাবয়ব বিবরঃ কোন কোন সাপের মাথায় বিবর বা গর্ত থাকে। এই মুখাবয়ব বিবরের সাহায্যে সাপ অন্ধকারেও তাপমোচী প্রাণীর উপস্থিতি কেবল বুঝতে পারে না, ঠিকমত তাকে আঘাত করতেও পারে। গেছোবোড়া-আদি সবিবর বোড়া

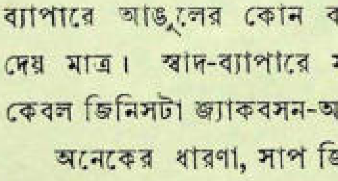

সবিবর বোড়ার মুখাবয়ব বিবর
(মসিলিপ্ত স্থান)

উপগোত্রের সমস্ত সাপের মাথার দু' পাশে নাসারন্ধ্র ও চোখের মধ্যস্থলে এবং ময়াল সাপের ও কোনও কোনও উপকাল সাপের ওষ্ঠে এই বিবর থাকে।

এই সব সাপের চোখ বেঁধে দিয়ে দেখা গেছে, দেখতে না পেলেও কাছের কোন তাপমোচী প্রাণীকে আঘাত করতে এদের কোন অসুবিধাই হয় না। তাপমোচী প্রাণীর দেহের তাপ সাপের দেহের তাপের চেয়ে সামান্য বেশী হলেই সাপের মুখাবয়ব বিবরে তা' ধরা পড়ে।

সবিবর বোড়ার মুখাবয়ব বিবরের একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে। বাতাসের কম্পনও এই বিবরে ধরা পড়ে। কোন শত্রু বা শিকার কাছে চলাচল করলে সবিবর বোড়া তাকে দেখতে না পেলেও বাতাসের কম্পন অনুভব ক'রে তার উপস্থিতি বুঝতে পারে।

সাপের মুখাবয়ব বিবর সম্পর্কে যে ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে, তার কথা বলি। কোন সবিবর বোড়া বা ময়াল সাপের চোখ বেঁধে দেওয়া হ'ল—যাতে সে মোটেই দেখতে না পায়। কিছুদূরে লুকনো একটি তপ্ত ইলেকট্রিক চিমনিতে ঐ সাপ ঠিক গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল। চোখে তো দেখতে পাচ্ছে না—তবে সাপ তপ্ত ইলেকট্রিক চিমনির খোঁজ পেল কেমন ক'রে? চোখ তো বন্ধ রইলই, তার নাসারন্ধ্রও বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। দেখা গেল, সাপ একইভাবে তপ্ত ইলেকট্রিক চিমনিতে গিয়ে আঘাত করল। চোখ ও নাসারন্ধ্র বন্ধ রইল—সাপের জিভ কেটে বাদ দেওয়া হ'ল। এক্ষেত্রেও সাপ পূর্বের মত চিমনিতে গিয়ে আঘাত করল। এরপর মুখাবয়ব বিবর বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। আর সাপ চিমনিতে গিয়ে আঘাত করে না। এ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, সাপের মুখাবয়ব বিবর কোন জিনিসের উষ্ণতা ধরতে সমর্থ। তপ্ত জিনিসটি ২০ সেন্টিমীটর থেকে ৫০ সেন্টিমীটর ব্যবধানের

মধ্যে থাকলে এবং চিমনির তাপ আবহাওয়ার তাপের চেয়ে মাত্র ০·২ ডিগ্রী বেশী হলে সাপের মুখাবয়ব বিবরে তা' ধরা পড়ে।

সাপ চলে কেমন ক'রে ?

সাপের পা নেই, অথচ সাপ বেশ চলতে পারে! অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্তে এসেছিল, শুটিপোকা যেমন তার বহু পদের ওপর ভর ক'রে চলে, সাপও বুঝি তার বহু পাঁজরার ওপর ভর ক'রে চলে। পার্থক্য এই যে, শুটিপোকার পা দেখা যায়, কিন্তু সাপের পাঁজরাগুলো লুকনো থাকে ত্বকের তলায়। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। অনেকে আবার মনে করেন, সাপ বুঝি তার পেট উঁচু-নীচু ক'রে চলে। তাও ঠিক নয়।

সাপ পেটে ভর দিয়ে কিলবিল ক'রে চলে। যে পথ দিয়ে সাপ চলে, সাপের পেটের প্রতি অংশ সে পথ ছুঁয়ে চলে। কোন জায়গায় সাপের পেট ভূমি ছেড়ে ওঠে না; সমস্ত পেট সব সময় ভূমি ছুঁয়ে থাকে। এ যেন ডাঙায় সাঁতার কাটা। জলে সাঁতার কাটার সময় আমরা যেভাবে এগিয়ে যাই, সাপ ডাঙায় সেভাবে চলে। দেখলে মনে হয় সাপের দেহের ওপর দিয়ে যেন ঢেউ খেলে চলেছে। এই ঢেউ খেলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জোর আনে সাপ দেহকে উঁচু-নীচু ক'রে নয়—দেহকে পাশাপাশি মোচড় দিয়ে। সাপের চলার এই হ'ল সাধারণ রীতি। একে আমরা পার্শ্বিক তরঙ্গায়িত গতি বলি। সর্পসুলভ গতি বলতে আমরা যা' বুঝি, এ হ'ল তাই।

বলা বাহুল্য, খসখসে এবড়ো-খেবড়ো জায়গাতেই সাপ ভাল চলতে পারে। আমরা বলতে পারি, সাপের শিকারের পক্ষে পালাতে যে পথ যত অসুবিধাজনক, সাপের পক্ষে তাকে ধাওয়া

করতে সে পথ তত সুবিধাজনক। কাচ বা ঐ ধরনের কোন মসৃণ জায়গায় সাপের পক্ষে চলাফেরা করা বেশ শক্ত। সম্পূর্ণ মসৃণ জায়গায় সাপ আদৌ চলতে পারে না। বিস্তৃত মসৃণ কাচের ওপর কোন সাপকে ছেড়ে দিলে সে একটু-আধটু নড়াচড়া করবে, ফোঁসফোঁস শব্দ ক'রে বিরক্তি প্রকাশ করবে—কিন্তু সেই কাচের বাইরে আসা তার পক্ষে শক্ত হবে।

সাপ যখন জোরে চলে বা ছোটে, দ্রুত তার দেহকে পাশাপাশি মোচড় দিতে থাকে। এতে ভূমির প্রত্যেক খসখসে স্থানটির সুযোগ নিয়ে সাপ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

আলগা মাটি, ধুলো বা বালির ওপর দিয়ে সাপ চ'লে গেলে সাপ কোন্ পথ ধ'রে গেছে নির্দেশ পাওয়া যায়। আলগা

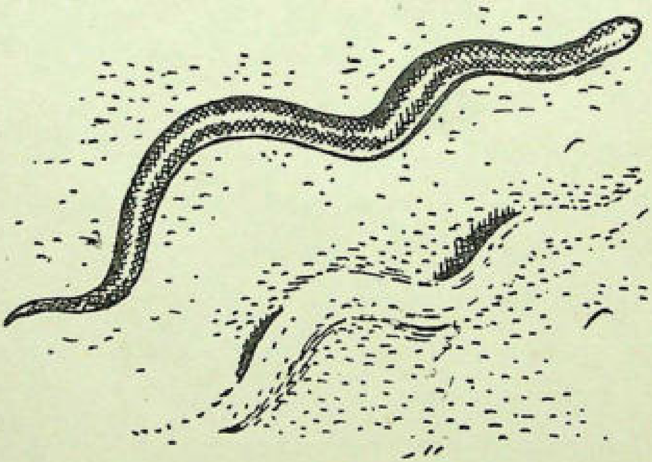

চলার পথে মাটির খিলান

মাটির ওপর দিয়ে গেলে বাঁকা পথে আলগা মাটির খিলান দেখা যায়। যেদিকে সাপ মুখ ক'রে থাকে, তার উলটো দিকে পেছনে পাশ চাপ দিয়ে সাপ এগিয়ে যায়, আর সেই চাপে আলগা মাটিব খিলান গ'ড়ে ওঠে।

সাপের চলার সাধারণ রীতি এরূপ হলেও এবং সব সাপ

এভাবে চলতে পারলেও কোন কোন সাপ অন্যভাবে—আরও তিন প্রকারে চলতে পারে। সুতরাং সাপের চলার ধরন মোট চার প্রকার বলতে পারি, অবশ্য শেষ তিন প্রকার প্রথমটিরই হেরফের। এই তিন প্রকার চলার কথা বলি।

কোন কোন মোটা সাপ শিকার ধরার সময় এবং অন্য সময়ও সাধারণ রীতির আশ্রয় না নিয়ে আর একভাবে চলে। তারা দেহটাকে সোজা রেখে সোজা এগিয়ে যায়। পেটের ও পাশের চামড়া বেশ একটু আলগা থাকায় এবং পেটে চওড়া আঁশ থাকায় এসব সাপের দেহের সামনে বা পেছনের দিকে সংকোচন-প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। এসব সাপ পেটের আঁশ সামান্য তুলে এগিয়ে গিয়ে আবার নামিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়া ঢেউয়ের মত সাপের সারা দেহে চলতে থাকে। সাপের পেটের আঁশ খসখসে মাটি আঁকড়ে ধরে না—মাটি ও আঁশের সামান্য ঘর্ষণেই সাপ চলতে থাকে। সাপের দেহের পাঁজরা এ ব্যাপারে সরাসরি সাহায্য করে না। সাপের দেহের চামড়া আর তার সঙ্গে লাগোয়া পেশীই সাপকে এই চলার ব্যাপারে সাহায্য করে।

যেসব সাপের চামড়া শক্ত ক'রে গায়ে আটকানো, তারা এভাবে চলতে পারে না। সাপের চলার সাধারণ রীতির চেয়ে এ চলা আস্তে হয়।

ময়াল, অ্যানাকণ্ডা ইত্যাদি মহোরগ ও চন্দ্রবোড়া-আদি বোড়া—এ দুটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সাপ ছাড়া আরও কোন কোন সাপ এভাবে চলতে পারে। ময়াল ও চন্দ্রবোড়া সাপ এভাবে বেশ ভাল ক'রেই চলতে পারে, কিন্তু ঢেমনা সাপের পক্ষে এভাবে চলা সম্ভব নয়।

স্থানবিশেষে সাপ আর একভাবে চলে। যেসব জায়গা পিছল অথবা যেখানে খুব কম জায়গার মধ্যে নড়াচড়া করতে

হয়, সেখানে সাপ তার লেজ কোন কিছুতে আটকে দেহের সমুখভাগ এগিয়ে নিয়ে মাথা ও ঘাড় দিয়ে কোন কিছু ধরে। তারপর দেহের পশ্চাৎভাগ টেনে নিয়ে সে জায়গায় সংলগ্ন করে। আবার সমুখভাগ এগিয়ে নিয়ে আর একটা কিছু ধরে, আর পশ্চাৎভাগ টেনে নেয়। এভাবে সাপ এগিয়ে যেতে থাকে। খাঁচায় সাপকে লক্ষ করলে সাপের এ ধরনের চলন দেখা যায়। কাছাকাছি কোন শিকার রয়েছে, তাকে ধরতেও সাপ এভাবে চলে।

কোন কোন সাপ—প্রধানতঃ মরুভূমির সাপ আর একভাবে চলে। মরুভূমিতে থাকে আলগা বালি। সাপের চলার সাধারণ রীতি আলগা বালিতে ব্যাহত হয়। কার্যতঃ এসব সাপ পার্শ্বের দিকে চলে। তারা দেহ ফুলিয়ে নেয়; তারপর সেই স্ফীত বাঁকানো দেহ পার্শ্বের দিকে নিক্ষেপ করে—বালির ওপর দেহটা যেন দ্রুত বুলিয়ে এগিয়ে যায়।

এসব সাপ ধড়ের মধ্যরেখা থেকে একদিকে এগিয়ে যায়। এভাবে চলার সময় সাপের দেহ থাকে S আকারে গুটানো, আর তার মুখ বাড়ানো থাকে সাপ যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে। এ সাপ চ'লে যাওয়ার পর সেখানকার বালি লক্ষ করলে দেখা যাবে, আড়াআড়িভাবে প্রায় সোজা সমান্তরাল কয়েকটি রেখা পড়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, এ সব সাপের দেহের মাত্র দুটি অংশ কোন সময়ে বালিতে ঠিক লেগে থাকে, দেহের অবশিষ্ট অংশ আলতোভাবে লেগে থাকে অথবা আদৌ লেগে থাকে না। রেখাগুলি যেখান থেকে আরম্ভ হয়, সে প্রান্ত হুকের মাথার মত বাঁকা থাকে। বাঁকানো ঘাড়ের ছাপ ব'লে ঐরকম দেখতে হয়। আলগা বালির ওপর সাপ সাধারণ রীতিতে গেলে পথে যে বালির খিলান তৈরী হয়, এক্ষেত্রে তা' হয় না। অনুভূমিকভাবে যেতে

সাপকে যে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, এক্ষেত্রে তা' আর করতে হয় না।

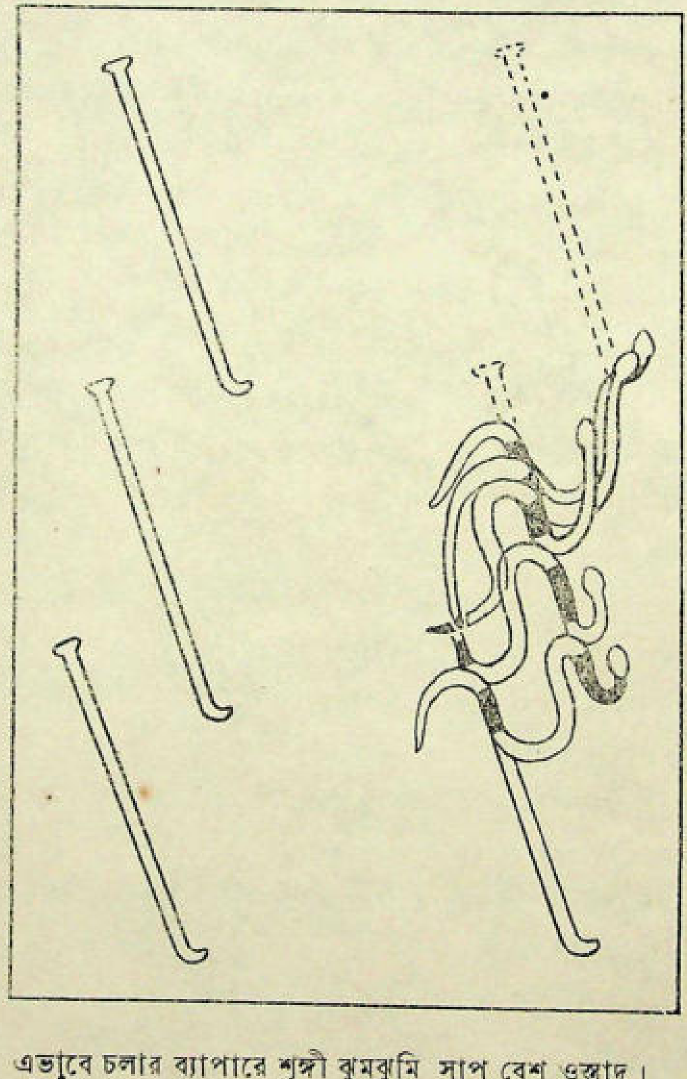

মরুভূমিতে শৃঙ্গী ঝুমঝুমি সাপের চলন

এভাবে চলার ব্যাপারে শৃঙ্গী ঝুমঝুমি সাপ বেশ ওস্তাদ।

জলেও সাপের চলাফেরার কোন অসুবিধা হয় না। সব সাপই সাঁতার কাটতে পারে। কোনরূপ নড়াচড়া না ক'রেও

প্রায় দু' ঘণ্টা পর্যন্ত সাপ জলের তলায় থাকতে পারে। কয়েক জাতের সাপ তো জলেই বাস করে। স্বাদুজলের সাপ ভয়ে লুকতে বা শিকার ধরতে জলের একদম তলায় যায়। লেজ নৌকোর হালের মত চেপটা হওয়ায় সামুদ্র-সাপের সাঁতার কাটা খুবই সুবিধা হয়।

জলে সাঁতার কাটার সময় অন্য সব প্রাণীকে দেহের বিশেষ ভঙ্গিমার সাহায্য নিতে হয়। সাপের তা' দরকার হয় না। ডাঙায় যেমন, জলেও সাপ সেভাবে কিলবিল ক'রে চলতে থাকে। আগেই বলেছি, সাপের ডাঙায় চলা সাঁতার কাটারই অনুরূপ। অবশ্য সাপের জলে ভেসে থাকার সবচেয়ে বড় সুবিধা, তার দেহের ওজন জলের বিস্তৃত স্থান অধিকার ক'রে পড়ে।

ডাঙার সাপ জলে বেশ সাঁতার দিতে পারে। কিন্তু সামুদ্র-সাপ ডাঙায় পড়লে অসহায় হয়ে পড়ে—ভাল ক'রে আর নড়াচড়া করতে পারে না। কোন কোন স্বাদুজলের সাপও ডাঙায় ভালভাবে চলতে পারে না।

ভূনিম্নবাসী কয়েক জাতের সাপ ছাড়া প্রায় সব সাপই গাছে উঠতে পারে; কোন কোন সাপ তো তাল-নারকেল গাছে গিয়েও ওঠে। কাণ্ডের এবড়ো-খেবড়ো ছাল তাদের ওপরে উঠতে সাহায্য করে। যেসব সাপ খুব ভালভাবে গাছে উঠতে পারে, তাদের কারও কারও পেটের আঁশের গঠন এমন যাতে বঁড়শির কাজ করে। এতে গাছের ছাল আঁকড়ে ধ'রে সাপের গাছে ওঠা খুব সহজ হয়।

ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃক্ষবাসী কয়েকটি সাপ উড়তে পারে। উড়ে যেতে পারে বললাম, কিন্তু আসলে এরা ঠিক উড়ে যায় না। এক গাছ থেকে আর এক গাছে অথবা মাটিতে বাতাসে ভেসে যায়। বাতাসে ভেসে যাওয়ার সময় এসব সাপ বেলনাকার দেহকে বেশ খানিকটা চেপটা করে এবং পেটের

তলদেশ টেনে নেয় যাতে খাল পড়ে। এতে ভেসে যাওয়ার সুবিধা হয়। শূন্যে এসব সাপের গতি বাতাসে ভাসমান বিমানচ্ছত্রের গতির অনুরূপ।

উড়ে যেতে পারে ব'লে এসব সাপকে উড়ুক্কু সাপ বলা হয়। এক গাছের মাথা থেকে ৩ মীটর দূরের আর এক গাছের মাথায় উড়ুক্কু সাপ উড়ে যেতে পারে। গাছের পাশ দিয়ে ছোট পাখি উড়ে যাচ্ছে—উড়ুক্কু সাপ সেই গাছ থেকে উড়ে গিয়ে সেই উড়ন্ত পাখিকে ধরেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। ৩০ মীটর উঁচু গাছের ডাল থেকে বাতাসে ভেসে এসে মাটিতে নেমে এসব সাপ শিকার ধরতে পারে। কালনাগিনী, বেতআছড়া ইত্যাদি উড়ুক্কু সাপ।

অধিকাংশ সাপই রাত্রিচর। তবে কোন কোন সাপ খাদ্যের অন্বেষণে দিনের যে কোন সময়ে বের হতে পারে।

সামনের পা দিয়ে অধিকাংশ জন্তু-জানোয়ার তাদের হাতের কাজ সারে। সাপের পা নেই—সুতরাং হাতও নেই। হাতের অভাব পূরণ করে সাপ তার লম্বা দেহ দিয়ে। কোন কিছু ধরতে হলে সে তার লম্বা দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

আজ সাপের পা নেই। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন সাপের পা ছিল। আজও সাপের দেহ ব্যবচ্ছেদ করলে তার চিহ্ন ভেতরে রয়ে গেছে দেখতে পাওয়া যায়। ময়াল-আদি মহাকাল উপগোত্র, অ্যানাকণ্ডা-আদি উপকাল উপগোত্র এবং নলক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সাপের ধড়ের ও লেজের সন্ধিস্থলে দু' পাশে দুটি নিষ্ক্রিয় ক্ষুদ্র নখরাকৃতি উদ্গত দেহাংশ থাকতে দেখা যায়। একসময়ে যে সাপের পা ছিল, এ দুটি তার পেছন পায়ের নিদর্শন। সাপের চলার ব্যাপারে এ দুটি এখন কোন কাজে লাগে না। সম্পূর্ণ অকেজোভাবে সাপের দেহের খাঁজে লুকনো থাকে। কোন কোন সাপের ক্ষেত্রে এই উদ্গত অংশ দুটি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

সাপ বাস করে গভীর ঝোপঝাড়ের মাটির তলায়। অনুরূপ স্থানে দেহ থেকে বেরিয়ে পড়া কোন অঙ্গ অসুবিধারই সৃষ্টি করে। সেজন্যে সাপের পা লুপ্ত হয়ে গেছে। পার্শ্বিক তরঙ্গায়িত চলনই সাপের পরিবেশের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল।

আমাদের অন্তঃকর্ণে তিনটি অর্ধবৃত্ত নালী আছে। দাঁড়ানো বা চলার ভারসাম্যে এই নালী সাহায্য করে। সাপের অন্তঃকর্ণেও এই তিনটি অর্ধবৃত্ত নালী আছে। সাপের মাথার খুলি তেমন শক্ত নয়, সহজেই আহত হয়। সাপের মাথায় আঘাত করলে এই নালী নষ্ট হয়ে যায়। তখন সাপ আর ভারসাম্য রাখতে পারে না; এক জায়গায় ক্রমাগত ঘুরতে থাকে।

গতির বেগ ঃ আমাদের কেমন একটা ধারণা আছে, সাপ বুঝি খুব জোরে ছোটে। এমন কি মানুষের চেয়েও জোরে ছোটে। একথা ঠিক নয়। যেসব সাপ জোরে ছোটে, তাদের মধ্যে কোনটা কোনটা ঘণ্টায় খুব বেশী সাড়ে পাঁচ কিলোমীটার যেতে পারে। খুব বেশী ভয় পেলে এর চেয়ে আরও কিছু জোরে ছুটতে পারে। কারও কারও মতে অ্যাফ্রিকার মাম্বা সাপ ঘণ্টায় ১২ কিলোমীটার পর্যন্ত বেগে যায়। সেক্ষেত্রে মানুষ তো অনেক জোরে ছোটে; দ্রুতগামী মানুষ ঘণ্টায় ৩৩ কিলোমীটার যায়। ঐ দ্রুতগামী মাম্বা সাপেরই সাধারণ গতি ঘণ্টায় মাত্র ৪০০ মীটার।

ভারতে শঙ্খচূড়ই সবচেয়ে দ্রুতগামী সাপ ব'লে গণ্য হয়। কিন্তু মাঝারি দৈর্ঘ্যের একটা ঢেমনা সাপও শঙ্খচূড়েরই মত জোরে ছুটতে পারে। সমতলভূমিতে পলায়নরত ঢেমনা সাপকে ধরতে মানুষকে নিরুদ্ধশ্বাসে ছুটতে হয় না।

উপরন্তু সাপের রক্তে অক্সিজেন প্রবেশের হার খুব মন্থর ব'লে সাপ বেশীক্ষণ দৌড়তে পারে না। সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সাপ সাধারণতঃ আস্তে-আস্তেই যায়।

কোন মানুষ কোন সাপকে ধরতে গেল। সাপটি ছুটতে

লাগল, মানুষটিও ছুটতে লাগল। দেখা গেল, সাপটি জোরে ছুটে কোন গর্তে লুকিয়ে পড়ল। এ সম্ভব হয় যখন জমি থাকে এবড়ো-খেবড়ো, আর সাপটা ঝোপে-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ছোটে।

সাপ খুব জোরে ছোটে, এ ভুল ধারণা হওয়ার কারণ আছে। সাপ সম্বন্ধে আমাদের যে অত্যধিক ভয় আছে, সেই ভয়ে সাপের যা' কিছু, তা' আমরা অজানতে অতিরঞ্জিত দেখি। সাপের দেহ লম্বা লিকলিকে; এতে আমাদের চোখও তার গতি ঠিক করতে ভুল করে।

তা' ছাড়া যে পরিবেশে সাপকে আমরা সাধারণতঃ ছুটতে দেখি, সে পরিবেশে বিভ্রম ঘটার খুবই সম্ভাবনা। একটা খোলা জায়গা দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে গেল; ঐ গাড়িই একই বেগে এক সারি গাছের পাশ দিয়ে গেল; শেষোক্ত ক্ষেত্রে গাড়িটি অধিকতর বেগে ছুটে গেল ব'লে মনে হবে। এই ভুল হওয়ার কারণ গাছের সারি। নিশ্চল গাছের সারির পরিপ্রেক্ষিতে চলন্ত গাড়ির বেগ বেশী ব'লে ভুল হয়। সাপকেও আমরা ছুটতে দেখি সাধারণতঃ গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে; সেজন্যে সাপের বেগকেও আমরা অতিরঞ্জিত ক'রে বসি।

একটি সাপ খোলা মাঠ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। কেউ বলল, সে ঘন্টায় ১৫ কিলোমীটর বেগে ছুটেছে, কেউ বা বলল ঘন্টায় ২০ কিলোমীটর। কিন্তু বিরাম-ঘড়ি দেখে জানা গেল, সাপটি ছুটেছে ঘন্টায় মাত্র ৫ কিলোমীটর বেগে।

দ্রুত ধাবমান মানুষ—এমন কি ঘোড়াকে সাপ ছুটে গিয়ে ছোবল দিয়েছে, এ ধরনের গল্পের কোন ভিত্তি নেই। ভয়ে অথবা ঝোপঝাড়ে পা আটকে মানুষটি ছুটতে না পারে আলাদা কথা।

সাপের ডাকঃ সাপের "গর্জন" আমরা বলি, কিন্তু

ঠিকভাবে বলতে হলে সাপ ডাকতেই পারে না। শব্দ করতে হলে বাগ্‌যন্ত্র থাকা চাই। সাপের তা' নেই। সুতরাং সাপের প্রকৃত স্বর নেই।

সাপ ভীত বা ত্যক্ত হলে জোরে শ্বাস নিতে থাকে। ফুসফুসে বেশী পরিমাণ বাতাস টেনে নিয়ে নাসারন্ধ্র দিয়ে জোরে বের ক'রে দেয়—তাতেই হিসহিস শব্দ হয়। সাপ যদি বড় আর মোটা হয়, তা' হলে এই হিসহিস শব্দ খুব জোরে শোনা যায়—বেশ খানিকটা দূর থেকেও শোনা যায়। সাপের শ্বাসরন্ধ্র তথা শ্বাসনালী মুখের ভেতর দিয়ে গলার গহ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শ্বাসরন্ধ্রকে সাপ ইচ্ছামত সংকুচিত-প্রসারিত করতে পারে; শ্বাসরন্ধ্র সংকুচিত-প্রসারিত ক'রে সাপ বাতাস ছেড়ে দেয় আর টেনে নেয়। তাতেই জোরে শব্দ হয়।

বেশির ভাগ সাপ নীরব থাকে—কোন শব্দ করে না। বিভিন্ন সাপ তার প্রকৃতি অনুযায়ী হিসহিস শব্দ করে। চন্দ্রবোড়া সাপ খুব জোরে শব্দ করে। বনবাদাড়ে চন্দ্রবোড়া হিসহিস করলে অনেক দূর থেকে শোনা যায়—গাঁয়ের লোকে বলে সাপে "শিষ" দিচ্ছে। উত্তর আ্যাফ্রিকার ফুৎকারী সাপ সামান্য ত্যক্ত হলেই খুব জোরে শব্দ করে। ময়ালাদি বড় সাপের শব্দের কাছে অবশ্য কোন সাপেরই শব্দ ঘেঁষে না। পাহাড়ের ওপর শায়িত বিশাল ময়াল সাপের হিসহিস শব্দ পথচারীর মনে "গর্জন" ব'লে মনে হলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

অবশ্য সাপের গর্জন কথাটার আর একভাবে উৎপত্তি হতে পারে। গর্তে সাপ থাকলে অনেক সময় আমরা লাঠি ঢুকিয়ে খোঁচা দিই। তাতে সাপ ত্যক্ত হয়ে হিসহিস করে। সেই শব্দ স্বল্পপরিসর গর্তের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের কানে বাজে। তাতেই হিসহিস শব্দটা খুব জোরাল হয়—মনে করি

সাপ বুঝি গর্জন করছে। চক্রধর সাপ আঘাত করার ভান ক'রে তীক্ষ্ণ—প্রায় আমাদের হাঁচির মত হিস শব্দ করে।

কোন কোন সাপের অধিজিহ্বার ঠিক সমুখে একটা তরুণাস্থি থাকে। সে সাপ যখন জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করে, তখন এই তরুণাস্থির কম্পনে শব্দ হয়।

ত্যক্ত অথবা অসুবিধাজনক পরিবেশে পলায়নে অক্ষম ঢেমনা সাপ মুখে একপ্রকার শব্দ ক'রে বিরক্তি দেখায়, এ ধরনের কথা অনেকে বলেছেন। এসময়ে ঐ সাপ ঘাড়ও ফুলিয়ে থাকে। কেউ কেউ ময়াল সাপেরও এই প্রকারের শব্দ শুনেছেন ব'লে বলেছেন। এই শব্দ মোটেই হিস শব্দ নয়—কতকটা ও-ও-ম শব্দ।

কোন কোন সাপ আবার অন্যভাবে শব্দ করে। ত্যক্ত বা ভীত হলে অনেক সাপই জোরে লেজের শেষাংশ নাড়তে থাকে; তাতে আশপাশের গাছপালায় লেজ ঘ'ষে যাওয়ায় ভনভন শব্দ হয়। একটা ঢেমনা সাপে ব্যাং কামড়ে ধরেছিল; সাপটাকে ত্যক্ত করায় সে জোরে লেজ নাড়তে থাকে; আশপাশের শুকনো পাতায় সে লেজ লেগে যে শব্দ সৃষ্ট হয়, তা' দেড় মীটর দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়। ঝুমঝুমি সাপ লেজের কম্পনে ঝুমঝুমি শব্দ করে। ফুরসা সাপ গায়ের আঁশ একটার সঙ্গে আর একটা ঘ'ষে শব্দ করে।

নিদ্রা: অন্য প্রাণীর মত সাপও নিদ্রা যায়। আগেই বলেছি, সাপের চোখ কখনও বন্ধ হয় না; বন্ধ হওয়ার উপায়ই নেই। তবে তার তারারন্ধ্র দেখে বোঝা যেতে পারে, সে নিদ্রা যাচ্ছে। তারারন্ধ্রটির অবস্থান স্বাভাবিক স্থানে থাকে না, একটু শিথিল হয়ে পড়ে। তারারন্ধ্রটি কখনও একটু উঁচুতে, কখনও একটু নীচুতে, কখনও একটু সমুখে, কখনও বা একটু পেছনে স'রে থাকে। সব সাপ যে কোন গর্তে বা আড়ালে গিয়ে নিদ্রা যায়, তা' নয়। কোন কোন সাপ খোলা জায়গায় মাটির ওপর, গাছের ডালে অথবা জলে ভাসমান ডাল-পাতার ওপর শুয়ে নিদ্রা যায়।

খাদ্য আহরণ

সাপের মাথা দেখলে মনে হয় সাপের মুখ বুঝি ছোট। একথা ঠিক নয়। সাপের মাথার তুলনায় সাপের মুখ বা হাঁ অনেক বড়। সাপ তার দেহের ছয়-সাত গুণ বড় শিকার গিলতে পারে।

কিভাবে এ সম্ভব হয়? আমাদের নীচের চোয়ালের দু' পাশের অস্থি সমুখের দিকে চিবুকের কাছে শক্ত ক'রে আটকানো—সাপের সেরকম নয়; সাপের নীচের চোয়ালের দু' পাশের অস্থি সমুখের দিকে সংকোচন-প্রসারণশীল স্নায়ু দিয়ে জোড়া। নীচের চোয়াল ওপরের চোয়ালের সঙ্গেও শক্ত ক'রে আটকানো নয়। মাথার খুলির ছোট ছোট অস্থিও ছাড়াছাড়া—আলগাভাবে আটকানো। এসব কারণে সাপ তার মাথার তুলনায় খুব বড় হাঁ করতে পারে—এবং নিজের মুখের বা দেহের ব্যাসের তুলনায় বড় ব্যাসের শিকারও গিলতে পারে।

ময়ালাদি সাপ ৭০ কিলোগ্রাম ওজনেরও শিকার গিলে ফেলার ক্ষমতা রাখে। সাপের পক্ষে এ-ই সর্ববৃহৎ গ্রাস ব'লে মনে হয়।

কোন কোন সরু সাপ পাখির বড় ডিম না ভেঙেও আস্ত গিলে খায়। পাকস্থলীতে গিয়ে সে ডিম ভেঙে যায়। যেসব অঞ্চলে এই ধরনের সাপের খুব উপদ্রব, সেখানকার লোকেরা হাঁস-মুরগীর ঘরে কৃত্রিম বড় ডিম রেখে দেয়। সাপ সে ডিম গেলে। দেহের মধ্যে সে ডিম আর ভাঙে না। ডিম যে জায়গায় থাকে, সাপের দেহ সেখানে ফুলে থাকে। সাপ যে সরু ছোট গর্ত দিয়ে হাঁস-মুরগীর ঘরে ঢোকে, তার মধ্যে দিয়ে আর বেরতে পারে না। ফলে পরদিন ভোরে ধরা পড়ে—আর নিহত হয়।

সাপ যে তার দেহের তুলনায় বড় শিকার গিলতে পারে, তার আরও কয়েকটি কারণ লক্ষণীয়। সাপের উরঃফলক নেই ; সুতরাং দেহের মধ্যে কোন বড় শিকার টেনে নেওয়ার অসুবিধা হয় না। সাপের পিঠের ও দেহের পাশের চামড়া নরম স্থিতিস্থাপক ; সুতরাং প্রয়োজন হলে তা' বেশ প্রসারিত হয়; বড় শিকার গেলার সময় সাপের দেহের আঁশের সারি একটা থেকে একটা দূরে স'রে গেছে তা' বেশ লক্ষ করা যায়। সাপের পাকস্থলী ও গ্রাসনালীর চামড়াও পাতলা এবং সহজে প্রসারিত হয়। শ্বাসরন্ধ্র মুখের অনেক সমুখের দিকে থাকায় বড় শিকার গেলার সময়ও শ্বাসের বাতাস নিতে সাপের অসুবিধা হয় না।

বস্তুতঃ আমরা আমাদের মুখ অনুযায়ী খাদ্যের গ্রাস তুলি, আর সাপ তার খাদ্যের আয়তন অনুযায়ী মুখের গহ্বর প্রসারিত করে। এই প্রসারণ অনেক সময় এতদূর যায় যে, সাপের ঊর্ধ্ব চোয়াল ও নিম্ন চোয়াল এক সমতলে এসে পড়ে অর্থাৎ ঘাড়ের সঙ্গে লম্ব হয়।

দাঁত থাকা সত্ত্বেও সাপ তার শিকার চিবিয়ে খায় না—আস্ত গিলে খায়। শিকার তার দাঁতে আটকে গেলে নিম্ন চোয়ালের ছ' সারি দাঁত—একবার একপাশের দাঁত, পরের বারে অপর পাশের দাঁত ক্রমান্বয়ে শিকারের গায়ে বিঁধিয়ে সাপ তার মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুতঃ সাপ শিকারকে ঠিক গলাধঃকরণ করে না—নিজেকে শিকারের দেহের ওপর টেনে নেয়। বড় শিকার গিলতে ময়ালাদি সাপের কিরকম কসরৎ করতে হয়, তা' তাদের চোয়ালের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। শিকার গেলার পরও চোয়াল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না— ফিরে আসতে কখনও কখনও আধঘন্টাও লেগে যায়। বলা বাহুল্য, সাপের নিম্ন চোয়ালের ছ' পাশ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে সমর্থ। একবার মুখ অতিক্রম করলে সাপ দেহের পেশীর সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা শিকারকে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দেয়। শিকার

গেলার সময় সাপের জিব কোন কাজে আসে না। জিবটা তখন তার আবরণের মধ্যে ঢোকানো থাকে।

সাপ আমিষাশী জীব। পোকা-মাকড়, টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাং, কাঠবিড়াল, ইঁদুর, খরগোশ, পাখি, ডিম, মাছ—এসব সাপ খেয়ে থাকে। বড় সাপ মাঝারি আকারের হরিণ-ছাগলও খায়। কোন কোন সাপ অন্য সাপও খেয়ে থাকে।

জ্যান্ত প্রাণীই সাপের খাদ্য। মরা প্রাণীও সাপ খেতে পারে। ফলমূল সাপ খায় না, কদাচিৎ ভুল ক'রে অথবা কোন জন্তু-জানোয়ার গেলার সময় আকস্মিকভাবে যদি খেয়ে ফেলে।

কোন কোন সাপ আছে যারা মাত্র তাপগ্রাহী প্রাণীই খেয়ে থাকে। তাপমোচী প্রাণী পেলেও তারা খায় না—বরং উপবাস করবে। তেমনি কোন কোন সাপ আছে যারা মাত্র তাপমোচী প্রাণীই খেয়ে থাকে, তাপগ্রাহী প্রাণী খায় না। অবশ্য অধিকাংশ সাপই তাপমোচী ও তাপগ্রাহী—যে কোন এক ধরনের প্রাণী খেতে পছন্দ করলেও অন্য ধরনের প্রাণী খেতেও ইতস্ততঃ করে না।

যারা তাপমোচী প্রাণী খায়, তাদের তুলনায় যেসব সাপ তাপগ্রাহী প্রাণী খায় তাদের হজম করার ক্ষমতা বেশী ব'লে মনে হয়। তাদের অপেক্ষাকৃত কম সময় অন্তর অন্তর খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

সাপের পাচক রস খুব শক্তিশালী। পশু-পাখিদের চামড়া, পালক, হাড়, ডিমের খোলা—এমন কি মাথার শিং পর্যন্ত সাপ হজম করতে পারে। কিন্তু পশুর লোম বা চুল হজম করতে পারে না; জন্তুদের খুরও হজম করতে পারে না। হজম করার ক্ষমতা বেশী হলেও হজমটা হয় অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে।

একটি ময়ালকে পায়রা খেতে দেওয়া হয়। পায়রাটি খাওয়ার পর ঐ সাপ যে মল ত্যাগ করে, তাতে অনেকগুলি গমের বীজ

পাওয়া যায়। পায়রার হাড় হজম হয়ে গেলেও গমের বীজ হজম করতে সাপের পাচক রস তাকে সাহায্য করে নি।

কোন কোন সাপ গাছের ফল খেয়েছে, দৃষ্টান্ত তার পাওয়া যায়। আসামের এক চা-বাগানে শ্রমিকরা একটি ময়ালকে আম খেতে দেখেছিল! তখন জুন মাস, ঠিক সন্ধ্যের আগে—এক আমগাছের তলায় ময়ালটি শুয়েছিল। সেই গাছ থেকে পড়া একটি আম ময়ালটি গিলছিল। সাপটিকে হত্যা করার পর তার গ্রাসনালীতে চারটি আস্ত আম পাওয়া গেছল। এ থেকে বোঝা যায়, সাপটি পরপর চারটি আম গিলেছিল।

এখন প্রশ্ন হ'ল, ময়াল আম খেতে গেল কেন? সাপ তো আমিষাশী। আমগুলি ভাল ক'রে পরীক্ষান্তে দেখা গেল, তাদের খোসায় কোন কোন কীটের শূক লেগে আছে। এই শূক খেতে গিয়েই কি সাপটি আমগুলি গিলেছিল?

তা' মনে হয় না। গাছ থেকে আমগুলি পড়েছিল একটার পর একটা, আর সাপ সেগুলি টপাটপ গিলেছিল নিজের শিকার ভেবে—কোন জন্তু ভেবে। বলা বাহুল্য, কোন সাপই জেনেশুনে আম খেতে পারে না।

গাঁয়ের সাধারণ লোকদের মুখে অনেক সময় সাপে-খাওয়া ফলের কথা শোনা যায়। এর একমাত্র অর্থ হতে পারে, কোন সাপ হয়তো ঐ ফলটা কামড়ে ধরেছিল, কিন্তু তার খাদ্য নয় জানার পর সেটাকে ছেড়ে দিয়েছিল—সেটাকে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

শিকারের আকার সাপের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিকার খুব ছোট হলে সাপের মুখ থেকেও তা' পালাতে পারে। অবশ্য দাঁতে আটকে গেলে আলাদা কথা। শিকার যদি অপেক্ষাকৃত বড় হয়, তা' হলে তাকে কামড়ে ধরা সাপের পক্ষে সুবিধা হয়। খুব বড় শিকার হলে অবশ্য সাপ তাকে ক্রমে ক্রমে থেমে থেমে গিলতে

থাকে। বড় শিকারের ক্ষেত্রে শিকার হয়তো সম্পূর্ণ গেলা হয় নি; অথচ যেটুকু গেলা হয়েছে পাকস্থলীতে তা' হজম হতে আরম্ভ হয়েছে। ব্যাং সহজে মরে না। কোন সাপ একটা ব্যাং গিলতে আরম্ভ করেছে; তার পেছন দিক্‌টাই ধরেছে; পেছনের পা হজম হয়ে গেছে, অথচ ব্যাংটা বেঁচে আছে!

বলা বাহুল্য, শিকারের বড় আকার নয়—শিকারের দেহের গড়নের ওপরই নির্ভর করে তাকে গেলার পক্ষে সাপের সুবিধা হবে কিনা। গড়ন যত লম্বাটে ধরনের, সাপের গেলার পক্ষে তত সুবিধা। বেশির ভাগ জন্তু-জানোয়ার দেহের অনুপাতে লম্বা নয় ব'লে তাদের গেলা সাপের পক্ষে সহজ হয় না। অপরপক্ষে একটা সাপ প্রায় তার দেহের সমানই লম্বা আর একটা সাপ সহজে গিলে

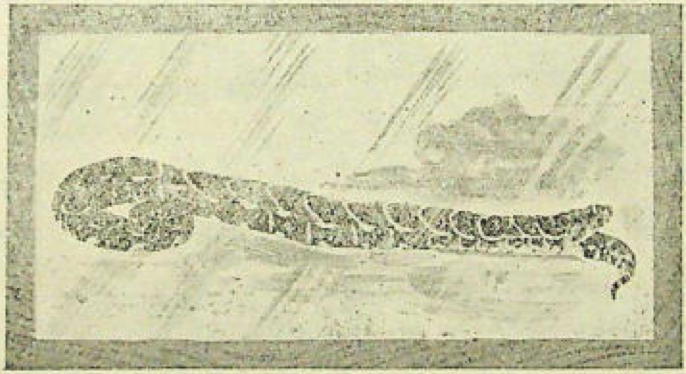

সাপে সাপ গিলছে

ফেলতে পারে। একটি ২ মীটর ৭৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ সাপ তার চেয়ে মাত্র কয়েক সেন্টিমীটর কম দীর্ঘ সাপকে গিলে খেয়েছিল। কোন সাপ তার চেয়ে দীর্ঘ সাপকে গিলে খেয়েছে, তারও দৃষ্টান্ত আছে!

সাপ শিকারের কাছে গিয়ে পড়লে অথবা শিকার সাপের কাছে এসে পড়লে তাকে ধরার জন্যে ঐ সাপ নিম্নলিখিত যেকোনও উপায় অবলম্বন করতে পারে:

সোজাসুজি সাপ শিকারকে কামড়ে ধ'রে জ্যান্ত অবস্থাতেই গিলতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, এই শিকারের দেহ ছোটই হয়ে থাকে। সাপের পাচক রসের ক্রিয়ায় এই শিকার নিহত হয়। সব সাপই কখনও বা কখনও এই উপায় অবলম্বন ক'রে থাকে। কোন কোন সাপ এই উপায় ছাড়া আর কোন উপায়ই গ্রহণ করে না।

সাপ সাধারণতঃ শিকারের মাথার দিক্ ধরে। সব সময়েই যে সাপ শিকারের মাথার দিক্ ধরতে পারে, তা' নয়। বর্ষাকালে ব্যাঙের কাতর ডাক ক্যা-ক্যা কখনও কখনও আমাদের কানে আসে। তখন আমরা বুঝি, সাপে ব্যাং ধরেছে। ব্যাঙের পেছন দিক্‌টা ধরাতেই এত জোরে ব্যাঙের ডাক শোনা যায়।

যেসব সাপের প্রধান শিকার ব্যাং, তাদের ক্ষেত্রে এই উপায়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব সাপের কোন কোনটির পেছনের দাঁত বেশ বড়। ব্যাং সাপের মুখ থেকে যখন আর নিজেকে কিছুতেই ছেনাতে পারে না, তখন সে বাতাস টেনে নিয়ে নিজের পেটটি দেয় ফুলিয়ে। তাকে আস্ত গেলা আর সম্ভব হয় না। তখন ঐ সাপ পেছনের বড় দাঁত দিয়ে ব্যাঙের দেহ ফুটো ক'রে বাতাস বের ক'রে দেয়। ময়াল-আদি সাপ যারা শিকারকে পিষে মারে, তারাও ছোট দুর্বল শিকার পেলে জ্যান্তই গিলে ফেলে।

কোন কোন সাপ দেহের পাক দিয়ে শিকারকে পিষে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মারে; তারপর তাকে গিলতে থাকে। ময়াল-আদি মহোরগ গোত্রের সাপ বড় বড় শিকারের ক্ষেত্রে এই উপায় গ্রহণ করে। পন্নগ গোত্রেরও কোন কোন সাপ শিকারকে পিষে মারে।

কখনও কখনও সাপ শিকারকে ধ'রে চোয়ালের চাপেই হ'ক অথবা মাটিতে বা অন্য কোন বস্তুতে নিজের দেহ দিয়ে চেপেই হ'ক তাকে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মারে।

ঢেমনা, ঘরচিতি ইত্যাদি ক্ষিপ্র সাপ ছুটে গিয়ে শিকার ধরে। শিকার ছুটতে থাকে, সেও তার পেছনে-পেছনে ছোটে। কোন কোন সাপ গোপনে আস্তে আস্তে গিয়ে শিকার ধরে। ময়াল-আদি বড় বড় সাপ কখনও কখনও কোন জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করে; কোন শিকার অজানতে কাছে এসে পড়লে তাকে গিয়ে ধরে।

বিষধর সাপ অবশ্য বিষদাঁত ফুটিয়ে শিকারকে কাবু করে। সাপ তাকে দংশন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে গিলতে পারে। শিকার তেমন-তেমন বড় ও শক্তিশালী হলে সম্মুখ-বিষদন্তী সাপ সেই শিকারকে দংশন ক'রে দূরে স'রে এসে অপেক্ষা করতে পারে; বিষের প্রভাবে শিকার নির্জীব হয়েছে বুঝলে গিয়ে তাকে খেতে আরম্ভ করে। কখনও কখনও ঐ সাপ শিকারকে দংশন ক'রে মুখের কামড় আর খোলে না; মুখেই শিকার নির্জীব হয়ে পড়লে.........ছটফট আর না করলে তখন গিলতে থাকে। পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপকে সাধারণতঃ এরকম করতে দেখা যায়। পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ শিকারকে কামড়ে ধ'রে যতটা সম্ভব মুখের মধ্যে চেপে নেওয়ারও চেষ্টা করে—যাতে তার বিষদাঁত শিকারের গায়ে ফুটে যায়।

সাপ সাধারণতঃ যেখানে শিকার ধরে, সেখানেই তা' গিলতে থাকে। বড় বড় শিকারের বেলায় সাপ এরকম তো ক'রেই থাকে। ময়াল-আদি সাপ শিকার তেমন-তেমন বড় হলে যেখানে ধরে সেখানেই থেকে তাকে হজমও করতে থাকে। বড় শিকার গিলে হজম করতে ময়াল-আদি সাপের ছয়-সাত দিন লেগে যায়। শিকার হজম করার পর সাপ সাধারণতঃ মল ত্যাগ করে।

কখনও কখনও সাপ অবশ্য শিকারকে কামড়ে সুবিধাজনক স্থানে নিয়েও যায়। একটা ঢেমনা সাপকে ব্যাং মুখে

নিয়ে প্রায় ২০ সেন্টিমীটর ঘাড় তুলে সুবিধাজনক স্থানে যেতে দেখেছিলাম।

কোন সাপ শিকার গিলছে—বিশেষ ক'রে কোন বড় সাপ বড় আকারের শিকার গিলছে অথবা প্রায় সম্পূর্ণ গিলেছে, সে সময় তাকে ত্যক্ত করলে ঐ ভীত সাপের মুখ থেকে অনেক সময় শিকার ছুটে যায়। সাপও পালাতে পারে। খাদ্য গ্রহণের সময় সাপ কোনরকমে বিরক্ত হতে চায় না। ত্যক্ত হওয়ার কারণ দূর হলে ঐ সাপ আবার শিকারের কাছে ফিরে আসতে পারে, আর ঐ শিকারকে পুনরায় গিলতে পারে। আত্মরক্ষা বা পালানোর পক্ষে সাপের এতে সুবিধা হয়; শিকার মুখে নিয়ে তো শত্রুর সঙ্গে যোঝা অথবা পালানো সম্ভব নয়।

রাত্রিচর ও ভূনিম্নবাসী সাপ দৃষ্টির চেয়ে জিবের ওপর শিকার চেনায় বেশী নির্ভর করে। একবার একটা কালাচ সাপ একটি ইঁদুরকে ছোবল দিয়েছিল; দষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ইঁদুরটা ছুটে পালিয়েছিল; তবে বেশী দূরে যেতে পারে নি; বিষে ম'রে যায়। সাপটা পথের গন্ধ শুঁখে ঠিক ইঁদুরটাকে গিয়ে খেয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও সাপ সম্পূর্ণ এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ায় না; তার বিচরণে শিকার অন্বেষণের একটা প্রচেষ্টা থাকে; দৃষ্টি, গন্ধ ও কিছুটা অভিজ্ঞতা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে। শিকার কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সাপ কতকটা অনুমান করে। হঠাৎ শিকার পেয়ে গেলাম, সব সময় এরকম ঘটে না।

সাপ কি বায়ুভুক্?

তাপমোচী প্রাণী আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যেমন সুবিধা অর্জন করেছে, আর একদিক্ দিয়ে তেমনি তাদের একটা ঝুঁকিও নিতে হয়েছে। এই ঝুঁকি হ'ল, যথেষ্ট পরিমাণের খাদ্য সংগ্রহ করা। নিছক জীবন ধারণের যে পরিমাণ খাদ্যের

প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী খাদ্য তাদের সংগ্রহ করতে হয় দেহের সুনির্দিষ্ট তাপ রক্ষার ব্যবস্থাকে চালু রাখতে। দেহকে গরম রাখতে যে শক্তির ব্যয় হয়, তা' খাদ্য থেকেই আসে কিনা। অপরপক্ষে তাপগ্রাহী প্রাণী তথা সাপের দেহে সুনির্দিষ্ট তাপ রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই ; সুতরাং দেহে নির্দিষ্ট তাপ রাখতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খাদ্যও সাপকে খেতে হয় না। সেজন্যে দেহের অনুপাতে তাপমোচী প্রাণীর তুলনায় সাপ অনেক কম খায়।

একটা পাখিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সে সব সময়ই মাটিতে ঠোঁট ঠুকরে ঠুকরে খাদ্য খেয়েই চলেছে। অপরপক্ষে বন্য অবস্থায় অনেক সাপ নিয়মিতভাবে প্রতিদিন একবার ক'রেও খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে না। দু-তিন দিন অন্তর একবার খেলেই তাদের যথেষ্ট। একটি বন্দী ময়াল প্রায় ৪ বছর কিছু না খেয়ে বেঁচে ছিল। শীতনিদ্রার তিন-চার মাস সম্পূর্ণ কিছু না খেয়েই সাপ বেঁচে থাকে। অবশ্য শীতনিদ্রার সময় সাপ বাইরে থেকে কোন খাদ্য গ্রহণ না করলেও তার দেহে যে খাদ্য—যে মেদ জমা থাকে, তাই ব্যয় ক'রে সাপ নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখে।

সাপের বেশী খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না ব'লে এবং শীতনিদ্রার সময় সাপ কোন খাদ্য গ্রহণ করে না ব'লে সাধারণ লোকের ধারণা সাপ বুঝি মাত্র বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকে। এজন্যে সাপের একটা নাম "বায়ুভুক্" অর্থাৎ যে বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকে।

চিড়িয়াখানায় আহার : চিড়িয়াখানায় সাপকে সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন খেতে দেওয়া হয়। আলিপুর চিড়িয়াখানারও সেই নিয়ম। আলিপুর চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন সাপকে যে যে ধরনের খাদ্য দেওয়া হয়, তার আভাস দিলাম।

সপ্তাহে ময়ালকে এক একটি মুরগী দেওয়া হয়। শঙ্খচূড়কে খেতে দেওয়া হয় বড় ঢেমনা সাপ। শাঁখামুটিকে খেতে দেওয়া হয় মেটেলি সাপ। চক্রধর ও ঢেমনা সাপকে খেতে দেওয়া হয় ব্যাং। বেলেসাপকে খেতে দেওয়া হয় চড়ুই পাখি। লাউডগা, বেত-আছড়া আর কালনাগিনীকে খেতে দেওয়া হয় টিকটিকি। প্রত্যেক শিকার জ্যান্ত অবস্থায় দেওয়া হয়—কদাচিৎ মেরে দেওয়া হয়। খাদ্যের অবশ্য অদলবদল করা হয়।

বন্দী অবস্থাতেও সাপ শীতনিদ্রায় যায়—এবং সে সময় সে কিছু খায় না। আমাদের অনেকের ধারণা, সাপ বুঝি মৃত জন্তু-জানোয়ার খায় না। একথা ঠিক নয়। বন্দী অবস্থায় সাপ একদিক্ থেকে জ্যান্ত জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে মৃত জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করে—পাছে ঐ শিকার তাকে আঘাত করতে প্রচেষ্ট হয়। তবে এসব জন্তু-জানোয়ার সন্ত-নিহত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন পাখি বা স্তন্যপ ম'রে কাঠ হয়ে গেলে সাপের পক্ষে স্বভাবতঃই তাকে গেলা কষ্টকর। সুতরাং যে শিকারের দেহে মরণ-সংকোচ আরম্ভ হয়েছে, সাপের খাদ্য হিসাবে তা' অবাঞ্ছনীয়। একটি ময়ালকে প্রায় আধ মীটর লম্বা মেঠো ইঁদুর খেতে দেওয়া হয়। ইঁদুরটিকে তখনই তখনই মেরে খাঁচায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। অত বড় মরা ইঁদুরটা চোখের সামনে থাকলেও সাপটা কিন্তু যেমন শুয়েছিল তেমনি প'ড়ে রইল—সেদিকে লক্ষই করল না। কিন্তু যেই একটি লাঠি দিয়ে ইঁদুরটাকে একটু নাড়াচাড়া দেওয়া হ'ল, অমনি সাপটা ঝট্ ক'রে তাকে কামড়ে ধরল। কামড়ে ধ'রে স্বভাবতঃই গিলতে আরম্ভ করল।

বন্য অবস্থার তুলনায় বন্দী অবস্থায় সাপ স্বভাবতঃই কম খাদ্য গ্রহণ করে। যা' হ'ক, বন্দী সাপও কি পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। ৪ মীটর ২৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ একটি বন্দী উপকাল সাপ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চারটি ছোট মরা ভেড়া গিলে

খেয়েছিল! তারপর সে আর কিছু খায় নি; দশ দিনের দিন সে আবার একটা মরা ছোট ভেড়া খেয়েছিল।

বন্দী সাপকে অনেক সময় খাদ্যের বাদ-বিচার করতে দেখা যায়। শঙ্খচূড় খুব আগ্রহের সঙ্গেই ঢেমনা সাপ খেয়ে থাকে। কিন্তু একটি শঙ্খচূড়কে ঢেমনা দিলে খেত না। বহুদিন না খেয়ে থাকার পর তাকে যখন মেটেলি সাপ দেওয়া হ'ল, শঙ্খচূড়টা তা' আগ্রহের সঙ্গে খেল। সেদিন থেকে সে আর অনাহারে রইল না —নিয়মিত মেটেলি সাপে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করত। বন্দী শঙ্খচূড়ের মালিক আমার দৃষ্টি সাপটির বৈশিষ্ট্যের দিকে আকর্ষণ ক'রে মন্তব্য করলেন—এ শঙ্খচূড়টা অন্য কোন জাতের, নইলে ঢেমনা খায় না কেন?

শঙ্খচূড় কিন্তু একটি জাতেরই দেখা যায়, দ্বিতীয় কোন জাত নেই। তবে শঙ্খচূড়টির এই বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? আপাতবুদ্ধিতে মনে হয়, শঙ্খচূড়টি এমন কোন জলা জায়গায় বাস করত যেখানে ঢেমনা পাওয়া যেত না—মাত্র মেটেলি সাপই পাওয়া যেত। সেজন্যে শঙ্খচূড়টি মাত্র মেটেলি সাপ খেতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

একটি বন্দী চিত্র-ময়ালকে শশক দেওয়া হ'ল.........ছাগল দেওয়া হ'ল......মুরগী দেওয়া হ'ল। সে কিন্তু কোনটাই ছুঁল না। এভাবে মাসের পর মাস সে অনশনে থাকল। শেষ পর্যন্ত হাঁস দেওয়া হ'ল। তখন চিত্র-ময়ালটি বিদ্যুৎ-বেগে তা' ধ'রে গিলতে লাগল। পরবর্তী কালে সে মাত্র হাঁসই খেত।

শঙ্খচূড়টির ক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি মনে হয়, চিত্র-ময়ালটা জলাশয়ের ধারে বাস করত; সেজন্যে মাত্র হাঁস খেতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

সাপ বন্দী হওয়ার গোড়ার দিকে সাধারণতঃ খেতে চায় না। বন্দী অবস্থায় অভ্যস্ত হলে—কয়েক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর নিয়মিত খেতে থাকে। অনেক বন্দী সাপ তো শেষ পর্যন্ত কিছু

না খেয়েই প্রাণত্যাগ করে। বন্দী সাপ খেতে অনিচ্ছুক হলে তাকে অনেক সময় জোর ক'রে খাইয়ে দিতে হয়; তার মুখের মধ্যে খাদ্য পুরে দিতে হয়। মাংসের টুকরো এ ব্যাপারে সাধারণ খাদ্য। বীক্ষণাগারের প্রয়োজনে রক্ষিত সাপদের অনেক সময় দুধ খাইয়ে দেওয়া হয়। অন্য কোন খাদ্যের তুলনায় খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক সাপকে দুধ খাইয়ে দেওয়া যে সবচেয়ে সুবিধাজনক, তা' বলাই বাহুল্য। খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক বন্দী সাপকে জোর ক'রে খাইয়ে দিতে হয়। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হলে এ কাজ করতে নেই। কারণ এতে সাপের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে।

বন্যপ্রাণী খাঁচায় বন্দী হলে স্বভাবতঃই সে খাদ্য গ্রহণে কম-বেশী বীতরাগ হয়; অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বন্দী সাপের খাদ্য গ্রহণের এই অনিচ্ছা যেন অতিশয় প্রকট। বন্দী সাপ যে সচরাচর আমরণ অনশনব্রতী হয়, তার একটা কারণ আভাসে মনে ওঠে। সাপ যে আত্মহত্যা করে, স্বাধীনতা লোপ পাওয়াই··· যথেষ্ট বিচরণ করতে না পারাই তার পূর্ণ কারণ নয়। শীতনিদ্রার সময় সাপের দৈহিক যন্ত্র-ব্যবস্থা যে অবস্থায় আসে, খাঁচায় যথেচ্ছ বিচরণ করতে না পারায় তার দেহে বোধ হয় সেই অবস্থারই সৃষ্টি হয়। সাপ তখন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে খাদ্য গ্রহণে বিরত হয়।

বন্দী সাপের কাণ্ড!

দাঁত ভেতরের দিকে বাঁকানো থাকায় সাপ কোন শিকার একবার কামড়ে ধরলে তাকে আর ছাড়াতে পারে না। সাপকে তা' গিলতেই হয়—ইচ্ছা করলেও সহজে উগড়ে দিতে পারে না। উগড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে দাঁত শিকারের দেহে আরও চেপে বসে। খুব বড় কোন শিকার অথবা অবাঞ্ছিত কোন

শিকার কামড়ে ধ'রে তাকে আর ছাড়তে না পারায় সাপের মৃত্যু ঘটেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে।

বন্দী সাপের ঘরে কম্বলের ফালি থাকে; ঠাণ্ডার সময় সে তার মধ্যে শোয়। একবার একটি ময়ালকে শশক খেতে দেওয়া হয়েছিল; শশকটি কম্বলে জড়িয়ে গিয়েছিল; সাপ শশকটাকে ধরাতে তার দাঁত কম্বলে আটকে গেছল। ময়ালটার পক্ষে কম্বল আর ছাড়ানো সম্ভব হয় না। সাপটাকে সমস্ত কম্বল গিলতে হয়। শেষ পর্যন্ত সাপটি মারা যায়।

একই শিকার ধরতে গিয়ে দুটি সাপে অনেক সময় অঘটন ঘটায়। দুটি বন্দী ময়ালের খাঁচায় একটি শশক দেওয়া হয়েছিল। একটি ময়াল শশকটির এক প্রান্তে এবং অন্য ময়াল শশকটির অপর প্রান্তে কামড়ে ধরেছিল। দুটির কোনটিই শশকটিকে ছেড়ে দিতে চায় না, অথবা ছেড়ে দিতে পারে না; দুজনেই গিলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দুটি সাপ পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এক মুহূর্ত বোধ হয় তারা ইতস্ততঃ করে; বড় ময়ালটির হাঁ আরও বড় হয়; শশকের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ময়ালটির দেহ তার মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বড় ময়ালটি ছোট ময়ালটিকে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে। এরকম ভূরিভোজের পর বড় ময়ালটি স্বভাবতঃই অসুস্থ হয়ে পড়ে—তবে মারা যায় না।

চক্রধর সাপের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি ঘটনার কথা বলি। একই খাঁচায় বন্দী দুটি চক্রধর সাপকে ব্যাং খেতে দেওয়া হয়েছিল। একই ব্যাংকে দুটি চক্রধর সাপ দু' পাশে ধরেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একটি চক্রধর সাপ ব্যাঙের সঙ্গে সঙ্গে অপর চক্রধর সাপটিকেও গিলে ফেলল। দুটি চক্রধর সাপই লম্বায় প্রায় ১ মীটর ২৫ সেন্টিমীটর ছিল।

চন্দ্রবোড়া সাপের ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের ঘটনা জানা যায় নি। একবার দুটি বন্দী চন্দ্রবোড়া একই ইঁদুরকে কামড়ে ধরেছিল।

কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, যে চন্দ্রবোড়া ইঁদুরটাকে ভাল ক'রে ধরেছিল, সে-ই ইঁদুরটাকে গিলতে থাকল—অপর চন্দ্রবোড়াটি ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিল।

জন্ম ও মৃত্যু

সাপের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সুস্পষ্ট; তবে উপরি-উপরি দেখে সে পার্থক্য বোঝা শক্ত। দেহ-ব্যবচ্ছেদই এর নির্ভুল পন্থা। পুরুষ সাপের অবসারণী-ছিদ্রের আশপাশ একটু পুরু দেখায়।

পুং-অঙ্গ

অভিজ্ঞতা থাকলে দেহ-ব্যবচ্ছেদ না ক'রেও সাপের স্ত্রী-পুরুষ নির্ণয় অসম্ভব নয়। কোন কোন গণের অন্তর্ভুক্ত সাপের আঁশের বৈশিষ্ট্যে স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায়।

সাপের পুং-জননেন্দ্রিয় একটু বিশেষ ধরনের—দ্বিধা-বিভক্ত।

একটা অঙ্গ নয়, অনুরূপ দুটি অঙ্গ। আর এই পুং-জননেন্দ্রিয় লুকনো থাকে অবসারণী-ছিদ্রের মধ্যে; প্রয়োজনের সময় বের হয়। লেজের সন্ধিস্থলে অবসারণী-ছিদ্রের দু' পাশ থেকে এ দুটি অঙ্গ বেরিয়ে পড়ে। প্রতি অঙ্গ নলাকার উন্নমনপ্রবণ কলা দিয়ে তৈরী—এবং সাপ এ অঙ্গ ইচ্ছামত অবসারণী-ছিদ্র দিয়ে বের করতে পারে। এক সাপ থেকে আর এক সাপের জননেন্দ্রিয়ে পার্থক্য থাকতে পারে। অধিকাংশ সাপের জননেন্দ্রিয় ছোট ও মোটা; কোনটা কোনটার প্রতি অঙ্গের গোড়ার দিকে ছোট ছোট কাঁটা থাকে; কোন কোন সাপের দ্বিধা-বিভক্ত প্রত্যেক অঙ্গ আবার সামান্য চেরা থাকে।

স্ত্রী সাপের সঙ্গে মিলনের সময় পুরুষ সাপ যে কোন একটি অঙ্গ ব্যবহার করে। কখনও এটা করে, কখনও বা ওটা করে—নিজের অবস্থান অনুযায়ী যখন যেটি স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। কোন অঙ্গ আহত থাকলে অবশ্য আলাদা কথা; তখন অপরটিই ব্যবহার করে। বস্তুতঃ একই মিলনে পুরুষ সাপ দুটি অঙ্গই ব্যবহার করতে পারে; তবে একসঙ্গে নয়।

কোন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ সাপকে সারাজীবন একত্রে বাস করতে দেখা যায় না। অবশ্য কোন কোন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ সাপকে সাময়িকভাবে একত্রে বাস করতে দেখা যায়।

যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে পুরুষ সাপ স্ত্রী সাপকে আকর্ষণ করে। এই পূর্বরাগে সাপের স্পর্শেন্দ্রিয়ই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ঘ্রাণশক্তিও সাহায্য করে। প্রজন ঋতুতে কোন কোন সাপের পৃষ্ঠ্য-গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ হয়। সাপের অবসারণী-ছিদ্র গ্রন্থি থেকেও ক্ষরণ হয়; এই ক্ষরণ সকল ঋতুতে হলেও প্রজন ঋতুতে বেশী হয় ব'লে মনে হয়। এই ক্ষরণের গন্ধ সব সাপের একরকম নয়। আমাদের দেশের বেদেরা এই গন্ধের সঙ্গে শালি ধান ও কাঁঠালী চাঁপার গন্ধের তুলনা দেয়।

সাপের মধ্যে বর্ণসংকর নেই ; এক প্রজাতির সাপ আর এক প্রজাতির সাপের সঙ্গে যৌন মিলনে রত হয় না।

স্ত্রী সাপকে আকর্ষণের উপায় সব সাপের ক্ষেত্রে একরকম নয়। তবে মোটামুটি ধরনটা এরকম : কোন কোন পুরুষ সাপ স্ত্রী সাপের পিঠে—সাধারণতঃ মাথার দিকে—নিজের চিবুক ঘষতে থাকে ; কখনও কখনও সে প্রলম্বিত জিব বের ক'রে স্ত্রী সাপটির গা স্পর্শ করতে থাকে। তাতেই স্ত্রী সাপ বুঝতে পারে তার ইচ্ছা। তখন দুটি সাপ পাশাপাশি ও ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের দেহকে সোজা ক'রে দেয়—যেন সমান্তরাল দুটি সরলরেখা। উভয়ের জননেন্দ্রিয় অবশ্য একটি অপরটির বিপরীত-মুখী হয়ে থাকে। ঠিক স্থান গ্রহণের পর পুরুষ সাপের দেহে লেজ থেকে মাথা অবধি ক্ষণে ক্ষণে আক্ষেপ খেলে যায় ; কয়েকটি আক্ষেপের পর সাপটি বিশ্রাম নেয় ; পুনরায় তার দেহে আক্ষেপ খেলে যায় ; তারপর আবার বিশ্রাম। এরকম কিছুক্ষণ কম-বেশী ১০ মিনিট ঘটে। তারপর প্রকৃত যৌন কার্য আরম্ভ হয়। পুরুষ সাপই তার দেহকে তুলে ধ'রে স্ত্রী সাপের অঙ্গে তার অঙ্গ প্রবিষ্ট করে। এ সময়ে সাধারণতঃ দুটি সাপের পেছনের অংশ পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। ৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট লাগে যৌন কার্য সম্পন্ন করতে ; কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যায়। প্রকৃত যৌন মিলনের সময়ে পুরুষ সাপের দৈহিক আক্ষেপ বন্ধ হয় ; সাধারণতঃ সে নিশ্চল থাকে। বস্তুতঃ যৌন মিলন যে আরম্ভ হয়েছে, আকস্মিক আক্ষেপ বন্ধ হওয়াই তার সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত। স্ত্রী সাপও নিশ্চল থাকতে পারে। অথবা পুরুষ সাপটাকে টেনে নিয়ে সে আস্তে আস্তে চলতে থাকে—মাত্র জননেন্দ্রিয় অংশ পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে ; সাপ দুটির দেহের অবশিষ্ট অংশ তখন পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে না।

কখনও কখনও একাধিক পুরুষ সাপ একটি স্ত্রী সাপের কাছে

এসে উপস্থিত হয়। স্ত্রী সাপটাকে লাভ করবে কে, এ নিয়ে তাদের চেষ্টা চলে ; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোন হানাহানি হয় না।

একই প্রজন ঋতুতে পুরুষ সাপ একটির বেশী স্ত্রী সাপের সঙ্গে সংসর্গ করতে পারে ; কিন্তু স্ত্রী সাপ সাধারণতঃ একবারের বেশী সংসর্গ করে না।

কোন কোন জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আকারে ও রঙে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রী সাপ দেখতে প্রায় একইরকম। তবে পুরুষ সাপ স্ত্রী সাপকে চেনে কেমন ক'রে ? প্রধানতঃ সাপের ঘ্রাণশক্তিই এ ব্যাপারে সাহায্য করে। প্রজন ঋতুতে সাপের দেহ-গ্রন্থি থেকে যে ক্ষরণ হয়, তাই একটি সাপকে আর একটি সাপকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। প্রজনের সময় কখনও কখনও স্ত্রী সাপ তার দেহ থেকে নিঃসৃত ক্ষরণের গন্ধ পথে ছড়িয়ে রেখে যায় ; পুরুষ সাপ সেই গন্ধ অনুসরণে স্ত্রী সাপটার কাছে যায়।

শীতনিদ্রার কথা বলেছি। শীতনিদ্রা থেকে উঠে কিছুদিন পর্যন্ত সাপ শীতনিদ্রার আস্তানার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে। সাধারণতঃ সেই সময়ই তাদের যৌন মিলন ঘটে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সাপ সাধারণতঃ বসন্তঋতুতে যৌন মিলনে রত হয় ; কখনও বা গ্রীষ্মঋতুতেও তাদের মিলন ঘ'টে থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সাপ বছরের যেকোনও সময় মিলনে রত হতে পারে—যদিও অধিকাংশ সময় বর্ষার প্রারম্ভেই তাদের মিলিত হতে দেখা যায়।

কখনও কখনও বহু সাপ একত্রে শীতনিদ্রায় যায়, সুতরাং তাদের যৌন মিলনের সুযোগ ঘটে।

শঙ্খ-লাগা কি যৌন মিলন ?

শঙ্খ-লাগা কি যৌন মিলন ?—এ প্রশ্ন অদ্ভুত মনে হতে পারে। কারণ শঙ্খ-লাগা যে যৌন মিলন, এ ধারণা সেদিন পর্যন্তও

সকলের ছিল—এবং আজও অনেকের আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শঙ্খ-লাগা যৌন মিলন নয়।

সাপের শঙ্খ-লাগা দৃশ্য আমাদের দেশের গ্রামবাসীদের কাছে অপরিচিত নয়। কখনও কখনও দুটি চক্রধর সাপ সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে ··· পরস্পরের দেহের পেছন অংশ দিয়ে একটা আর একটাকে জোরে জড়িয়ে ধরে······দুজনের মুখ সামনা-সামনি থাকে······যেন আঘাত করতে উদ্যত কিন্তু কামড়ায় না অথবা কদাচিৎ কামড়ায় ······মাথা উঁচু-নীচু করে······মাঝে মাঝে মাথা ঠোকাঠুকিও করে ······দেহের পাক শক্ত করে ······দুজনে দুজনের ওপরে মাথা তোলার চেষ্টা করে······দেহের পাক খুলে কিছু দূরে চ'লে যায়

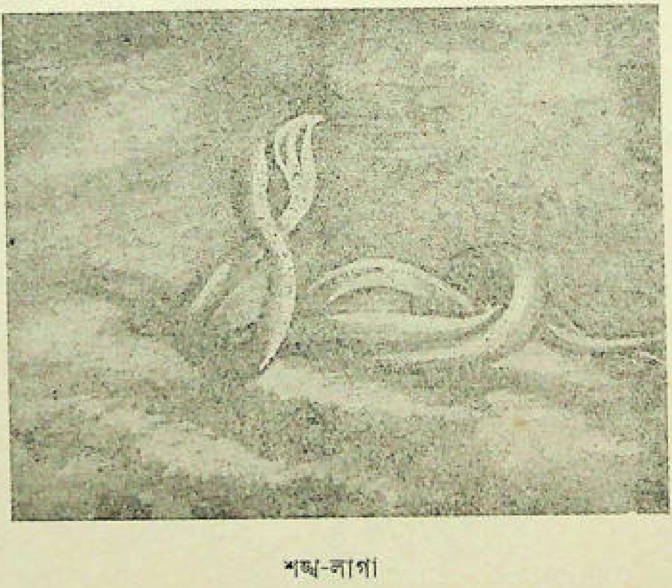

শঙ্খ-লাগা

······হিসহিস শব্দ তো করেই······আবার ছুটে আসে······ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে······আবার দূরে চ'লে যায়······এক ঘণ্টা পর্যন্তও তাদের এরকম করতে দেখা যায়······শেষ পর্যন্ত দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

একেই বলা হয় শঙ্খ-লাগা। ডাঙাতেও শঙ্খ লাগে; জলে পুকুরেও শঙ্খ লাগতে পারে। ফণাওলা ও ফণাহীন—সব সাপেরই শঙ্খ লাগে। ছুটির বেশিরও সাপের শঙ্খ লাগে। সাপগুলি সব সময়ে যে দাঁড়িয়ে ওঠে, তাও নয়।

লোকে বলে, শঙ্খ-লাগা সাপের পূর্বরাগ—যার পরিণতি ঘটে যৌন মিলনে। বহুদিন পর্যন্ত এ ধারণা চ'লে এসেছিল। আজ কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে, শঙ্খ-লাগা সাপের যৌন মিলন নয়। যে ছুটি সাপে শঙ্খ লাগে, যেখানে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, দেখা গেছে ছুটি সাপই পুরুষ; ছুটি পুরুষ সাপে মিলন হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, শঙ্খ-লাগা যখন সুনিশ্চিতরূপে পূর্বরাগ নয়...যৌন মিলন নয়, তখন এর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। কেউ কেউ বলেন, ছুটি পুরুষ সাপ রণনৃত্যে মাতে; পরস্পরের মধ্যে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কিন্তু তারই বা কি উদ্দেশ্য? ছুটি সাপের মধ্যে রেষারেষি দেখা যায়, অথচ প্রতিপক্ষকে আহত করার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। কি অভিপ্রায় থাকতে পারে এর পেছনে? তাঁদের মতে এই রণনৃত্যের উদ্দেশ্য হ'ল স্বাধিকার ঘোষণা; যে জায়গায় কোন পুরুষ সাপ আছে, সে জায়গায় যেন অন্য কোন পুরুষ সাপ না আসে। কিন্তু ভৌম প্রীতি অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন জমির ওপর আকর্ষণ কোন কোন প্রাণীর থাকলেও বস্তুতঃ সাপের তা' দেখা যায় না।

শঙ্খ-লাগা সাধারণতঃ দেখা যায় বসন্তকালে আর গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে। এই সময়টা হ'ল সাপের প্রজন-ঋতু। এতে মনে হয়, শঙ্খ-লাগার উদ্দেশ্য যা' থাকুক, এর সঙ্গে যৌন মিলনের একটা সম্পর্ক আছে। যৌন মিলনের সময় একটি স্ত্রী প্রাণীর নিকট একাধিক পুরুষ প্রাণী এলে সাধারণতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে—হানাহানিও হয়। পুরুষ সাপের মধ্যে সেরকম কোন হানাহানি দেখা যায় না। তবে সাপের সে আচরণ স্ফুটভাবে

গ'ড়ে না উঠলেও অস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে শঙ্খ-লাগার মধ্যে—এরূপ ধারণা করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। শঙ্খ-লাগা হ'ল পুরুষ হিসাবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা—নিজের প্রাধান্য দেখানোর চেষ্টা। তুজন মল্লে যেমন তাল ঠোকে—দেখলে মনে হয় পরস্পর পরস্পরকে ভীষণভাবে আঘাত করতে উদ্যত, অথচ কেউ কাউকে আহত করে না, শঙ্খ-লাগা তুটি সাপকে দেখলে সেরকমই মনে হয়। লোকে যে এতদিন শঙ্খ-লাগাকে যৌন মিলন ব'লে মনে ক'রে এসেছে, এই ব্যাখ্যার মধ্যে তারও হদিস পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ শঙ্খ-লাগার যে ব্যাখ্যাই থাক, পুরুষ সাপের যৌন অবস্থার সঙ্গে যে তা' সম্পর্কিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যৌন মিলনের পূর্বে স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের উদ্দেশে সাপের দেহ-গ্রন্থি থেকে যে ক্ষরণ হয়, শঙ্খ-লাগাতেও তা' দেখা যায়। মনে হয় পুরুষ সাপের পক্ষে স্ত্রী সাপকে চেনা বড় সহজ নয়; শঙ্খ-লাগার মধ্য দিয়ে পুরুষ সাপ স্ত্রী সাপকে বোধ হয় চেনার প্রচেষ্টা করে।

অনেক সাপের ক্ষেত্রে শঙ্খ-লাগাও পূর্বরাগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। গাঁয়ের পথে তুটি ঢেমনা সাপের শঙ্খ-লাগা অনেক সময়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢেমনা সাপের ক্ষেত্রে শঙ্খ-লাগা ও যৌন মিলনের ভঙ্গী প্রায় একই ধরনের। চক্রধর সাপের ক্ষেত্রেও বোধ হয় সেকথা বলা চলে।

একবার এক সাইকেল-আরোহী গাঁয়ের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে তিনি লক্ষ করলেন, তুটো ঢেমনা সাপ জড়াজড়ি ক'রে আছে—ঠিক যেন একটা মোটা দড়ি পাকানো অবস্থায় প'ড়ে আছে। তিনি কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে সেই জড়ানো মোটা দড়ির আড়াল থেকে তুটো মুখ বের হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—তুটি ঢেমনারই মুখ। তারপর মুখ নামিয়ে তারা জড়াজড়ি অবস্থাতেই ধারে

ধীরে পাশের শুকনো খাতে নেমে পড়ল। এ ঘটনাটি যে যৌন মিলন, তা' বেশ বোঝা যায়।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। দুটি বড় ঢেমনা সাপেরই ব্যাপার। তারা পরস্পরকে জড়াজড়ি ক'রে মাটি থেকে এক মীটরেরও ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল এবং পরস্পরের দিকে মুখোমুখি হয়ে মাথা দোলাচ্ছিল। কখনও এটা, কখনও বা অপরটি ঘাড় ফেলাচ্ছিল—যেন চক্রধর সাপে ফণা ধরছে। প্রায় ৩ মীটর দূরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু সাপ দুটোর তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এক্ষেত্রে সাপ দুটি উভয়েই পুরুষ ছিল, না স্ত্রী-পুরুষ ছিল বোঝা দুষ্কর।

বন্দী অবস্থাতে দুটি ঢেমনা সাপকে শঙ্খ লাগতে দেখেছিলাম। আধ ঘণ্টারও ওপর তাদের এই কসরত চলেছিল।

দুটি সাপ পরস্পরকে জড়িয়ে থাকার সময় কতকটা শঙ্খের আকৃতি ধারণ করে—তাই বোধ হয় শঙ্খ-লাগা কথার চলন। অনেকে অবশ্য বলে সঙ্গ-লাগা। শঙ্খ-লাগা যখন যৌন মিলন নয়···সর্বক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষ সাপের খেলা নয়, তখন সঙ্গ-লাগার চেয়ে শঙ্খ-লাগা কথাটারই ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

ডিম ও বাচ্চা

সাপ সাধারণতঃ ডিম পাড়ে—যদিও কোন কোন সাপ বাচ্চাও দেয়। সাপের বাচ্চাকে গাঁয়ের সাধারণ লোকে বলে ডেঁপ—কেউ কেউ আবার শেলুই বলে। সমস্ত প্রজাতির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সাপ ডিম পাড়ে; অবশিষ্ট বাচ্চা দেয়। সাপ যে ডিম বা বাচ্চা দেয় তা' পর পর অনেক দিন ধ'রে দেয় না; একসময়েই দেয়··· এক দিনের মধ্যে দেয়···বড় জোর দু' দিন লাগে।

যৌন মিলনের সময় পুরুষ সাপের শুক্রাণু স্ত্রী সাপের দেহে প্রবেশ করলেই শুক্রাণুর যোগে গর্ভাধান হয় না। বহুদিন

ধ'রে শুক্রাণু স্ত্রী সাপের দেহের মধ্যে রয়ে যেতে পারে—এবং তার গর্ভাধান করানোর ক্ষমতাও থাকে। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে, যৌন মিলনের পর পাঁচ বছর কেটে গেছে···আর যৌন মিলন হয় নি···কিন্তু ঐ সাপের ডিম হয়েছে—এবং সেই ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়েছে! যৌন মিলন না ঘ'টে সাপে যে বাঁজা ডিম পাড়তে পারে, তা' বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

যৌন মিলনের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভাধান হয় না ব'লে সাপের গর্ভধারণের সময় সুনিশ্চিত ক'রে বলা যায় না। তবে মোটামুটি হিসাবে বলা চলে, যৌন মিলনের ৪ সপ্তাহ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে অণ্ডজ সাপ ডিম পাড়ে; আর জরায়ুজ সাপ যৌন মিলনের ১২ সপ্তাহ থেকে ১৮ সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা দেয়।

বিভিন্ন জাতের সাপ বিভিন্ন সংখ্যায় ডিম দেয়। এমন কি একই জাতের ছুটি সাপের ডিমের সংখ্যায় বেশ পার্থক্য দেখা যায়। কম বয়সের স্ত্রী সাপ সাধারণতঃ কম ডিম দেয়। উর্দ্ধসংখ্যায় সাপ ১০০ বা তার চেয়ে বেশী ডিম একবারে দিতে পারে; নিম্ন-সংখ্যায় ৩।৪টি ডিমও সাপ পাড়ে। সাপের ডিম পাড়ার গড়পড়তা হিসাব বলা যেতে পারে—২৫। ময়াল সাপই সবচেয়ে বেশী ডিম পাড়ে ব'লে মনে হয়; একটি ময়াল ১০৭টি ডিম দিয়েছিল—যদিও সবগুলো থেকে যে বাচ্চা হয়েছিল তা' নয়। সাপের দেহের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ডিম কম-বেশী হওয়ার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই; কোন কোন ছোট সাপও অনেক ডিম দেয়।

সচরাচর-দৃষ্ট সাপের মধ্যে অধিক সংখ্যায় ডিম বা বাচ্চা দেওয়ার ব্যাপারে জলঢোঁড়া ও চন্দ্রবোড়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

সাপের ডিম আড়াআড়িভাবে বৃত্তাকার আর লম্বালম্বিভাবে উপবৃত্তাকার। সাপের ডিমের লম্বালম্বি বেড় সাধারণতঃ আড়াআড়ি বেড়ের ছ' গুণ হয়। অপেক্ষাকৃত সরু সাপের ডিমের লম্বালম্বি বেড় আড়াআড়ি বেড়ের চার গুণ পর্যন্ত হয়।

সাপের ডিম সাদাটে বা হলদেটে; রং-বেরঙে চিত্রিত নয়। সাপের ডিমের খোলা পাখির ডিমের মত শক্ত নয়—চুনের ভাগ

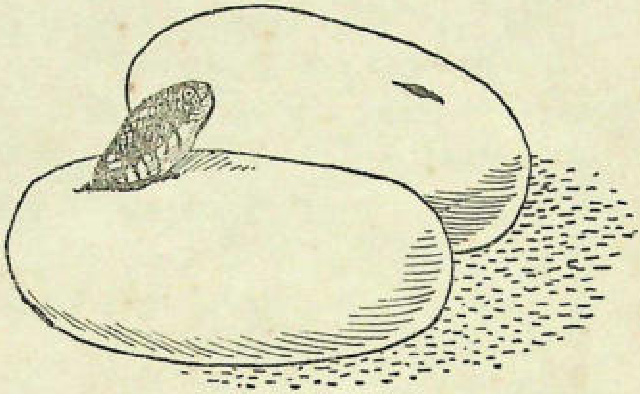

ডিম ফুটে বাচ্চা বের হচ্ছে

অনেক কম। সাপের ডিমের খোলা নরম--শক্ত পার্চমেণ্ট কাগজের মত। সামান্য টিপলে চুপসে যায়। সাপের ডিমের খোলা শক্ত হওয়ার অথবা পরিবেশের রঙে চিত্রিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাপ লুকনো জায়গায় ডিম পাড়ে; কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ডিম পাড়ার সময় যেসব ডিম পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, সেগুলি একটার সঙ্গে একটা আটকে যায়; অণ্ডবাহিনী থেকে নিঃসৃত ক্ষরণ ডিমের গায়ে লেগে থাকে; তা' শুকিয়ে গিয়ে আঠার কাজ করে।

সাপের ডিমের আয়তন ঐ সাপের দৈর্ঘ্যের ওপর এবং ঐ সাপ একবারে কত সংখ্যায় ডিম পাড়ে, সাধারণতঃ তার ওপর নির্ভর করে। ময়ালের ডিমের লম্বালম্বি বেড়ের গড়পড়তা মাপ প্রায় ১২ সেন্টিমীটর; এই বেড় আড়াআড়ি বেড়ের প্রায় দু' গুণ।

অন্ধক গোত্রের সাপের দেহের বেড় ৪ মিলিমীটর। এ সাপের পক্ষে খুব ছোট ডিম পাড়া স্বাভাবিক; পাড়েও তাই; কিন্তু সে ডিম লম্বা হয়ে থাকে আশ্চর্য রকমের।

অধিকাংশ সাপের ডিম পাহারা দেওয়ার বালাই নেই। স্ত্রী সাপ

ডিম ঘরে শুয়ে থাকলেও বেশী দিন থাকে না। ছোট ছোট সাপ ডিম তো কদাচিৎ পাহারা দেয়।

সাপ সাধারণতঃ ডিমে তা দেয় না। ময়াল সাপ ছাড়া কদাচিৎ কোন সাপ ডিমে তা দেয়। কোন কোন সাপকে তা দিতে এবং ডিম পাহারা দিতে দেখা গেলেও সাপের সন্তান-স্নেহ তেমন গ'ড়ে ওঠে নি। বাচ্চাদের তারা যত্ন নেয় না। জরায়ুজ সাপেরাও বাচ্চাদের খোঁজ রাখে না। বাচ্চাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়। তাদের শক্তিও বড় কম নয়। প্রয়োজন বোধ হলে তারা এক বছরও কিছু না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সাপ একসঙ্গে এত ডিম পাড়ে অথবা বাচ্চা দেয় যে তার সন্তান-প্রীতির কল্পনা সহজে আসে না।

সাপের সন্তান-প্রীতি কার্যতঃ নেই। তবে এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলি। একবার একটি বন্দী ঝুমঝুমি সাপ বাচ্চা দেয়। বাচ্চা দেওয়ার পর তার রক্ষক খাবার দিতে গেলেই সাপটা তেড়ে আসতে লাগল। তার আগে কিন্তু পোষ মেনে গিয়েছিল; খাবার দেওয়ার সময় তেড়ে আসত না। এভাবে এক মাস পর্যন্ত তেড়ে এসেছিল। এই তেড়ে আসার কারণ বাচ্চাদের রক্ষা করা ছাড়া আর কি হতে পারে?

সাধারণতঃ স্ত্রী সাপ ডিম পেড়ে সে স্থান থেকে চ'লে যায়। ডিম তাড়াতাড়ি ফুটতে হলে যথেষ্ট তাপ দরকার। কোন কোন সাপের এ বিষয়ে বেশ খেয়াল থাকে। রোদ লাগে এমন কোন জায়গায় এসব সাপ ডিম পাড়ে। গাছপালা কাঠকুটো বা ময়লা-আবর্জনা যেখানে পচে, সেখানে তাপ উৎপন্ন হয়। এসব সাপ সেসব জায়গাতেই ডিম পাড়ে। সাপ চওড়া পাথরের তলায়ও ডিম পাড়ে; দিনের বেলায় পাথর গরম হয়ে ওঠে; রাতেও সে গরম কিছুটা থাকে। কোন কোন জাতের সাপ আছে যাদের স্ত্রী সাপেরা কতকগুলি মিলে একসঙ্গে হয় একই জায়গায়

ডিম পাড়ার জন্যে। গড়পড়তা ২৪° তাপে সাপের ডিম ফুটে ওঠে।

সাপের ডিমের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার। দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া থেকে আর্দ্রতা গ্রহণ ক'রে সাপের ডিম ফুলে উঠতে থাকে—বিশেষ ক'রে বেড়ের দিকে। কখনও কখনও এক-তৃতীয়াংশও বেড়ে যায়। এতে ডিম থেকে বাচ্চা বেরনোর পথ স্বভাবতঃই সুগম হয়। তা' ছাড়া আছে ডিম-দাঁত। এই ডিম-দাঁত প্রকৃতপক্ষে দাঁতই বটে: প্রাক্-জম্ভিকা অস্থি থেকে বেরয়। ডিমের মধ্যে বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ লাভ করলে এই ডিম-দাঁত দিয়ে সে ডিমের খোলায় ছিদ্র করে; ছিদ্র ক'রেই বেরিয়ে আসে না; বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে—যেন নতুন জগতে ঢুকতে ইতস্ততঃ করে। তারপর বেরিয়ে আসে। ডিম থেকে বেরিয়ে আসার পর সাধারণতঃ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডিম-দাঁত আপনা থেকে খ'সে পড়ে।

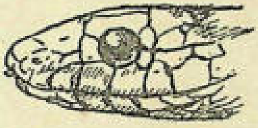

ডিম-দাঁত

সাপের বাচ্চা ডিম ফুটে বেরয় সাধারণতঃ সাত-আট সপ্তাহের মধ্যেই। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে। বিশেষ অবস্থায় কোন কোন সাপকে দেখা যায় যে ডিম পাড়তে দেরি করে। এসব ডিম থেকে বাচ্চা বেরতে তিন সপ্তাহেরও বেশি লাগে না। কারণ পেটের মধ্যেই তো ডিমের ভ্রূণ কতকটা পুষ্টি লাভ করেছে।

জরায়ুজ সাপের এক এক জাতের বাচ্চার সংখ্যা একরূপ। কোন কোন জাতের সাপকে ৬০ বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় বাচ্চা দিতে দেখা যায়। একটি চন্দ্রবোড়া একবারে ৬৩টি বাচ্চা দিয়েছিল। সাপের বাচ্চা দেওয়ার গড়পড়তা হিসাব অবশ্য—১০। সাপের বাচ্চাগুলি কখনও কখনও একজোটে পাতলা স্বচ্ছ

ঝিল্লীর তৈরী একটা থলের মধ্যে থাকে। ঝিল্লীর তৈরী থলের মধ্যে থেকে জন্মালেও একটু চেষ্টাতেই ঝিল্লীর থলে বাচ্চারা ছিঁড়ে ফেলে। মায়ের পেট থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝিল্লীর থলে ছিঁড়ে ফেলতে পারে; অথবা কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর ঐ থলে ছিঁড়তে পারে। কখনও এই থলে স্ত্রী সাপের পেটের মধ্যেই ফেটে যায়—আর বাচ্চাগুলি আলাদা আলাদা বেরিয়ে আসে। ডিম থেকে নির্গত বাচ্চাদের মত এসব বাচ্চাদেরও ডিম-দাঁত লক্ষ করা গেছে—যদিও সে ডিম-দাঁত অতি ক্ষুদ্র। মায়ের পেট থেকে বেরনোর আগেও কখনও কখনও তাদের ডিম-দাঁত প'ড়ে যায়। বলা বাহুল্য, এদের ডিম-দাঁতের কোন দরকারও হয় না।

সাপের বাচ্চা—তা' ডিম ফুটে বেরিয়ে হ'ক অথবা মায়ের পেট থেকে সরাসরি জন্মিয়ে হ'ক—উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় তখনই কর্ম-তৎপর হয়ে ওঠে। তবে সাধারণতঃ তারা সেই নিরাপদ স্থানেই কয়েক ঘণ্টা—এমন কি কয়েক দিন কাটায়। শঙ্খচূড়ের বাচ্চা ডিম থেকে সম্পূর্ণ বেরয় নি—দেহের শেষ অংশ তখনও ডিমের মধ্যে রয়েছে—অথচ তাকে ফণা ধ'রে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখা গেছে!

বিষধর সাপের বাচ্চা বিষগ্রন্থি ও বিষ-দাঁত নিয়েই জন্মায়; শিকার বা শত্রুর ক্ষেত্রে বিষদাঁত ব্যবহার করতে তার সাহজিক প্রবণতা থাকে। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার।

জন্মের পরই সাপের বাচ্চা খোলস ছাড়ে। সাধারণতঃ চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই খোলস ছাড়ে। একটি বন্দী চন্দ্রবোড়া ৩৩টি বাচ্চা দেয়; তাদের কয়েকটি ছিল অপুষ্ট ও মৃত; অবশিষ্ট বাচ্চা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খোলস ছাড়ে।

গর্ভবতী সাপকে খোলা জায়গায় রোদ পোহাতে প্রায়ই দেখা যায়। কোন কোন সাপের আচরণে আবার মনে হয়, ঐ সাপ

বুঝি ডিমে তা দিতে দিতে মাঝে মাঝে রোদে এসে দেহ গরম ক'রে নিয়ে যায়।

বিভিন্ন সাপের বাচ্চা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়। তবে এর একটা মোটামুটি হিসাব আছে। যে সাপের বাচ্চা সেই পূর্ণবয়স্ক সাপের দৈর্ঘ্যের এক-ষষ্ঠাংশ দীর্ঘ হয় তার বাচ্চা। সাপের বাচ্চা গোড়ার দিকে বেশ দ্রুত বাড়ে। শীতনিদ্রার সময় অথবা তার আগে-পরে বাড়ার গতি অনেক ক'মে যায়। একটা বন্দী ময়াল জন্মের গোড়ার দিকে প্রতি মাসে ৮ সেন্টিমীটর ক'রে বেড়েছিল। কম-বেশী এক বছর হলেই পুরুষ সাপের যৌন মিলনের ক্ষমতা জন্মায়; দু' বছরের স্ত্রী সাপ ডিম বা বাচ্চা দিতে পারে। বড় বড় সাপ ৪ বছরে পূর্ণবয়স্কতা লাভ করে।

জন্মের সময় সাপের যে দৈর্ঘ্য থাকে, প্রথম বছরেই প্রায় তার দু' গুণ হয়, তৃতীয় বছরে তার তিনগুণ হতে পারে; তারপর বাড়ার গতি ক'মে যায়; অবশ্য সাপ যতদিন বেঁচে থাকে, তার দেহ একটু না একটু বাড়তে থাকে।

আয়ুষ্কালঃ সাপ কত দিন বাঁচে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে সাধারণভাবে বলা চলে, সাপ ২০ থেকে ৩০ বছর বাঁচতে পারে। বন্দী একটা ময়াল সাপ ৩০ বছর বেঁচেছিল; বন্দী একটা অ্যানাকণ্ডা সাপ ২৯ বছর বেঁচেছিল।

বনে সাপ খুব বেশী দিন বাঁচে ব'লে মনে হয় না, নানা পরজীবী সাপকে রোগগ্রস্ত ক'রে তোলে। সাপের শত্রু নানা পাখি ও স্তন্যপ আছে; তারা বহু সাপকে হত্যা করে; কোন কোন সাপ অন্য জাতের সাপকেও খায়।

সাপের জীবনীশক্তি বড় অদ্ভুত। মস্তক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও সাপের হৃৎপিণ্ড ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত স্পন্দিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত আছে। এক ঘাসুড়ে ঘাস কাটতে কাটতে অজ্ঞাতসারে একটি গোখরো সাপের লেজের কতকাংশ কাস্তে দিয়ে কেটে ফেলেছিল।

সাপটির অবশিষ্ট অংশ রাগে ফণা তুলে ফোঁসফোঁস করতে করতে ঘাসুড়েকে ঠিক ছোবল দেয়। আর একবার একজন শিকারী নালার পাশে একটি কেউটেকে গুলি করেন। শিকারী কাছে গিয়ে দেখেন, কেউটেটির দেহ থেকে রক্ত ঝরঝর ক'রে পড়ছে, তবুও সাপটা ফণা তুলে ফোঁসফোঁস করছে।

বেশ কিছুক্ষণ আগে মৃত বিষধর সাপকেও নাড়াচাড়া করার সময় সতর্ক হওয়া দরকার। হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় সাপের বিষদাঁত হাতে ফুটে যেতে পারে—এবং তাতে মানুষটি মারা যেতে পারে। বিষধর সাপের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই বিচ্ছিন্ন মস্তক নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় মানুষ বিষদাঁত দিয়ে দষ্ট হয়ে মারা গেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

বাসা : সাপ বাসা তৈরি করে না ; যা' করে তা' বাসা নামের যোগ্য নয়। অন্য জন্তু-জানোয়ারের গর্তে, পাঁচিলের ফাটলে, ইটের পাঁজায়, উইয়ের ঢিবিতে, গাছের খোবরে বা ডালে, ঝোপে-ঝাড়ের আড়ালে সাপ বাস করে।

সাপ বাসা তৈরি না করলেও এবং সাপের ভৌম স্বাধিকার বোধ না থাকলেও সাপ যেখানে আস্তানা পাতে সেখান থেকে বেশী দূরে যায় না—কাছাকাছি থাকে। কোন কোন প্রজাতির সাপ শিকার অন্বেষণে যেখানেই থাকুক, ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে আস্তানায় ফিরে আসে। ঢেমনা ও চক্রধর সাপের এ প্রবণতা অনেকে লক্ষ ক'রে থাকবেন।

চক্রধর, ঢেমনা ইত্যাদি সাপ ডিম পাড়ার সময় এলে কখনও কখনও নিজের দেহ দিয়ে কোন গর্তকে মোটামুটি একটা গোলাকার আকৃতি দেয়—গর্তটির গা দেখলে মনে হয় যেন কে ভাল ক'রে নিকিয়ে দিয়েছে। সাধারণ লোকে বলে 'সাপের হাঁড়ি'। এতেই ঐ সাপ ডিম পাড়ে।

বর্তমানে শঙ্খচূড় সাপের বাসা নির্মাণের কথা জানা গেছে।

বসতি

সাপের গতি সর্বত্র। ডাঙায়, জলে, গাছে—সব জায়গায় সাপ বাস করে। অবশ্য কোন সাপ মাটিতেই বাস করতে ভালবাসে, কোন সাপ বা ভালবাসে জলে বাস করতে, আর কোন সাপ বা গাছেই বাস করে। প্রায় সব সাপই গাছে উঠতে পারে—জলেও সাঁতার কাটতে পারে।

খোলা মাঠ, এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ে জায়গা, মরুভূমি, মাটির নীচে, ঝোপে-ঝাড়ে, কাদায়, স্বাচ্ছ জলে, নোনা জলে সাপ দেখা যায়। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে কমবেশী ৫ কিলোমীটর উঁচু স্থানেও সাপ দেখা যায়। বন আছে ... নদী-নালা আছে ... বৃষ্টি পড়ে, এমন অঞ্চল সাপের বাস করার পক্ষে আদর্শস্থল।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সাপ বাস করে। নিউজিল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং কোন কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে সাপ পাওয়া যায় না।

সাপ সূর্য-কিরণ ও তাপ ভালবাসে। সেজন্যে নিরক্ষরেখার দিকে—বিশেষ ক'রে যেসব জায়গায় প্রচুর গাছপালা জন্মে অথবা বন আছে সেদিকে যত যাওয়া যায়, ততই নানারকম সাপের দেখা বেশী পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফাবৃত অঞ্চলে সাপ থাকে না; অত্যধিক শীতে সেখানে সাপ বাঁচে না। স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ায় হিমমণ্ডলে সাপের একটি প্রজাতি দেখা যায়; এই অঞ্চলের উপকূলে উষ্ণস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু ততটা ঠাণ্ডা নয়। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে যে সব সাপ থাকে, তাদের শীতকালে শীতনিদ্রায় যেতে হয়। কিন্তু নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী উষ্ণমণ্ডলের সাপদের শীতনিদ্রায় যাওয়ার তত প্রয়োজন ঘটে না।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের ভূমি যত উঁচু হয়, তত সাপ কম দেখা

যায় ; কারণ ঠাণ্ডা বেড়ে যায়। মরুভূমিতে কোন কোন সাপ থাকলেও মরুভূমির যেসব অঞ্চলে অত্যধিক উত্তাপ সেখানে সাপ বাঁচে না।

অ্যাফ্রিকা মহাদেশ হ'ল নাগ গণ অন্তর্ভুক্ত সাপের প্রধান কেন্দ্রস্থল। অ্যাফ্রিকা ছাড়া আর একমাত্র এশিয়া মহাদেশেই নাগ সাপ পাওয়া যায়। বিবরহীন বোড়ার প্রধান বাসস্থানও অ্যাফ্রিকা ; তবে অ্যাফ্রিকাতে সবিবর বোড়া মোটেই পাওয়া যায় না। সবিবর বোড়ার প্রধান বাসস্থান হ'ল আমেরিকা ; আমেরিকাতে আবার বিবরহীন বোড়া নেই। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে অপেক্ষাকৃত বিষহীন সাপ কম আছে ; বিষহীন সাপের চেয়ে বিষধর সাপ বেশী। কি বিবরহীন বোড়া, কি সবিবর বোড়া অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায় না।

ইওরোপ ও উত্তর এশিয়ায় বিষধর সাপের উৎপাত নেই বললেই চলে। কদাচিৎ সেখানে সর্পাঘাতে লোকে মারা যায়। ঐ অঞ্চলে কয়েকটি ছোট বোড়া সাপ রয়েছে।

গায়ের আঁশ

নাকের ডগা থেকে আরম্ভ ক'রে লেজের শেষ পর্যন্ত—সাপের সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা। আঁশগুলি সাধারণতঃ একটার গায়ের ওপর একটা লাগানো। আঁশগুলি আকারে উত্তল অর্থাৎ উপরিভাগ উঁচু।

সাপের আঁশ মসৃণ বা কর্কশ হয়। কোন কোন সাপের আঁশ আবার শির-কুরা।

সাপের দেহের রং দেখে সাধারণতঃ আমরা সাপ চিনি। এ চেনা কিন্তু সব সময় নির্ভুল হয় না। দুই জাতের সাপ, কিন্তু তাদের রং প্রায় একরকম। আবার একই জাতের সাপ, কিন্তু দেহের রং বিভিন্ন। এ ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আবার

কোন কোন সাপের শৈশবাস্থায় দেহে যে চিহ্নাদি থাকে, পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় তার অনেক পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং সাপের দেহের রং ও চিহ্নাদি তার প্রজাতি নির্ণয়ে নির্ভরযোগ্য নয়। রং নয়—বড় জোর রঙের বিন্যাস সাপ চেনার একটা চলনসই মাপকাঠি ব'লে ধরা যেতে পারে।

যা' হ'ক, বিভিন্ন জাতের সাপের আঁশের সংখ্যা, আকৃতি ও বিন্যাসে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতের সাপের আঁশ বিভিন্ন ধরনের। সেজন্যে আঁশের আকৃতি ও বিন্যাস দেখে সর্পবিৎরা সাপের জাত ঠিক করেন।

যে আঁশের লম্বা দিক্ চওড়া দিকের চেয়ে বড়, তাকে বলা হয় ঢাল। কোন আঁশের চওড়া দিক্ তার লম্বা দিকের চেয়ে বড় হলে তাকে পাত বলা হয়।

সাপের পিঠের আঁশ সাধারণতঃ ছোট হয় এবং কতকটা চতুর্ভুজ আকারের ; আঁশগুলি লম্বালম্বিভাবে কতকগুলি সারিতে সাজানো থাকে। সাপের শিরদাঁড়ার ওপর পিঠের মাঝখান বরাবর যেসব আঁশ থাকে, তাদের বলা হয় পৃষ্ঠ্য-আঁশ। পিঠের পার্শ্বস্থ আঁশগুলিকে বলা হয় পার্শ্ব-আঁশ। পেটের ওপর যেসব আঁশ থাকে তাদের বলা হয় অঙ্কতল-আঁশ। পেটে সাধারণতঃ পাত থাকে। এই আঁশ বড় ও চওড়া হয় এবং এক সারিতে সাজানো থাকে ; এই চওড়া আঁশ পেটের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কখনও কখনও অঙ্কতল আঁশ সংকীর্ণ হয়—এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত না হয়ে অপেক্ষাকৃত কম চওড়া হয় অর্থাৎ মাত্র পেটের মধ্যস্থানের অংশ জুড়ে থাকে ; সংকীর্ণ আঁশের দু' পাশে ছোট ছোট আঁশের সারি থাকে। কোন

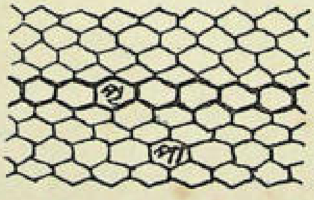

পৃষ্ঠ্য ও পার্শ্ব আঁশ

কোন সাপের অঙ্কতল-আঁশ ছোট এবং পৃষ্ঠ্য-আঁশের মত লম্বালম্বিভাবে কয়েকটি সারিতে সাজানো থাকে। পুঁয়ে সাপের

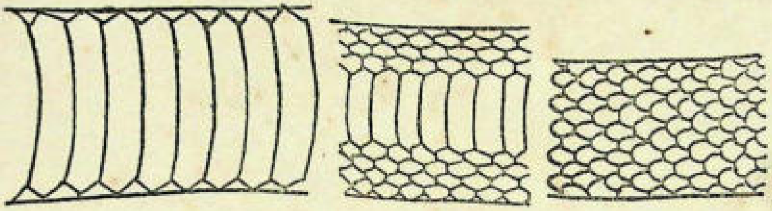

চওড়া অঙ্কতল আঁশ সংকীর্ণ অঙ্কতল আঁশ ছোট অঙ্কতল আঁশ

অঙ্কতল-আঁশ ছোট, ঢেমনার অঙ্কতল-আঁশ চওড়া, আর ময়ালের অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম চওড়া।

যে আঁশটিতে সাপের অবসারণী-ছিদ্র থাকে, তাকে বলা হয়

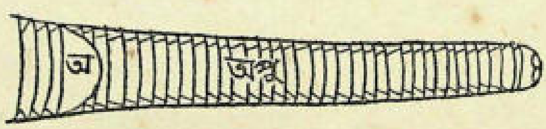

অবসারণী ও অবপুচ্ছ আঁশ

অবসারণী-আঁশ; এই আঁশ দ্বিধা-বিভক্ত অথবা অখণ্ড হতে পারে। অবসারণী-আঁশের পরে লেজের নীচে যেসব আঁশ থাকে, তাদের

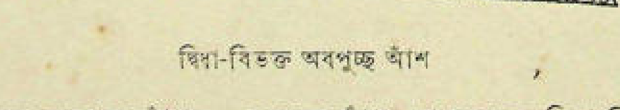

দ্বিধা-বিভক্ত অবপুচ্ছ আঁশ

বলা হয় অবপুচ্ছ-আঁশ; অবপুচ্ছ-আঁশ সাধারণতঃ দ্বিধা-বিভক্ত হয়—কখনও কখনও বা অখণ্ড থাকে।

সাপের মাথায় সাধারণতঃ ঢাল থাকে। মাথায় অবস্থিতির স্থান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আঁশের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে।

চোখ দুটির মাঝখানে অথচ চোখ দুটিকে স্পর্শ না ক'রে মাথার

ওপর যে আঁশটি থাকে, তাকে বলা হয় ললাট-আঁশ। ললাট-আঁশের সামনে যে দুটি আঁশ থাকে, তাদের বলা হয় প্রাগ্‌ললাট-আঁশ। প্রাগ্‌ললাট-আঁশের সামনে যে দুটি আঁশ থাকে, তাদের নাসামধ্য আঁশ বলা হয়। যে আঁশে নাসারন্ধ্র থাকে, তাদের বলা হয় নাসা-আঁশ।

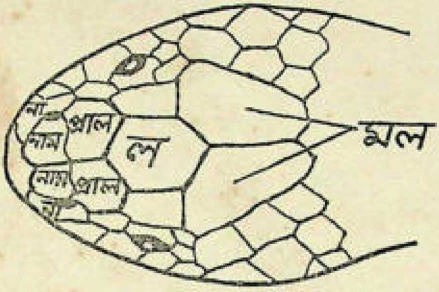

ললাট, প্রাগ্‌ললাট, নাসামধ্য
নাসা ও মধ্যললাট আঁশ

ললাট-আঁশের পেছনে যে দুটি আঁশ থাকে, তাকে বলা হয় মধ্যললাট-আঁশ।

ওপর ঠোঁটের দুপাশের ধার বরাবর যেসব আঁশ থাকে, তাদের বলা হয় উর্ধ্ব-ওষ্ঠ-আঁশ; এই আঁশ মুখের শেষ পর্যন্ত গেছে। উর্ধ্ব-ওষ্ঠ-আঁশের মাঝখানের আঁশটিকে বলা হয় চঞ্চু-আঁশ।

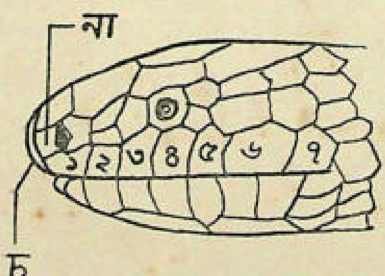

ওষ্ঠ, চঞ্চু ও নাসা আঁশ

নীচের ঠোঁটের দুপাশের ধার বরাবর যেসব আঁশ থাকে, তাদের বলা হয় নিম্ন-ওষ্ঠ-আঁশ। নিম্ন-ওষ্ঠ-আঁশগুলির মাঝখানের আঁশটিকে বলা হয় চিবুক-আঁশ।

উর্ধ্ব-ওষ্ঠ-আঁশ এবং নিম্ন-ওষ্ঠ-আঁশের সংখ্যা চার থেকে সাত—কখনও কখনও তার চেয়ে বেশীও হয়।

চিবুক-আঁশের পেছনে জিবের তলায় সাধারণতঃ দুই জোড়া আঁশ থাকে। এদের মধ্যে সামনের দিকের আঁশ দুটিকে বলা হয়

সম্মুখ-অবজিহ্বা-আঁশ এবং পশ্চাৎ দিকের আঁশ দুটিকে বলা হয়

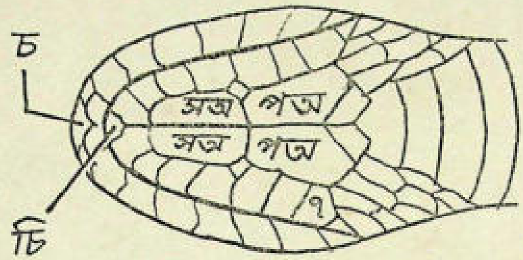

সম্মুখ-অবজিহ্বা, পশ্চাৎ-অবজিহ্বা, চিবুক ও চক্ষু আঁশ ; ৭—সপ্তম নিম্ন-ওষ্ঠ-আঁশ

পশ্চাৎ-অবজিহ্বা-আঁশ। অবজিহ্বা-আঁশের মাঝখান দিয়ে যে খাঁজ থাকে, তাকে বলা হয় চিবুক-খাঁজ।

মধ্যললাট-আঁশের পাশে থাকে রগ-আঁশ। কখনও কখনও মধ্যললাট-আঁশের পেছনে বড় বড় আঁশ থাকে ; তাদের বলা হয় পশ্চাৎ-মস্তক-আঁশ বা পশ্চাৎ-ললাট-আঁশ।

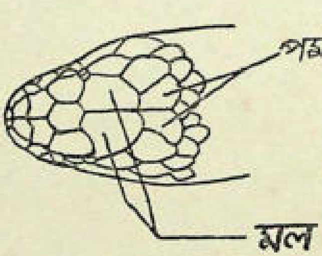

মধ্য-ললাট ও পশ্চাৎ-মস্তক আঁশ

নাক ও চোখের মধ্যস্থিত অংশের আঁশকে বলা হয় নাসা-নেত্র আঁশ।

চোখের ওপরে, নীচে, সামনে বা পেছনে—অবস্থান অনুযায়ী আঁশগুলিকে যথাক্রমে উর্ধ্বনেত্র-আঁশ, অবনেত্র-আঁশ, প্রাগ্‌নেত্র-আঁশ ও পশ্চাৎ-নেত্র-আঁশ বলা হয়।

সাপ-সদৃশ প্রাণী

এমন অনেক প্রাণী আছে যারা সাপের মত দেখতে অথচ আসলে সাপ নয়। সাধারণ লোকে এদের সাপ ব'লে ভুল করে। আবার কোন কোন প্রাণীকে সাধারণ্যে সাপ ব'লে গণ্য করা হয়—যদিও তারা সাপ নয়। এমন কয়েকটি প্রাণীর কথা বলি।

আমাদের দেশে গাঁয়ে কেঁচোকে অনেক সময় সাপ ব'লে লোকে ভুল করে। কিন্তু কেঁচোর আর সাপের দেহে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেঁচোর দেহ অঙ্গুরীয়াকার—অঙ্গুরীর মত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত; সাপের দেহ সেরকম নয়। সাপের দেহে আঁশ আছে; কেঁচোর দেহে আঁশ নেই। সাপের অবসারণী-ছিদ্র দেহের তলায় লেজ যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে; কেঁচোর পায়ু-রন্ধ্র দেহের একদম শেষ অংশে।

কেশকীট নামে এক ধরনের পোকাকে অনেক সময় সাপ ব'লে ভুল হয়। এই পোকার দেহ লম্বা, সরু ও গোলাকার। দেহের গঠন এরকম ব'লেই সাপ মনে হয়। রং সাদা। অশ্বকেশের মত দেখতে ব'লে এই নাম। কেশকীটের দেহে আঁশ নেই। কেশকীট জলে বাস করে; ৬০ সেন্টিমীটর পর্যন্ত লম্বা হয়।

কেশকীটের জন্ম-ইতিহাস একটু অদ্ভুত ধরনের। এরা জলে ডিম ছেড়ে দেয়; সেই ডিম জলজ গাছপালায় লেগে থাকে; ডিম থেকে ভ্রূণ জন্মালে ঐ ভ্রূণ জলের কোন কম্বোজ, কীট বা জলবাসী সাপের দেহে ছিদ্র ক'রে বাস করে। কালক্রমে একদিন তাদের দেহ থেকে কেশকীট বের হয়ে আসে—সাধারণতঃ একদিনেই অনেক সংখ্যায় বের হয়। বর্ষাকালে ডাঙায়—

জলাশয়ের আশপাশে তাদের দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে ভাবে, বৃষ্টির সঙ্গে বুঝি অনেক পোকা ওপর থেকে পড়েছে, নইলে এত পোকা হঠাৎ কোথা থেকে এল! কেশকীটকে যারা সাপ ব'লে ভুল করে, তারা বলে বৃষ্টির সঙ্গে অনেক সাপের বাচ্চা পড়েছে।

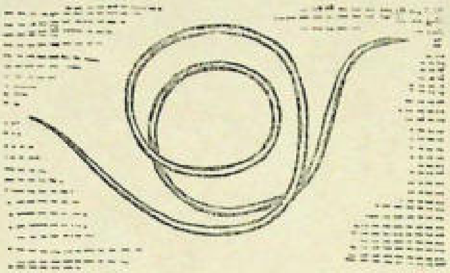

কেশকীট

কোন কোন মাছকেও গাঁয়ের নিরক্ষর লোকে সাপ মনে করে। সর্পাকৃতি কুঁচে মাছ তার মধ্যে বোধ হয় প্রধান। বান মাছও সাপের মত দেখতে। চ্যাং মাছকেও সাপ মনে করা হয়। সাপ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস নেয়; মাছ শ্বাস নেয় ফুলকার সাহায্যে।

অন্ধ-উভচরদেরও ভূনিম্নবাসী সাপ ব'লে ভুল হয়। লম্বা পোকার মত দেখতে; পা নেই। এদের পায়ু-রন্ধ্র কিন্তু দেহের শেষ অংশে। মাটির তলায় সিঁধিয়ে বাস করে; শূক অবস্থায় জলে থাকে।

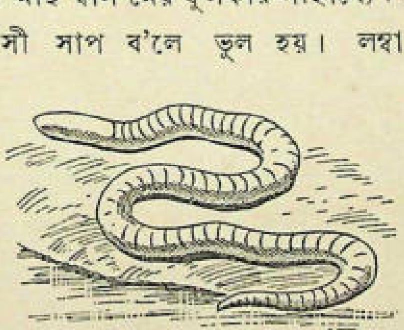

অন্ধ-উভচর

নিউটকেও অনেকে সাপ মনে করে। নিউট উভচর; আকৃতিতে টিকটিকির মত; চারটে ছোট ছোট পা আছে। অধিকাংশ সময় ডাঙায় বাস করে—পাথরের তলায়, গর্তে, ঘাস-শেওলায় লুকিয়ে থাকে। জলাশয়ের আশপাশে দেখা যায়। ডিম পাড়ার সময় জলাশয়ে নেমে জলজ গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। পোকা-মাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে।

কোন কোন গিরগিটি-আদি প্রাণী আছে যাদের সাপের মত দেহ থেকে ঝুলে-পড়া কোন প্রত্যঙ্গ নেই। এদের সাপ ব'লে ভুল হয়।

অন্ধ-জোষ্ঠী গিরগিটি-আদি প্রাণী হলেও দেখতে পোকার মত। পা নেই; চোখ এত ছোট যে সাধারণতঃ মনে করা হয় অন্ধ। সেজন্যে অন্ধ-জোষ্ঠী নাম। দেখতে অল্প বাদামী রঙের। লেজ খুবই ভঙ্গুর। খোলকহীন গেঁড়ি ও পোকা-মাকড় খায়; সাধারণতঃ রাত্রিতে বের হয়। অন্ধ-জোষ্ঠী প্রায় ৩০ সেন্টিমীটর বড় হয়।

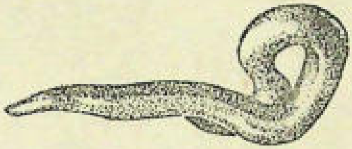

অন্ধ-জোষ্ঠী

গোসাপ, তক্ষক, কাঁকলাস, আঞ্জনি—এসব গিরগিটি-আদি প্রাণীকেও গাঁয়ের অজ্ঞ লোকে সাপ মনে করে।

গোসাপ দেখতে অনেকটা বাচ্চা কুমিরের মত। লম্বায় ২ মীটর পর্যন্ত হয়। জিব সাপের মত চেরা। লম্বা ঘাড় উঁচিয়ে গোসাপ যখন তার দোফলা জিব বের ক'রে দূর থেকে তাকায়, তাকে সাপ ভাবাই স্বাভাবিক। গায়ের চামড়া বেশ শক্ত। বিষধর ও বিষহীন দু' রকম সাপই এর খাদ্য। সাধারণতঃ বাচ্চা সাপই খেয়ে থাকে। সাপের ডিমও খেতে গোসাপ ওস্তাদ। সাপ খায় ব'লে গাঁয়ে গোসাপ থাকার উপকারিতা আছে। কিন্তু এর চামড়া দিয়ে ভাল ভাল জিনিস তৈরী হয় ব'লে চামড়ার লোভে অনেকে গোসাপ হত্যা করে। কোন কোন জাতি গোসাপের মাংসও খায়। পুকুর বা জলার ধারে গোসাপ বাস করে। ভাঙা বাড়ির মধ্যেও বাস করে; ছাদের আনাচে-কানাচে কখনও কখনও ঘুরে বেড়ায়। ঝোপে-ঝাড়ে বড় গর্ত

ক'রে তার মধ্যে থাকে ; সেখানেই ডিম পাড়ে। জলে নেমে কখনও কখনও মাছ পোকা-মাকড় খায়। সুবিধা পেলে গৃহস্থের হাঁস-মুরগী ধরে।

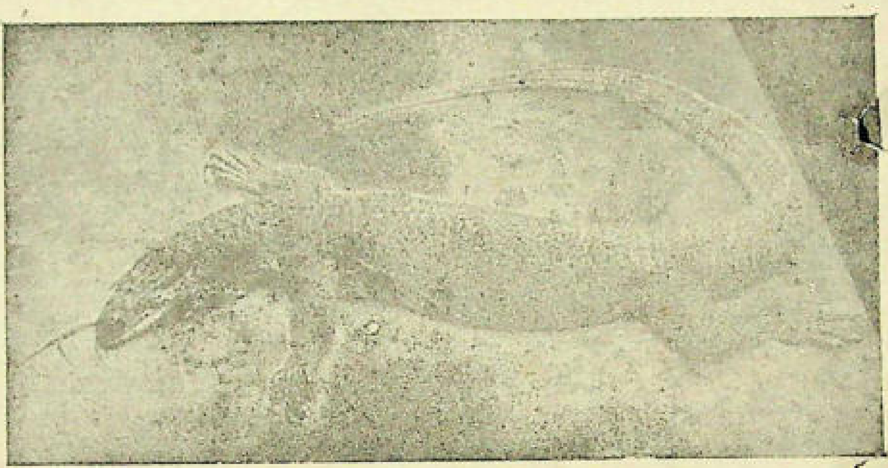

গোসাপ

গোসাপের ডাক দূর থেকে শুনলে মনে হয় কে যেন উলু দিচ্ছে। খুব গরমের দিনে দুপুর বেলায় বন-জঙ্গলে গোসাপের ডাক শোনা যায়। এজন্যেই বোধ হয় লোকে বলে, গোসাপ উলু দিলে বৃষ্টি হয়। গোসাপ ত্যক্ত হলে লেজের বাড়ি দেয়। শত্রুকে দেখলে লেজ নাড়তে থাকে। গোসাপ লেজে যত না শক্তি ধরে, তার চেয়ে শত্রুকে ভয় দেখানোই তার আসল উদ্দেশ্য।

গোসাপের গা কতকটা মেটে রঙের। অবশ্য হলদে রঙেরও গোসাপ দেখা যায়। হলদে রঙের গোসাপ সোনা গোসাপ নামে অভিহিত।

গোসাপ গুইসাপ, গোধা, গোধিকা ও গোহাড়গিল নামেও পরিচিত।

কারও কারও বিশ্বাস, গোসাপ গরুকে কামড়ালে গরু আর বাঁচে না। একথা ঠিক নয়। সাপ ব'লে গণ্য অথচ নিরীহ—এ

থেকেই বোধ হয় গোসাপ নাম এসেছে। গোসাপ গাছে উঠতে পারে; এর পায়ের নখরের জোর খুব বেশী; সেই নখরের সাহায্যেই গোসাপ সহজে গাছে ওঠে। একটি গোসাপ গাছে উঠে আড়াই মীটর উঁচু থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েছিল; ভাঙা বাড়ির ছাদ থেকেও এরা মাটিতে লাফ দেয়। গল্প প্রচলিত আছে, আগেকার কালে ডাকাতেরা কোন পাঁচিল ডিঙতে হলে গোসাপের সাহায্য নিত। একটি গোসাপের দেহে দড়ি বেঁধে রাতের অন্ধকারে তারা তাকে পাঁচিলে তুলে দিত। গোসাপটা পাঁচিলে উঠে নখর দিয়ে নিজেকে মাটিতে আঁকড়ে রাখত। তখন ডাকাতেরা একে একে সেই দড়ি ধ'রে পাঁচিলের ওপর উঠত।

তক্ষক বড় গিরগিটির মত দেখতে। গাছের ওপর বা বাড়ির মাচার ওপর উঠে জোরে জোরে ডাকে। টক্-কক্ টক্-কক্ শব্দ ক'রে বুঝি ডাকে; তাই তক্ষক নাম। পোকা-মাকড় ধ'রে খায়। বসতবাড়িতেও তক্ষক বাস করে। প্রধানতঃ রাত্রিতে বের হয়ে পোকা-মাকড় ধরে।

তক্ষকের সাধারণ দৈর্ঘ্য ১৫ সেন্টিমীটর; তবে ৩৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘও তক্ষক দেখা যায়।

অনেকের ধারণা, তক্ষকের দংশনে ভীষণ বিষ। একথা ঠিক নয়। তক্ষক নিরীহ প্রকৃতির জীব; এর মুখে বিষগ্রন্থি বা বিষদাঁত নেই। গাছ থেকে নামার সময় একজনকে তক্ষকে কামড়েছিল। তক্ষক খুবই বিষধর—এই ভ্রান্ত ধারণায় সে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। তাকে ভয় করতে বারণ করি। তার কোন ক্ষতিই হয় না।

একটা কিংবদন্তী আছে, তক্ষক উড়তে পারে। কিন্তু সত্যিই তো তক্ষক উড়তে পারে না। তক্ষকের এই উড়ার কিংবদন্তীর উৎপত্তি কি হতে পারে? তক্ষক গাছ বেয়ে···ভাঙা পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠে থাকে—অজ্ঞ লোকে ভাবে উড়েই বুঝি

ওখানে উঠেছে। এভাবেই বোধ হয় তক্ষকের উড়তে পারার কিংবদন্তী তৈরী হয়েছে।

আর একভাবে এই কিংবদন্তীর উৎপত্তি হতে পারে। গিরগিটি-আদি বর্গের কোন কোন প্রাণী উড়ুক্কু সাপের মত বাতাসে ভেসে যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতে এরকম একটি প্রাণী আছে। তক্ষকের সমতুল্য আকৃতি ব'লে তাকেও তক্ষক মনে করায় প্রাচীনকালে তক্ষকের উড়ার কিংবদন্তী বোধ হয় সৃষ্টি হয়েছিল।

কাঁকলাসও বড় গিরগিটির মত। তবে দেহ দু'পাশে চেপটা, আর ঘাড়ে-পিঠে থাকে আঁশের চুড়ো। মাথা কাঁপায়, তাই কাঁকলাস (কৃকলাস) নাম। পুরুষ কাঁকলাসরা দেহের রং বদলাতে পারে; কখনও লাল, কখনও হলদে, কখনও বা মেটে; সেজন্যে কাঁকলাসকে বহুরূপীও বলা হয়। প্রজনন ঋতুতে এদের মুখ ও গলা লাল দেখায়। লোকে দেখে ভয় পায়। বলে "রক্তচোষা"—মানুষের রক্ত চুষে খায়; তাই গলা লাল। কথাটা ঠিক নয়। কাঁকলাসকে ফেউটিও বলে।

আঞ্জনি দেখতে বেশ সুন্দর। আঞ্জনির গা খুব ছোট চকচকে আঁশ দিয়ে আবৃত; তার ওপর সূর্যের কিরণ পড়লে ঝকমক করে। গায়ের রং পাটকিলে; পিঠে অঞ্জনের মত লম্বা রেখা থাকে। অঞ্জনের মত রেখা থাকায় আঞ্জনি নাম। আঞ্জনির পা খুব ছোট—হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি পা নেই। ১৫ সেন্টিমীটরের বেশী বড় হয় না। ঝোপ-ঝাড়ে থাকে। পোকা-মাকড় খায়। সাধারণ লোকে আঞ্জনিকে "সাপের মাসী" বলে; কিন্তু সাপের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। খুবই নিরীহ প্রাণী।

সাপ নয় অথচ সাধারণ্যে সাপ ব'লে গণ্য অথবা সাপ ব'লে ভুল হয়—যেসব প্রাণীর কথা বললাম, তাদের কোনটাই বিষধর নয়—মানুষের ক্ষতিও করে না।

বৈজ্ঞানিক নামকরণ ঃ গোত্র-বিভাগ

ZOOLOGICAL GARDEN
CALCUTTA
ALIPORE

বৈজ্ঞানিক নামকরণ

একই সাপ, অথচ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাম। শাঁখামুটি সাপের কথাই ধরা যাক। এ সাপকে কোথাও বলে শঙ্খিনী, কোথাও বলে রাজসাপ, কোথাও বা বলে রানা সাপ, ছমুখো নামেও এ সাপ অভিহিত। এতে বেশ অসুবিধা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকই সাপটাকে চেনে; কিন্তু তারা যে চেনে, একথা তারা পরস্পরকে বলতে পারে না। অপরপক্ষে তারা ভাবে, ভিন্ন নাম যখন তখন ভিন্ন সাপ হওয়া স্বাভাবিক। শাঁখামুটি নামে যে জানে, শঙ্খিনী নামে সে অন্য সাপ ভাবে; রানা সাপ নামে যে জানে, সে ভাবে শাঁখামুটি বুঝি অন্য সাপ। আসলে এই নামগুলি স্থানীয় লোকের দেওয়া; তাই এক এক অঞ্চলের নাম অন্য অঞ্চলের নামের সঙ্গে মেলে না। স্থানীয় নামে আরও অসুবিধা আছে। একই নাম অথচ দুই অঞ্চলের লোক ভিন্ন ভিন্ন সাপ বোঝে। রাজসাপ বলতে অনেকে শাঁখামুটি বোঝে, কেউ কেউ আবার সাপেদের রাজা শঙ্খচূড়কে রাজসাপ বলে। কালনাগিনী সাপে কাউকে দংশন করেছে—লোকবিশেষের এ কথার অর্থ জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে ওঠে। কালনাগিনী আসলে হ'ল বিচিত্র রঙের পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ; এ সাপ কদাচিৎ মানুষকে দংশন করে; দংশন করলেও প্রাণহানি ঘটে না। কিন্তু কালনাগিনী বলতে কেউ কেউ কাল কেউটে বুঝে থাকে। বলা বাহুল্য, কাল কেউটের দংশনে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

স্থানীয় নামের এই সব অসুবিধা দূর করতে বাংলায় তথা ভারতীয় ভাষাসমূহে বিভিন্ন সাপের বৈজ্ঞানিক নামকরণের প্রশ্ন ওঠে। একটি সাপের বৈজ্ঞানিক নাম একটিই থাকবে এবং

সকলে—বিশেষ ক'রে বৈজ্ঞানিক মহলে ঐ নামেই সাপটিকে জানবে। স্থানীয় নাম যা' রইল, তা' তো রইলই।

প্রাণী-বিভাগের প্রসঙ্গে বর্গের কথা বলেছি। বর্গ আরও ছোট দলে বিভক্ত হয়েছে গোত্রে। গোত্রের ছোট ছোট অংশকে বলা হয় উপগোত্র। উপগোত্র আবার গণে বিভক্ত হয়েছে। গণের ছোট ছোট অংশের নাম প্রজাতি। প্রজাতি আবার বিভক্ত হয়েছে প্রকারে।

সাধারণতঃ প্রজাতিকেই প্রাণী-বিভাগের সর্বক্ষুদ্র অংশ ব'লে ধরা হয়—যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকারেরও প্রশ্ন ওঠে। জাত বা ধরন বলতে সাধারণতঃ আমরা প্রজাতি বা প্রকার বুঝে থাকি।

প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের কতকগুলি সাধারণ সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে যা' তারা বংশানুক্রমে পেয়ে থাকে। এদের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যৌন মিলন ঘটে এবং তাদের বাচ্চা হয়। এক প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গে অপর এক প্রজাতির যৌন মিলন ঘটে না ; যদি বা ঘটে, তা' হ'ল ব্যতিক্রম ; তাদের আমরা বলি বর্ণসংকর।

কোন কোন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণীরা অনেকটা অঞ্চল জুড়ে বাস করে। তাদের মধ্যে কখনও কখনও স্থানীয় ভেদ দেখা যায়। এক দল থেকে আর এক দলের এই ভেদ বেশ সুস্পষ্ট হলে তাদের প্রকার বলা হয়। এই ভেদ প্রধানতঃ দেহের রঙে ও তার বিন্যাসে দৃষ্ট হয়।

সাপ তথা প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামকরণে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়—প্রথম শব্দ প্রাণীটির গণ বোঝায়, আর দ্বিতীয় শব্দ প্রাণীটির প্রজাতি বোঝায়। দুটি শব্দ দিয়ে নামকরণ করা হয় ব'লে একে দ্বিপদ নামকরণ বলে। দ্বিপদ নামকরণের সুবিধা এই যে, সাপের তথা প্রাণীটির বৈজ্ঞানিক নাম জানার সঙ্গে সঙ্গে তার গণ

ও প্রজাতি আমরা জানতে পারি—প্রাণীটার একটা ধারণাও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

প্রকারের কথা বলেছি। প্রকার বোঝানোর প্রয়োজন হলে দ্বিপদ নামকরণের পরিবর্তে ত্রিপদ নামকরণ করা হয়। ত্রিপদ নামকরণে প্রথম শব্দটি গণ, দ্বিতীয় শব্দটি প্রজাতি এবং তৃতীয় শব্দটি প্রকার বোঝায়।

পাশ্চাত্যভাষীরা প্রাণী তথা সাপের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেছেন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সাহায্যে। আমাদের দেশের লোক গ্রীক-ল্যাটিন ভাষার সহিত অপরিচিত। সুতরাং সাপ তথা প্রাণীদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ ব্যাপারে আমাদের সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিতে হবে। এর জন্যে কয়েকটি নিয়ম বেঁধে নিতে হবে। আমার বুদ্ধিমত যেসব নিয়ম বেঁধে নিয়েছি, তাদের কথা বলি :

(ক) সাপ তথা প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কৃত ভাবাপন্ন শব্দ বা সংস্কৃত শব্দ ব'লে গণ্য শব্দ হবে।

(খ) গণ নির্ণায়ক শব্দটি হবে বিশেষ্য অথবা বিশেষণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত ; এর রূপ হবে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপের অনুরূপ। শব্দটি অকারান্ত হলে ভাল হয়, তবে শব্দটির শেষ অক্ষর সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ কোন শব্দের অনুরূপ হতে হবে।

(গ) প্রজাতি নির্ণায়ক শব্দটি হবে বিশেষণ অথবা বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত ; শব্দটি গণ নির্ণায়ক শব্দটিকে বিশেষিত করবে অথবা গণ নির্ণায়ক শব্দটির সমপদ হয়ে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ গ্রহণ করবে। শব্দটি অকারান্ত হলে ভাল হয়।

(ঘ) প্রকার নির্ণায়ক শব্দটিও হবে বিশেষণ অথবা বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। শব্দটি প্রজাতি নির্ণায়ক শব্দটিকে বিশেষিত করবে অথবা তার সমপদ হবে। শব্দটি অকারান্ত হলে ভাল হয়।

(ঙ) কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গণগুলির জাতিরূপ বা প্রধান গণ নির্ণায়ক শব্দটির সঙ্গে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের একবচনের পঞ্চমী বিভক্তি যোগ করলে গোত্র নির্ণায়ক শব্দটি তৈরী হবে।

(চ) কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রধান গণ নির্ণায়ক শব্দটির সঙ্গে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের একবচনের সপ্তমী বিভক্তি যোগ করলে উপগোত্র নির্ণায়ক শব্দটি তৈরী হবে।

বেঁধে-দেওয়া এই সব নিয়ম অনুসারে চন্দ্রবোড়া সাপের বৈজ্ঞানিক নাম হবে—বোড্রম্ চান্দ্রম্। বোড্রম্ গণ; চান্দ্রম্ প্রজাতি। চন্দ্রবোড়া যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, বোড্রম্ই তার প্রধান গণ। সুতরাং সে গোত্রের ও উপগোত্রের যথাক্রমে বৈজ্ঞানিক নাম—বোড্রাৎ ও বোড্রে।

চক্রধর সাপের বৈজ্ঞানিক নাম—নাগম্ সামান্যম্। কেউটে চক্রধর সাপের একটি প্রকার। কেউটের বৈজ্ঞানিক নাম—নাগম্ সামান্যম্ কৃষ্ণাদি। নাগম্ গণ, সামান্যম্ প্রজাতি এবং কৃষ্ণাদি প্রকার।

গোত্র-বিভাগ

সাপ বর্গ—পৃথিবীর যাবতীয় সাপ দশটি গোত্রে বিভক্ত: (১) অন্ধক (২) উপান্ধক (৩) পট্টপুচ্ছক (৪) নলক (৫) বিচিত্রশল্কক (৬) মহোরগ (৭) পন্নগ (৮) ভুজঙ্গ (৯) বোড়া (১০) সামুদ্র-সাপ। এই গোত্র-বিভাগের প্রধান ভিত্তি হ'ল সাপের মাথার খুলি; সব সাপের মাথার খুলির গঠন একরকম নয়। এ ছাড়া পার্থক্য দেখা যায় সাপের দাঁতে, গায়ের আঁশের আকৃতিতে ও বিন্যাসে এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে। গোত্র বিভাগের সময় এগুলিও গণ্য করা হয়।

আজও পৃথিবীতে যেসব সাপ দেখা যায়, তাদের সংখ্যা কম-বেশী ২৫০০। এই ২৫০০ সাপের ৫ শতেরও কম সাপ বিষধর।

আবার এদের মধ্যে মানুষের পক্ষে মারাত্মক বিষধর সাপের সংখ্যা আরও কম। ২০০০ অবিষধর সাপের অনেকগুলিই প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকার ক'রে থাকে—ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় এবং শস্যহানিকর প্রাণীদের খায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে সব গোত্রেরই সাপ পাওয়া যায়। বোধ হয় এ অঞ্চল থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র সাপ ছড়িয়ে পড়ে।

অন্ধক গোত্র

অন্ধক গোত্রের (অন্ধকাৎ) অন্তর্ভুক্ত সাপগুলি খুব ছোট ; সাধারণতঃ ২০ সেন্টিমীটরের বেশী বড় হয় না। দেহ সরু ; বেলনাকার—বেড় সর্বত্র একইরকম ; ঘাড় থেকে মাথা স্পষ্ট নয়। হঠাৎ দেখলে কেঁচো বা ঐ ধরনের কোন পোকা ব'লে মনে হয়। গায়ের ওপর চকচকে তেলা ছোট আঁশ একটার গায়ের ওপর একটা লাগানো থাকে ; এই চকচকে আঁশই বুঝিয়ে দেয় অন্ধক সাপ সাপই—পোকা নয়। অন্ধকের অঙ্কতল-আঁশ ছোট—পেটের একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত যায় নি। ছোট চোখ দুটো মাথার আঁশের তলায় লুকনো থাকে ; সহসা দেখা যায় না ; মনে হয় যেন দুটি ছোট বিন্দু। সেজন্যে অন্ধক নাম। লেজ খুব ছোট। মাত্র ওপর চোয়ালে দাঁত থাকে । নীচের চোয়ালে দাঁত থাকে না, অথবা এক এক পাশে মাত্র একটি ক'রে দাঁত থাকে। গায়ের রং কালচে বা বাদামী ; সাধারণতঃ এর ওপর অন্য কোন রঙের রেখা থাকে না। জিব অন্যান্য সাপেরই মত চেরা। অন্ধকের দেহে সাধারণতঃ শ্রোণীচক্রের অবশেষ দেখা যায়।

অন্ধক সাপ ভূনিম্নবাসী। আলগা মাটিতে সিঁধিয়ে অন্ধক চলাফেরা করে। ওপরে তুললেও অন্ধক মাটির তলায় আবার সিঁধিয়ে যেতে চায়। মাটিতে যাতে সহজে গর্ত করতে পারে,

সেজন্যে অধিকাংশ অন্ধকের লেজের শেষ অংশ তীক্ষ্ণ-কীলকের মত। হাতে তুলে নিলে অন্ধক কখনও কখনও এই কীলক ফুটিয়ে দেয়। এই কীলক সম্পূর্ণ নির্দোষ; কিন্তু সাধারণ অজ্ঞ লোকের ধারণা, এই কীলকে বুঝি বিষ থাকে। ছোট হলেও অন্ধক বেশ সক্রিয় সাপ। আঁশ তেলা হওয়ায় গায়ে মাটি আটকে যায় না; নরম মাটির ভেতরে দ্রুত চলাফেরার কোন অসুবিধা হয় না। মাটির ওপরও অন্ধককে দেখা যায়; তবে তেমন ভালভাবে চলাফেরা করতে পারে না; ত্যক্ত হলে অনেক সময় লাফ দেয়।

পাকা বাড়ির স্যাঁতসেঁতে জায়গায় অনেক সময় অন্ধক আশ্রয় নেয়; ভাঙা পচা কাঠের তলাতেও থাকে। অন্ধকের খাদ্য ছোট পোকা-মাকড় আর তাদের ডিম এসব জায়গায় পাওয়া যায়। উই-ঢিবিতেও অন্ধককে দেখা যায়; উই এ সাপের খুব প্রিয়। উই খেতেই অন্ধক মানুষের বাসস্থানে ঢোকে ব'লে মনে হয়। বইয়ের স্তূপের ভেতরে একাধিক বার বোধ হয় এজন্যেই অন্ধক সাপ দেখেছি।

অন্ধক তিনটি থেকে আটটি ডিম পাড়ে অথবা বাচ্চা দেয়।

অন্ধক বিষহীন সাপ।

পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব দেশেই অন্ধক দেখা যায়; গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকা, আ্যাফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় এই সাপ পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত খ্রীষ্টমাস দ্বীপে অন্য কোন সাপ নেই, কিন্তু অন্ধক আছে।

অন্ধক গোত্রে মোট ৫টি গণ এবং প্রায় ২০০ প্রজাতি আছে। ৫টি গণের মধ্যে ৪টি গণ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ—বাইরে আর কোথাও পাওয়া যায় না। অপর ও বড় গণটি হ'ল অন্ধক (অন্ধকম্); এই গণের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১৭০।

দক্ষিণ আ্যাফ্রিকার দীর্ঘ অন্ধক (অন্ধকম্ লম্বিতম্) সবচেয়ে বড়

অন্ধক সাপ ব'লে মনে হয়; একটির দেহ মেপে দেখা গেছে ৭৫ সেন্টিমীটর। অন্ধকের সাধারণ রং কালচে বা বাদামী হলেও অ্যাফ্রিকার কৃষ্ণপীত অন্ধকের (অন্ধকম্ কৃষ্ণপীতম্) গা কাল ও হলদে রঙে চিহ্নিত।

ভারতে অন্ধক গোত্রের ১৪টি প্রজাতি পাওয়া যায়; তার মধ্যে কয়েকটি প্রজাতির নাম ঃ

(ক) পুঁয়ে সাপ (অন্ধকম্ সামান্যম্)—দৈর্ঘ্য ১৭ সেন্টিমীটর।

(খ) অপর-অন্ধক (অন্ধকম্ অপরম্)—দৈর্ঘ্য ২৮ সেন্টিমীটর।

(গ) তীক্ষ্ণচঞ্চু অন্ধক (অন্ধকম্ তীক্ষ্ণম্)—এশিয়াতে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় অন্ধক; দৈর্ঘ্য ৬০ সেন্টিমীটর।

(ঘ) খর্ব অন্ধক (অন্ধকম্ খর্বম্)—দৈর্ঘ্য ১৪ সেন্টিমীটর।

উপান্ধক গোত্র

অন্ধকের মত উপান্ধক গোত্রেরও (উপান্ধকাৎ) সাপগুলি খুব ছোট—পোকার মত; বস্তুতঃ অন্ধকের চেয়ে উপান্ধক সাপ আরও ছোট। অন্ধকের মত উপান্ধকও মাটিতে সিঁধিয়ে চলাফেরা করে। অন্যান্য বিষয়েও তাদের মিল আছে। দেহ বেলনাকার—বেড় সর্বত্র একইরকম; চোখ আঁশের তলায় লুকনো। তবে পার্থক্য এই যে, অন্ধকের ওপর চোয়ালে দাঁত আছে, আর নীচের চোয়ালে দাঁত নেই; অপরপক্ষে উপান্ধকের মাত্র নীচের চোয়ালে দাঁত আছে, ওপর চোয়ালে দাঁত নেই।

উপান্ধকের গায়ের সাধারণ রং বাদামী বা কাল। অন্ধকের মত উপান্ধকেরও দেহে সাধারণতঃ শ্রোণীচক্রের অবশেষ থাকে, তবে তা' আরও হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে।

উপান্ধক বিষহীন সাপ।

অ্যাফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া (পশ্চিম-পাকিস্তান সমেত) ও গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকাতে উপান্ধক সাপ পাওয়া যায়।

উপান্ধক গোত্রে মাত্র ১টি গণ এবং প্রায় ৪০টি প্রজাতি আছে।

গণটির নাম উপান্ধক (উপান্ধকম্)। গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকার সিতপ্রান্ত উপান্ধকের (উপান্ধকম্ সিতপ্রান্তম্) মাথার ওপর অংশ আর লেজের শেষ অংশ সাদা। দেহের দু' দিক্‌ই সাদা হওয়াতে কোন্ দিক্ মুখ সহসা বোঝা যায় না; কোন শত্রু তাকে আক্রমণ করতে অসুবিধায় পড়ে।

ভারতে উপান্ধক সাপ পাওয়া যায় না বললেও চলে; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম-পাকিস্তানে এই গোত্রের যে দুটি প্রজাতি পাওয়া যায়, তারা হ'ল:

(ক) উন্নতনাসা উপান্ধক (উপান্ধকম্ উন্নতনাসিকম্)—নাসাগ্র উন্নত; দৈর্ঘ্য ২৮ সেন্টিমীটর।

(খ) অপর-উপান্ধক (উপান্ধকম্ অপরম্)—দৈর্ঘ্য ২৪ সেন্টিমীটর।

পট্টপুচ্ছক গোত্র

পট্টপুচ্ছক গোত্রের (পট্টপুচ্ছকাৎ) সাপরাও ভূনিম্নবাসী। অন্যান্য ভূনিম্নবাসী সাপদের তুলনায় পট্টপুচ্ছক মাটির তলায় বাস করার পক্ষে নিজেকে অধিকতর উপযোগী ক'রে নিয়েছে। অন্য যে কোন গোত্রের সাপের চেয়ে এ সাপের মাথার খুলির বিভিন্ন অস্থি পরস্পরের সঙ্গে অধিকতর শক্ত ক'রে আটকানো। মাথা ছোট আর অগ্রভাগ ছুঁচালো; তাতে মাটির ভেতর ঢোকার সুবিধা হয়। দেহ বেলনাকার এবং দৃঢ়; ঘাড় থেকে মাথা স্পষ্ট নয়; চোখের তারা গোল। লেজ ছোট। পট্টপুচ্ছকের লেজের বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকাংশ পট্টপুচ্ছকের লেজ হঠাৎ একটা চেপটা ঢালে এসে শেষ হয়েছে—দেখলে

মনে হয় লেজটার শেষ অংশ কে যেন এককোপে ঢালুভাবে কেটে নিয়েছে। এজন্যেই এ সাপের নাম পট্টপুচ্ছক। এরকম খণ্ডিত লেজ পট্টপুচ্ছকের কি কাজে লাগে, বলা সহজ নয়। হয়তো যে গর্তে সাপটা থাকে, তার মুখ বন্ধ রাখার কাজে লাগে; অথবা এর ওপর ভর দিয়ে মাটির তলায় এ সাপ চলাফেরা করে। কোন কোন পট্টপুচ্ছকের আবার এই চেপটা ঢালের ওপর দু-মাথাওলা কাঁটার মত থাকে। লেজ দেখলেই পট্টপুচ্ছককে চেনা যায়। গায়ের ওপরকার আঁশ তেলা ও গোলাকার। অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ, পেটের একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত যায় নি—মধ্যাংশে সীমাবদ্ধ।

পট্টপুচ্ছকের রং বাদামী বা কাল। কোনটার কোনটার পিঠের প্রধান রঙের ওপর লাল, নারঙ্গ ও হলদে ছোপ থাকে; সেজন্যে দেখতে ভারী সুন্দর হয়। দৈর্ঘ্যে ৭৫ সেন্টিমীটর—যদিও কদাচিৎ ৩০ সেন্টিমীটরের বড় হয়।

কেঁচো পট্টপুচ্ছকের প্রধান খাদ্য; পোকা-মাকড়ও খায়।

যতদূর জানা যায়, সব পট্টপুচ্ছকই বাচ্চা দেয়; একবারে তিনটে থেকে আটটা বাচ্চা হয়।

পট্টপুচ্ছক ভীরু প্রকৃতির সাপ। সহজে কাউকে কামড়ায় না; মুখ ছোট—সুতরাং কামড়ালেও বিশেষ আঘাত লাগে না। হাতে তুলে নিলে এ সাপ হাত জড়িয়ে ধরে। লাঠি দিয়ে নাড়া দিলে পালাতে চেষ্টা করে না, লাঠি জড়িয়ে ধরে; সেই অবস্থায় এ সাপকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া যায়। পট্টপুচ্ছক চলাফেরা করেও খুব আস্তে আস্তে।

পট্টপুচ্ছক বিষহীন সাপ।

পট্টপুচ্ছকের বসতি খুব সীমাবদ্ধ। মাত্র দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে এ সাপ পাওয়া যায়। বাংলায়ও দেখা যায়। পাহাড় অঞ্চলে—বিশেষ ক'রে পাহাড়ের নীচের বন-বাদাড়ে স্যাঁতসেঁতে

জায়গায় আলগা মাটির তলায় এ সাপ থাকতে ভালবাসে। খুব বৃষ্টির পর পট্টপুচ্ছককে বাগানে বা রাস্তায় সাধারণতঃ দেখা যায়।

পট্টপুচ্ছককে 'পট্টপুচ্ছক মৃত্তিকা-সাপ'ও বলা হয়।

পটপুচ্ছকের ৭টি গণ এবং ৪৪টি প্রজাতি আছে। ৩৫টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়। প্রধান গণটি হ'ল পট্টপুচ্ছক (পট্টপুচ্ছকম্); অর্ধেক প্রজাতি এই গণেরই অন্তর্ভুক্ত।

এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বৃত্তচিহ্নিত পট্টপুচ্ছক (পট্টপুচ্ছকম্ বৃত্ত-চিহ্নিতম্) দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি-আনামলাই পার্বত্য অঞ্চলের একটি সাধারণ সাপ। ৫৩ সেন্টিমীটর দীর্ঘ হয়। একবারে তিনটে থেকে পাঁচটা বাচ্চা দেয়।

নলক গোত্র

নলক সাপও (নলকাৎ) ভূনিম্নবাসী। দেহ বেলনাকার ও বলিষ্ঠ। ঘাড় তত স্পষ্ট নয়। মাথার খুলির বিভিন্ন অস্থি শক্ত ক'রে আটকানো। অবসারণী-ছিদ্রের ছ' পাশে নখরাকৃতি ছোট ছুটি উদ্গত দেহাংশ দেখা যায়; এ ছুটি সাপের পূর্বপুরুষদের পেছন পায়ের নিদর্শন। লেজ খুব ছোট। কোন কোন নলক ৯০ সেন্টিমীটর পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। নলকের ওপর ও নীচ—ছু' চোয়ালেই দাঁত আছে। মাটির ওপর আসতে না চাইলেও নলক জল বেশ পছন্দ করে, সহজেই জলে নামে।

মালয়েশিয়ার অধিবাসীরা নলককে ছুমুখো সাপ বলে। নলকের মুখ ও লেজ দেখতে প্রায় একরকম; সেজন্যে ছু' প্রান্তে ছুটি মুখ আছে ব'লে ভুল হয়।

নলকের প্রধান খাদ্য—বাণ-জাতীয় ছোট সরু মাছ আর ছোট সরু সাপ। পোকা-মাকড়ও খায়। নলক বাচ্চা দেয়।

নলক বিষহীন সাপ।

নলক ব্রহ্মদেশ, সিংহল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়।

ভারতে নলক পাওয়া যায় না।

নলক গোত্রে ৩টি গণ ও ১১টি প্রজাতি আছে। প্রধান গণটির নাম নলক (নলকম্)।

কোন কোন নলকের গায়ের রং বড় চমৎকার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রক্তপুচ্ছ নলকের (মণ্ডলম্ রক্তপুচ্ছম্) লেজের নীচের দিক্‌টা লাল বা নারঙ্গ রঙের হয়। মাটির ভেতর থেকে বের ক'রে ওপরে রাখলে ঐ সাপ লেজ বেঁকিয়ে সোজাভাবে তুলে ধরে—যাতে লেজের তলার লাল বা নারঙ্গ অংশটা স্পষ্ট দেখা যায়। তখন গায়ে হাত দিলে লেজ দিয়ে সাপটি আঘাত করে। মাটির ওপর সাপটি যে লেজ তুলে ধরে, তার মধ্যে ফিকির আছে। রঙিন লেজটি তুলে ধরাতে শত্রুর দৃষ্টি সেদিকে যায়, সাপটি তখন তাকে সহজেই কাবু করতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার অঙ্গুরি-নলকের (নলকম্ অঙ্গুরীয়াঙ্কিতম্) গায়ের রং অল্প লাল, তার ওপর আংটির মত কাল ডোরা—কোনটা সম্পূর্ণ, কোনটা বা অসম্পূর্ণ। এই সাপের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার প্রবাল সাপের (মনোহারকম্) রঙে মিল আছে। এই প্রবাল বিষধর সাপ। সুতরাং অঙ্গুরি-নলক যে তার রং গ্রহণ করেছে বোধ হয় আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে—শত্রু যাতে তাকেও বিষধর ব'লে ভুল করে।

বিচিত্রশল্কক গোত্র

বিচিত্রশল্কক গোত্রে (ভিন্নশল্ককাৎ) ২টি গণ এবং ২টি গণের ১টি ক'রে ২টি প্রজাতি আছে। এদের ফুসফুসের দুটি অংশই সক্রিয়।

বর্ণবিকাশী সাপই (ভিন্নশল্ককম্ চকমকম্) প্রধান সাপ। এই

সাপের আঁশ খুব চকচকে। পিঠ কফির বাদামী রঙের। পিঠের ওপর আলো পড়লে নানা রঙে চিত্রিত হয়ে ওঠে। দেখতে বেশ সুন্দর হয়। এজন্যে বর্ণবিকাশী নাম। লেজের তলার অংশে নানা রঙের ছোপ থাকে। বর্ণবিকাশীর বাচ্চাদের মাথা বা ঘাড় থাকে অল্প সাদা যা' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলে যায়।

বর্ণবিকাশী সাপও ভূনিম্নবাসী—শিকার ধরার সময় ছাড়া মাটির ওপর আসে না।

বর্ণবিকাশীর দেহ বেলনাকার; মাথা থেবড়া মত; ঘাড় থেকে মাথা স্পষ্ট নয়; মাথা বড় আঁশে ঢাকা; চোখ ছোট, তারা খাড়া উপবৃত্তাকার। দুই চোয়ালেই দাঁত আছে। লেজ খুব ছোট। অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ; অবপুচ্ছ বিভক্ত। দৈর্ঘ্যে ১ মীটর ৫ সেন্টিমীটর হয়।

ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্ণবিকাশী একটি সাধারণ সাপ।

বর্ণবিকাশী সাপ মুক্তস্থানে সাধারণতঃ বেরয় না। নিজেকে লুকিয়ে রেখে চলাই এ সাপের স্বভাব। রাত্রিচরও বটে। মানুষের বসতির কাছে, বাড়ির বাগানে বা ধানক্ষেতে এ সাপকে দেখা যায়। পাখি, তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণী, ছুছুঁর ও অন্য সাপ খেয়ে থাকে। বিরক্তি প্রকাশ করতে হলে এ সাপ লেজটা খুব জোরে নাড়ায়।

বর্ণবিকাশীকে 'বর্ণবিকাশী মৃত্তিকা-সাপ'ও বলে।

বিচিত্রশল্কক গোত্রের অপর গণটি হ'ল কোটরক (কোটরকম্); মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় এ সাপ পাওয়া যায়।

বিচিত্রশল্কক বিষহীন সাপ।

মহোরগ গোত্র

পৃথিবীর সব বড় ও মোটা সাপ মহোরগ গোত্রের (মহোরগাৎ) অন্তর্ভুক্ত। সাপের ফুসফুসের বাঁ অংশটি অপুষ্ট হয়—কখনও কখনও

আদৌ থাকে না ; মহোরগ সাপের কিন্তু ফুসফুসের দু' অংশই বেশ পুষ্ট। পিণ্ড উপগোত্র ছাড়া এই গোত্রের সব সাপের অবসারণী-ছিদ্রের দু' পাশে একটি ক'রে দুটি নখরাকৃতি উদ্গত দেহাংশ থাকে। এই উদ্গত অংশ সাপের পূর্বপুরুষের পেছন পায়ের নিদর্শন। পুরুষ সাপের এই উদ্গত অংশ স্ত্রী সাপের চেয়ে বড় হয়।

মহোরগের দেহ বেলনাকার। মাথা বেশ চওড়া। চোখ মাঝামাঝি আকারের ; তারা খাড়া। নাসারন্ধ্র সাধারণতঃ বেশ বড়—এবং মাথার ওপর দিকে থাকে। সেজন্যে জলে সাঁতার দেওয়ার অথবা অবস্থানের সময় শ্বাস নেওয়ার অসুবিধা হয় না। লেজ ছোট ; তবে লেজের শেষ অংশ পরিগ্রাহী অর্থাৎ লেজের গঠন এমন যাতে সহজেই গাছের ডালপালা ধরা যায়। অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ।

মহোরগ তাপগ্রাহী প্রাণীদের চেয়ে তাপমোচী প্রাণীদের খেতে ভালবাসে। এরা সাধারণতঃ শিকারকে জাপটিয়ে ধ'রে শ্বাস বন্ধ ক'রে মারে। মহোরগ গাছে বা জলের ধারে লুকিয়ে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। শিকার কাছে এলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জড়িয়ে ধরে। রাতে এরা শিকারে বেরয়।

পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সর্বত্র মহোরগ পাওয়া যায়।

মহোরগ ৩টি উপগোত্রে বিভক্ত : (ক) মহাকাল (খ) উপকাল (গ) পিণ্ড।

(ক) **মহাকাল উপগোত্র :** মহাকাল উপগোত্রের (মহাকালে) আর উপকাল উপগোত্রের সাপে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ কোন তফাত ধরা পড়ে না। কিন্তু দুটি বিষয়ে তাদের পার্থক্য লক্ষণীয়। উভয়ের মাথার খুলিতে বৈশিষ্ট্য আছে। মহাকাল সাপের ঊর্ধ্বাক্ষিকা অস্থি—অক্ষিকোটরের উপরিস্থ অস্থি আছে ; উপকাল সাপের এই অস্থি থাকে না। আর একটি পার্থক্য হ'ল, বড় আকারের মহাকাল ডিম পাড়ে ; কিন্তু উপকাল বাচ্চা দেয়।

শম্বুকখাদক সাপের মাথা পিণ্ডাকার, চওড়া আর ঘাড় সরু। চোখ বড়, তারা খাড়া। ভয় পাওয়ার মত দেখতে হলেও এ সাপ বিষহীন ও অক্ষতিকারক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শম্বুকখাদকের গায়ের রং বাদামী—তার ওপর কাল ছোপ।

শম্বুকখাদক প্রধানতঃ ঝোপে-ঝাড়ে বাস করে; বড় গাছেও ভালভাবে উঠতে পারে।

শম্বুকখাদক ভারত, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ সাপ নতুন গোলার্ধে বাস করে।

শম্বুকখাদক উপগোত্রের ৫টি গণ ও প্রায় ৬০টি প্রজাতি আছে। প্রধান গণ প্রস্থশীর্ষ (প্রস্থশীর্ষম্): এই গণের ৩২টি প্রজাতি আমেরিকায় পাওয়া যায়। পুরোতন গোলার্ধে ২টি গণ পাওয়া যায়—পরমুণ্ড (পরমুণ্ডম্) ও দীর্ঘশঙ্ক (দীর্ঘশকলি)। পরমুণ্ড গণে কম-বেশী ১৫টি প্রজাতি এবং দীর্ঘশঙ্ক গণে ১টি প্রজাতি আছে। পরমুণ্ড এবং দীর্ঘশঙ্ক গণের কোন কোন সাপের একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ত্যক্ত হলে এসব সাপ গাছ থেকে ভূমিতে প'ড়ে যায় এবং দেহটাকে কতকটা শক্ত ক'রে তোলে। তখন এ সাপকে শুকনো বাঁকানো গাছের একটা ডাল ব'লে ভুল হয়।

ভারতে দৃষ্ট গিরিবাসী শম্বুকখাদকের (পরমুণ্ডম্ গিরিবাসি) নাম উল্লেখ্য। আসাম ও পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলেই এ সাপ সীমাবদ্ধ। দৈর্ঘ্যে ৭৩ সেন্টিমীটর হয়।

(খ) **উপমাংসী উপগোত্র**: উপমাংসী সাপের (উপমাংসলে) পিঠ ও পেটের আঁশে দানা-দানা থাকে। এজন্যে একে উপমাংসী সাপ বা আঁচিল-সাপ বলা হয়। আঁশের এই গড়ন দেখে উপমাংসী সাপ সহজেই চেনা যায়। এ সাপ জলবাসী—নদীতে বাস করে।

উপমাংসী সাপের গায়ের চামড়া বেশ আলগা ; দেহের গড়ন বেশ বলিষ্ঠ। নাসারন্ধ্র মাথার ওপর দিকে ; কপাটিকা থাকে যাতে জলের তলায় চলাফেরার সময় ছিদ্র বন্ধ করতে পারে। ১ মীটর দীর্ঘ হয়।

সাধারণতঃ নদীর মোহনা ও লাগোয়া সমুদ্রে উপমাংসী সাপ চলা ফেরা করে ; নদীতেই বাস করে, তবে সমুদ্রে চ'লে যায়। উপমাংসী জলে থাকতে এমনই অভ্যস্ত যে ডাঙায় তারা বিসদৃশভাবে চলে ; দেখলে মনে হয় বড় আকারের পোকা চলেছে। এ সাপ মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। উপমাংসীর বাচ্চা হয়।

দক্ষিণ-ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়া-সলোমন দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে উপমাংসী পাওয়া যায়।

উপমাংসী উপগোত্রের ১টি গণ ও ২টি প্রজাতি আছে। প্রজাতি দুটির নাম—হস্তী-শুণ্ড সাপ (উপমাংসলম্ জাভীয়ম্) ও দানাদার-গাত্র সাপ (উপমাংসলম্ কণাকারম্)।

(গ) **ভিন্নচর্মক উপগোত্র :** ভিন্নচর্মক উপগোত্রের (ভিন্নচর্মকে) অন্তর্ভুক্ত সাপ ৫টি গণ ও ১০টি প্রজাতিতে বিভক্ত। ৯টি প্রজাতি জাপান-চীন-পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং অপর প্রজাতি শিথিল-ভিন্নচর্মক (ব্যতিক্রমকম্ শিথিলম্) মধ্য আমেরিকায় পাওয়া যায়। জাভীয় ভিন্নচর্মকের (ভিন্নচর্মকম্ জাভীয়ম্) গায়ের আঁশগুলো অদ্ভুত ধরনের। এরকম অনিয়মিত আঁশ সাপের ক্ষেত্রে বড় একটা দেখা যায় না। একটি প্রজাতি খাসীয় ভিন্নচর্মক (পুচ্ছালুলিতম্ খাসীয়ম্) আসামে পাওয়া যায় ; দৈর্ঘ্যে ৬৭ সেন্টিমীটর হয়।

(ঘ) **পন্নগ উপগোত্র :** পন্নগ উপগোত্রের (পন্নগে) অন্তর্ভুক্ত সব সাপের দু' চোয়ালের দাঁত বেশ পুষ্ট ; কোন কোন গণের সম্মুখের দাঁত বেশ বড়, কোন কোন গণের পেছনের দাঁত বেশ বড়। কোন কোন গণের আবার ওপর চোয়ালের শেষ দুই-তিনটি

দাঁত খাঁজকাটা থাকে……বিষগ্রন্থিও থাকে—যাদের বলা হয় পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। পন্নগ সকল প্রকার পরিবেশে—স্থলে, বৃক্ষে ও জলে বাস করে। সাধারণতঃ ডিম পাড়ে; তবে কোনটা কোনটা বাচ্চাও দেয়; দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, ইওরোপ ও আমেরিকায় পন্নগ পাওয়া যায়।

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পন্নগ উপগোত্রের প্রায় ৬০টি গণ পাওয়া যায়; আফ্রিকা-ইওরোপ অঞ্চলেও প্রায় অনুরূপ সংখ্যার গণ দেখা যায়; আমেরিকায় প্রায় ৩৮টি গণ পাওয়া যায়। সবসুদ্ধ প্রজাতি ৭ শত'র ওপর।

এই উপগোত্রের কুলক সাপের (কুলকম্) প্রধান রং সবুজ। এই গণে ৮টি প্রজাতি আছে। ভারতে (মণিপুর অঞ্চলে) একটি প্রজাতি—সিতওষ্ঠ কুলক (কুলকম্ সিতওষ্ঠম্) পাওয়া যায়; দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ সেন্টিমীটর। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, তাইওয়ান ও উত্তর আমেরিকায় কুলক পাওয়া যায়।

অপচিত সাপ (অপচিতম্) দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়। এই গণে ১০টি কি ১১টি প্রজাতি আছে। অপচিত ছোট অপজাত সাপ। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে ও পশ্চিম-পাকিস্তানে এ সাপ পাওয়া যায়।

বালিশিখ সাপ (বালিশিখম্) পশ্চিম-পাকিস্তান সমেত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই গণের ৪টি প্রজাতি আছে।

অঙ্গুরি-নারব্যাল (নারব্যালম্ অঙ্গুরীয়াঙ্কিতম্) উত্তর ইওরোপের সচরাচর দৃষ্ট সাপ। এ সাপ অনেকে একসঙ্গে একই জায়গায় ডিম পাড়ে; একবার এক জায়গায় তিন হাজারের বেশী ডিম পাড়তে দেখা যায়!

দণ্ডক (দণ্ডকম্) পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। এ সাপ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া যায়।

এই গণে ৭টি প্রজাতি আছে ; একটি প্রজাতি অঙ্গ-দণ্ডক (দণ্ডকম অঙ্গম্) পশ্চিম-পাকিস্তানে পাওয়া যায় ; এ সাপের দৈর্ঘ্য ৯৯ সেন্টিমীটর।

এই উপগোত্রের কয়েকটি গণ : দৃঢ়াঙ্গ (দৃঢ়াঙ্গম্), পন্নগ (পন্নগম্), উরগ (উরগম্), বৃকদন্তী (বৃকদন্তি); নারব্যাল (নারব্যালম্) উপফণী (উপফণি), কুব্জপৃষ্ঠ (কুব্জপৃষ্ঠম্), কুকরি (অপদন্তি), কৈলাসক (কৈলাসকম্), দর্ভময় (দর্ভময়ম্), এলাপত্রক (এলাপত্রকম্), মালাপিণ্ডক (মাল্যাপিণ্ডকম্), আপূরক (আপূরকম্), বেষ্টক (বেষ্টকম্), ভিন্নবেণী (ভিন্নবেণি), ক্ষেমক (ক্ষেমকম্), হেমাভ (হেমাভম্), বৈড়াল (বৈড়ালম্), ব্রঞ্জপৃষ্ঠ (ব্রঞ্জপৃষ্ঠম্), অর্ককর (অর্ককরম্), পিণ্ডারক (পিণ্ডারকম্), উন্নত-নাসা (উন্নসম্), শূকর-নাসা (বক্রনাসম্), বিবরক (বিবরকম্), রাজা সাপ (রাজকম্), অঙ্গুরিগ্রীব (অঙ্গুরিগ্রীবম্), বেত্রক (বেত্রকম্), ষাঁড়-সাপ (গর্জকম্), কাকোদর (কাকোদরম্), লেলিহান (লেলিহানম্), কুস্তোদর (কুস্তোদরম্)।

(৬) **নীরবাসী উপগোত্র :** নীরবাসী সাপ (নীরবাসিনি) স্বাদুজলে বাস করে। এদের কেউ কেউ সময়-সময় জলাশয় ছেড়ে মাঠের নালা-ডোবার অল্প জলে এসে আশ্রয় নেয়। এদের নাসারন্ধ্র মাথার ওপর দিকে। কপাটিকা আছে ; সাপ ইচ্ছা করলে তা' দিয়ে নাসারন্ধ্র বন্ধ করতে পারে। জম্ভিকা-দাঁতের শেষ দুটি—কখনও তিনটি দাঁত খাঁজ-কাটা এবং দাঁতগুলি সাধারণতঃ বড় হয়। সুতরাং সব নীরবাসী সাপই পশ্চাৎ-বিষদন্তী। এদের প্রধান খাদ্য মাছ—জলের তলায় গিয়েও মাছ ধরে। বাচ্চা দেয়।

নীরবাসী সাপ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়।

নীরবাসী উপগোত্রে ১০টি গণ ও কম-বেশী ৩০টি প্রজাতি

আছে। কর্দম্ গণই সবচেয়ে বড়: এই গণে প্রায় ১৮টি প্রজাতি আছে।

এই উপগোত্রের সবচেয়ে উল্লেখ্য প্রজাতি হ'ল পাখনাওয়ালা সাপ (সর্পকম্ পক্ষযুক্তম্)।

কয়েকটি গণের নাম: কুকুরমুখী (সারমেয়ম্), কর্দম (কর্দম্), নীরবাসী (নীরবাসি)।

(চ) অণ্ডখাদক উপগোত্র: অণ্ডখাদক উপগোত্রে (অণ্ডখাদকে) ২টি গণ এবং ২টি গণের এক একটি প্রজাতি আছে—অ্যাফ্রিকীয় অণ্ডখাদক (অণ্ডখাদকম্ আফ্রিকীয়ম্) ও ভারতীয় অণ্ডখাদক (কুটরম্ ভারতীয়ম্)।

ভুজঙ্গ গোত্র

ভুজঙ্গ গোত্রের (ভুজঙ্গাৎ) অন্তর্ভুক্ত সব সাপেরই ওপর চোয়ালের সম্মুখ দিকে বিষদাঁত আছে; এই বিষদাঁত নিশ্চল ও সর্বদা খাড়াভাবে থাকে। বিষদাঁতের পেছনে এক বা একাধিক নিরেট দাঁত সাধারণতঃ থাকে। এই গোত্রের বড় আকারের সাপগুলি মানুষের পক্ষে অত্যধিক বিপজ্জনক—মারাত্মক বিষধর। এদের বিষ প্রধানতঃ নার্ভের ওপর কাজ করে।

ভুজঙ্গ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত), অস্ট্রেলিয়া (নিউগিনি সমেত), অ্যাফ্রিকা ও আমেরিকায় পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ সাপই এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইওরোপে এই গোত্রের সাপ নেই। তবে দু' কোটি বছর আগে বর্তমান চক্রধর সাপের মত কোন প্রজাতি ইওরোপে ছিল; তার কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গেছে। সাধারণতঃ ডিম দেয়।

ভুজঙ্গ বেশ বড় গোত্র। সমস্ত স্থলচর বিষধর সাপের প্রায় অর্ধেক এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই গোত্রে কম-বেশী ৩০টি

গণ এবং কম-বেশী ১২৬টি প্রজাতি আছে। ভারতে রয়েছে ৩টি গণ ও ১৩টি প্রজাতি।

কয়েকটি গণের নাম : নাগ (নাগম্), করেত (কিরাতম্), প্রবাল (প্রব্যালম্), উপনাগ (উপনাগম্), পরনাগ (পরনাগম্), আমেরিকীয় প্রবাল (মনোহারকম্), ম্যাম্বা (বিটপম্), বিনাগ (বিনাগম্), বৃত্তক (বৃত্তকম্), ক্ষিপ্রক (ক্ষিপ্রকম্), জালক (জালকম্), ক্ষুপ (ক্ষুপম্), অম্বুজ (অম্বুজম্), রজ্জু (রজ্জু), দীর্ঘগ্রন্থি (দীর্ঘগ্রন্থি), ভুজঙ্গ (ভুজঙ্গম্)।

বোড়া গোত্র

ভুজঙ্গ গোত্রের সাপের মত বোড়া গোত্রেরও (বোড়াৎ) সব সাপের ওপর চোয়ালের সম্মুখ দিকে বিষদাঁত থাকে। তবে এই বিষদাঁত সর্বদা খাড়াভাবে থাকে না ; মুখের তালুতে আধ-শোয়া থাকে—ব্যবহারের সময় খাড়া হয়। এই বিষদাঁতের পেছনে কোন নিরেট দাঁত থাকে না। এদের বিষ প্রধানতঃ রক্তের ওপর কাজ করে। এশিয়া, ইওরোপ, অ্যাফ্রিকা ও আমেরিকায় বোড়া সাপ পাওয়া যায় ; অস্ট্রেলিয়াতে বোড়া সাপ নেই। সাধারণতঃ বাচ্চা দেয়।

বোড়ার দেহে বৈশিষ্ট্য আছে। ভুজঙ্গের দেহ বেলনাকার, ঘাড় থেকে মাথা পৃথক্ নয়। বোড়ার দেহ মোটাসোটা ; মাথা চওড়া চেপটা—কতকটা ত্রিকোণাকার ; ঘাড় সুস্পষ্ট।

বোড়া দুটি উপগোত্রে বিভক্ত : (ক) বিবরহীন বোড়া ও (খ) সবিবর বোড়া। কোন কোন সাপের মুখাবয়ব বিবরের কথা বলেছি। যেসব বোড়ার মুখাবয়ব বিবর থাকে না তাদের বলে বিবরহীন বোড়া ; আর যাদের মুখাবয়ব বিবর থাকে, তাদের বলে সবিবর বোড়া।

(ক) **বিবরহীন বোড়া উপগোত্র** : বিবরহীন বোড়া (বোড়ে)

এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ বিবরহীন বোড়া—বিশেষ ক'রে যেগুলি বড়, সেগুলি আফ্রিকা মহাদেশেই পাওয়া যায়।

দুটি লক্ষণ দেখে বিবরহীন বোড়াকে সহজেই চেনা যায়। বিবরহীন বোড়ার অঙ্কতল-আঁশ চওড়া—পেটের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত বিস্তৃত, আর মাথায় থাকে ছোট ছোট আঁশ। অন্য কোন স্থলচর সাপের এ দুটি লক্ষণ একত্রে নেই। অবশ্য ক্বচিৎ ব্যতিক্রম আছে।

বিবরহীন বোড়া গোত্রে ১০টি গণ এবং প্রায় ১৫০টি প্রজাতি রয়েছে; ভারতে পাওয়া যায় ৩টি গণ ও ৩টি প্রজাতি।

পাকিস্তানে ইরানীয় উপশৃঙ্গী বোড়া (উপশৃঙ্গি ইরানীয়ম্) ও দ্বি-উপশৃঙ্গী বোড়া (উপশৃঙ্গি দ্বি) পাওয়া যায়। প্রথমটির মাথায় একটি এবং দ্বিতীয়টির মাথায় দুটি আঁশের উদ্গত অংশ থাকে, শিঙের মত মনে হয়। পাকিস্তানের আর একটি বোড়ার নাম—অন্য-অকর্ণ (অকর্ণম্ অন্যম্)। ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ চীনে একক-বেলন বোড়া (বেলনম্ এককম্) পাওয়া যায়। এ সাপের বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্য বিবরহীন বোড়ার মত এ বোড়ার মাথার আঁশ ছোট নয়—বড়; তা' ছাড়া এর দেহও অন্য বোড়ার মত নয়—বেলনাকার যদিও মাথা দেহ থেকে স্পষ্ট। এ সাপ বোড়ার আদি অবস্থার একটি রূপ।

বিবরহীন বোড়ার কয়েকটি গণ—বোড়া (বোড্রম্), কর্কোটক (কর্কোটকম্). দংশক (দংশকম্), ভূনিম্নবাসী বোড়া (বিষদন্তি), রাত্রিচর বোড়া (নিশাচরম্), বৃক্ষবাসী বোড়া (বৃক্ষবাসি), বালু-বোড়া (সিকতাচরম্)।

(খ) সবিবর বোড়া উপগোত্র: এশিয়া ও আমেরিকাতে সবিবর বোড়া (সবিবরে) পাওয়া যায়। তবে আমেরিকাই সবিবর বোড়ার প্রধান বাসস্থান।

সিংহলী কুব্জনাসা বোড়া (পিঠরকম্ সিংহলীয়ম্) এই উপ-গোত্রের একটি ছোট সাপ। দৈর্ঘ্য ৩৮ সেন্টিমীটর হয়।

চীনের দক্ষিণাংশে তীক্ষ্ণ-নাসা বোড়া (পিঠরকম্ তীক্ষ্ণম্) ১ মীটর ৫০ সেন্টিমীটর দীর্ঘ হয়। মেক্সিকোয় একটি সবিবর বোড়া আছে—মেক্সিকীয় বোড়া (পিঠরকম্ দ্বিরেখম্)।

মালয়েশীয় বোড়া (পিঠরকম্ মালয়েশীয়ম্) দৈর্ঘ্য ৬৭ সেন্টিমীটর হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার সবুজ বোড়ার (ত্রিপত্রকম্ দ্বিবর্ণম্) রং সম্পূর্ণ সবুজ, পেট হলদে।

দক্ষিণ আমেরিকার উল্লম্ফক বোড়া (ত্রিপত্রকম্ উল্লম্ফকম্) বেশ বলিষ্ঠ সাপ। কদাচিৎ ৯০ সেন্টিমীটর লম্বা হয়। এ বৈশিষ্ট্য, আঘাত করার সময় এ সাপ লাফায়। সুবিধাজনক স্থানে থাকলে এ সাপ ৯০ সেন্টিমীটর পর্যন্ত লাফিয়ে যায়।

সবিবর বোড়া উপগোত্রের ৫টি গণ এবং প্রায় ১০০টি প্রজাতি আছে ; ভারতে আছে ২টি গণ এবং ১১টি প্রজাতি।

এই উপগোত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ঝুমঝুমি সাপ (সবিবরম্)। অপর গণের নাম— অপরাজিত (অপরাজিতম্), বামন ঝনঝনী সাপ (ঝনকম্)।

সামুদ্র-সাপ গোত্র

ভুজঙ্গ গোত্রের যেসব সাপ সমুদ্রে বাস করতে আরম্ভ করেছিল, তাদেরই বংশধর সামুদ্র-সাপ (সিন্ধুজাৎ)। ভুজঙ্গের মত এরাও সম্মুখ-বিষদন্তী সাপ এবং সেই বিষদাঁত সর্বদা খাড়াভাবে থাকে। বিষদাঁতের পেছনে সাধারণতঃ তিন-চারটি নিরেট দাঁতও থাকে। তবে সামুদ্র-সাপের দেহ-গঠনে পার্থক্য ঘটেছে। সামুদ্র-সাপের লেজ নৌকোর হালের মত দু' পাশে অনেকটা চেপটা। এতে সাঁতার কাটার সুবিধা হয়। এই লেজ দিয়ে সমুদ্রের

গাছ-গাছড়াও জড়িয়ে ধরতে পারে। ধড়েরও কম-বেশী পরিবর্তন ঘটেছে সাঁতার কাটার সুবিধার জন্যে। অধিকাংশ সামুদ্র-সাপের নাসারন্ধ্র মুখের ওপর দিকে থাকে; কপাটিকা লাগানো থাকায় জলের তলায় সাঁতার কাটার সময় নাসারন্ধ্র বন্ধ করতে পারে। সামুদ্র-সাপের ফুসফুস খুব বড় হয়। জলের তলায় একনাগাড়ে ঘণ্টা দুই থাকতে পারে। সামুদ্র-সাপ খুব ভালভাবে সাঁতার কাটতে পারে। জলে ভেসে থাকার সময় ত্যক্ত হলে সোজাসুজি ডুব দিয়ে জলের তলায় চ'লে যায়। কদাচিৎ তারা সমুদ্র-জলের ৭ মীটর গভীরতার বেশী যায়। সামুদ্র-সাপ কখনও কখনও জলের ওপর ভেসে রোদ পোহায়। গভীর সমুদ্রের চেয়ে তারা সাধারণতঃ তীরের দিকে থাকে। অবশ্য তীর থেকে দেড় হাজার কিলোমীটর দূরেও সামুদ্র-সাপ দেখা যায়।

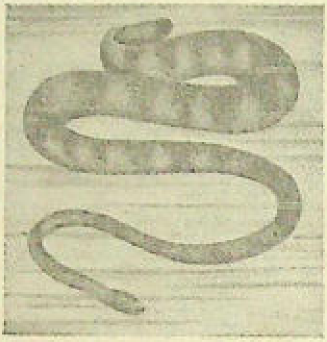

সামুদ্র-সাপ

অধিকাংশ সামুদ্র-সাপের গায়ের রং উজ্জল—আংটির আকারে নানা রঙে চিত্রিত। মাথা ছোট ও ছুঁচলো; চোখ ছোট, তারা গোল। গড়ে সামুদ্র-সাপের দৈর্ঘ্য ১মীটর ৫০ সেন্টিমীটর। নীলডোরীয় সামুদ্র-সাপের (সিন্ধুজম্ নীলডোরীয়ম্) দৈর্ঘ্য ২ মীটর ৪৫ সেন্টিমীটর। সামুদ্র-সাপ মাত্র মাছ খেয়েই জীবন ধারণ করে। প্রধানতঃ তারা বাণ-জাতীয় মাছ খায়। এসব মাছের কোনটা কোনটার গায়ে বড় কাঁটা থাকে। কিন্তু ঐ মাছ খেতে সামুদ্র-সাপের কোন অসুবিধা হয় না। ঐ মাছ গেলার পর কাঁটাগুলো সাপের দেহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে যায়।

প্রধানতঃ দক্ষিণ এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আশপাশের দ্বীপ-সমূহের উপকূলে সামুদ্র-সাপ পাওয়া যায়। বিস্তৃত-সামুদ্র-সাপ (হগরম্‌ বিস্তৃতম্‌) আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এবং আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পাওয়া যায়।

প্রশান্ত ও ভারতীয় মহাসাগরের উষ্ণ জলে সামুদ্র-সাপ পাওয়া যায়। অতলান্তিক মহাসাগরে কোন সামুদ্র-সাপ পাওয়া যায় না।

সামুদ্র-সাপ মারাত্মক বিষধর সাপ। এ সত্ত্বেও সামুদ্র-সাপের দংশনে মানুষ কদাচিৎ মারা যায়। এদের প্রকৃতি কেবল নিরীহ নয়—বিষদাঁত ছোট, মুখও খুব ছোট। সেজন্যে ঠিকমত দংশন করতে পারে না। জালে আটকে গেলে জেলেরা অনেক সময় হাত দিয়ে ধ'রে এ সাপ আবার জলে ফেলে দেয়। সামুদ্র-সাপের দংশন যন্ত্রণাদায়ক নয়; প্রধানতঃ পেশীর ওপর এর ক্রিয়া। তাদের শিকার মাছকে অবশ করতেই এই বিষ কাজে আসে।

সামুদ্র-সাপের একটা ভারী কৌতূহলজনক ব্যাপার আছে। কখনও কখনও শত কিলোমীটর দীর্ঘ ও তিন-চার মীটর প্রস্থ স্থান ব্যেপে লক্ষ লক্ষ সাপ পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে ভেসে থাকে। সমুদ্রগামী জাহাজের যাত্রীরা এ দৃশ্য অনেকে দেখেছেন। জাহাজ কাছে গেলেই এই স্তূপীকৃত সাপ জলের তলায় চ'লে যায়; জাহাজ চ'লে গেলে আবার তারা ভেসে ওঠে। সকাল ও সন্ধ্যায় সাধারণতঃ এ দৃশ্য দেখা যায়। এরূপে একত্র হওয়া বোধ হয় এদের প্রজন ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিস্ট।

কোন কোন পোকা-মাকড় রাতে আলো দেখলে সেখানে ছুটে আসে। সামুদ্র-সাপেরও এ প্রবণতা আছে। রাতে সমুদ্রের জলে আলো ফেললে ঐ আলো লক্ষ ক'রে সামুদ্র-সাপ সেখানে এসে উপস্থিত হয়।

সামুদ্র-সাপ গোত্র ছুটি উপগোত্রে বিভক্ত: (ক) সিন্ধু-সাপ

এবং (খ) কূলবর্তী-সাপ। প্রধানতঃ মালয়েশিয়া অঞ্চলে সিন্ধু-সাপ এবং অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে কূলবর্তী সাপ পাওয়া যায়।

(ক) **সিন্ধু-সাপ ঃ** সিন্ধু-সাপ (সিন্ধুজে) সম্পূর্ণরূপে জলে বাস করে। জলে তারা অবলীলায় চলাফেরা করে। অঙ্কতল-আঁশ ছোট বলে এরা ডাঙায় ভালভাবে চলতে পারে না। অনেক সময় ঢেউয়ের মুখে ডাঙায় এসে প'ড়ে থাকে। পশ্চিম-বঙ্গের দীঘার উপকূলেও এরকম সামুদ্র-সাপ প'ড়ে থাকতে দেখা যায়। সিন্ধু-সাপ বাচ্চা দেয়। বাচ্চা দেওয়ার আগে এরা অগভীর জল খুঁজে নেয়। এই উপগোত্রে ৭টি গণ ও কম-বেশী ৪২টি প্রজাতি আছে। উগ্রবিষ সামুদ্র-সাপের (বারীশ-সর্পম্ খরবিষম্) বিষ নাগ সাপের চেয়েও শক্তিশালী। স্বাদুজলবাসী সামুদ্র-সাপ (সিন্ধুজম্ অম্বুবাসি) সমুদ্রের সাপ হয়েও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লুজনে স্বাদুজলের হ্রদ টালে আটকে গিয়ে সেখানে বাস করছে। বিস্তৃত-সামুদ্র-সাপ এই উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) **কূলবর্তী সাপ ঃ** কূলবর্তী সাপ (কূলজে) তীর থেকে কখনও বেশী দূরে যায় না। কোন কোন প্রজাতি ডাঙায় এসেও চলাফেরা করে। কূলবর্তী সাপ ডিম দেয়—বোধ হয় সব প্রজাতিই ডিম দেয়। ডাঙাতে ডিম পাড়ে। এদের অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ।

এই উপগোত্রে ৩টি গণ এবং ১৩টি প্রজাতি আছে।

ভারতের সাপ

ভারতে ৩০০ প্রজাতির কিছু বেশী স্থলচর সাপ আছে। তাদের অধিকাংশ কম সময়ই দেখা যায়। স্থলচর বলতে সামুদ্র-সাপ ব্যতীত অন্যান্য সব সাপ বুঝছি।

এই ৩০০ প্রজাতির কম-বেশী ৪০টি মারাত্মক বিষধর সাপ অর্থাৎ এদের দংশনে মানুষেরও মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। মারাত্মক বিষধর সাপগুলি নাগ, করেত, বোড়া ও প্রবাল—এই চারটি গণের অন্তর্ভুক্ত। এরা সম্মুখ-বিষদন্তী সাপ।

আর আছে দৈত্যাকার ময়াল সাপ।

আর যেসব সাপ আছে, তাদের কোনটি কোনটি পশ্চাৎ-বিষদন্তী, অধিকাংশই বিষহীন। পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপকে কমজোরী বিষধর সাপ বলা যায়। এদের দংশনে মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না—মৃত্যু ঘটলেও কদাচিৎ হয়।

স্বীয় স্বীয় আকৃতি-প্রকৃতি অনুযায়ী পশ্চাৎ-বিষদন্তী ও বিষহীন সাপগুলিকে সাধারণভাবে এই কটি ভাগে ভাগ করা যায়: বৃক্ষবাসী সাপ, জলবাসী সাপ, কুব্জপৃষ্ঠ সাপ, ইঁদুরখেগো সাপ, বৃকদন্তী সাপ, কুকরি সাপ, মৃত্তিকা সাপ, ভূনিম্নবাসী সাপ ও অন্যান্য কয়েকটি সাপ।

নাগ গণ

সারা পৃথিবীতে নাগ গণের (নাগম্) অন্তর্ভুক্ত সর্বসুদ্ধ প্রায় ১২টি প্রজাতি রয়েছে। তাদের মধ্যে ভারতে রয়েছে ২টি প্রজাতি—(১) চক্রধর সাপ ও (২) শঙ্খচূড় সাপ।

নাগ সাপ মাত্রেরই ফণা থাকে। সাপের শিরদাঁড়ার দু' পাশে যে পঞ্জরাস্থি থাকে, নাগ সাপের বেলায় মাথার ঠিক পেছনে ঘাড়ের সেই অস্থিগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। নাগ সাপ ঘাড়ের পেশী সংকুচিত করলে এই অস্থিগুলি প্রসারিত হয়ে ফণার আকার ধারণ করে। নাগ সাপের এই ফণা বেশ স্পষ্ট। এই ফণা মাথার ওপর থাকে

না—মাথার ঠিক পেছন থেকে পিঠের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে থাকে। দেহের সামনের অংশ উঁচু ক'রে ফণা ধ'রে নাগ সাপ যখন দাঁড়ায়, তখন তাকে দেখে চিনতে আর ভুল হয় না। কোন কোন সাপ আছে যারা নাগের মত আড়াআড়িভাবে নয়—লম্বালম্বিভাবে ঘাড় খানিকটা বিস্তার করতে পারে। ঢেমনা সাপ এভাবে ঘাড় বিস্তার করে। কিন্তু একে ঠিক ফণা ধরা বলা চলে না। বাতাস টেনে শ্বাসনালী ফুলিয়ে এরকম করা হয়।

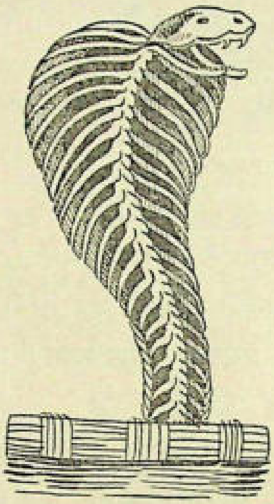

প্রসারিত ফণা

নাগের মাথা ও ঘাড় প্রায় সমান। চট্ ক'রে বোঝা যায় না কোন্ জায়গাটা ঘাড়। চোখের তারা গোল। নাগ মারাত্মক বিষধর সাপ।

নাগ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত), পশ্চিম এশিয়ার কোন কোন স্থানে ও অ্যাফ্রিকায় পাওয়া যায়।

চক্রধর সাপ

চক্র অর্থাৎ ফণা ধরতে পারে, তাই চক্রধর নাম (নাগম্ সামান্যম্)। চক্রধর সাপকে ফণী সাপও বলা হয়। সাপ-রাজ্যে চক্রধর সাপের স্থান খুব উঁচে। সাপ বললে যেন চক্রধরকেই বুঝায়। সেজন্যে এদের জাত-সাপও বলা হয়। জাত-সাপ অর্থাৎ প্রকৃত সাপ, সাধারণ বিষহীন সাপ নয়। সাপুড়েরা যে খেলা দেখায়, প্রধানতঃ এই চক্রধর সাপকে নিয়েই।

চক্রধর সাপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মীটর ৫০ সেন্টিমীটর হয়।

চক্রধর সাপের পিঠের রং প্রধানতঃ হলদেটে অথবা কাল।

অল্প বাদামী রঙেরও চক্রধর দেখা যায়। কোনটা-কোনটার রং পাঁশুটে। আরও বিচিত্র রঙের চক্রধর দেখা যায়। চক্রধরের গায়ের এই রং তার পরিবেশ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

চক্রধর কোন কারণে ভীত বা ত্যক্ত হ'লে দেহের সামনের কিছুটা অংশ উঁচু ক'রে ফণা মেলে জোরে হিসহিস বা ফোঁসফোঁস শব্দ করতে থাকে। ফোঁসফোঁসের সঙ্গে লম্বা চেরা জিবটা বের করতে থাকে, আর ঢোকাতে থাকে। সাধারণভাবে দেহের দৈর্ঘ্যের এক-তৃতীয়াংশ এরা উঁচু করতে পারে—চেষ্টা করলে এর চেয়ে বেশী উঁচু করতে পারে না, তা' নয়। চক্রধর ম'রে গেলে তার ফণা

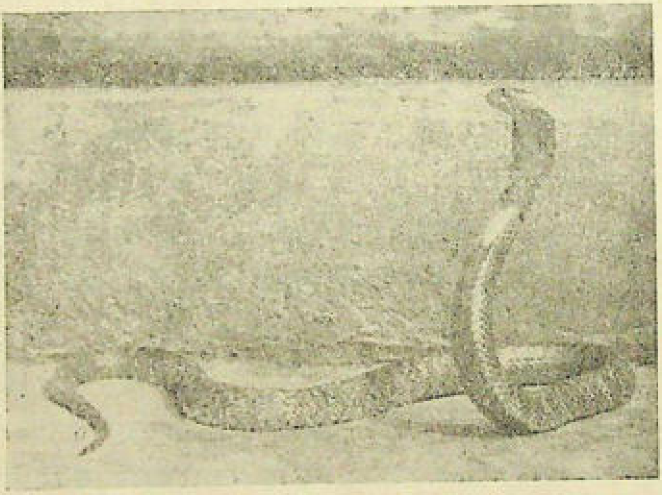

উন্নত-ফণা চক্রধর

আর বোঝা যায় না। তখন ঘাড় শক্ত হয়ে যায়, ঘাড়ের পেশী বিকল হয়ে পড়ে—টানাটানি ক'রেও ফণা খোলা যায় না। যেসব চক্রধরের ফণার ওপর চিহ্ন থাকে, ফণা ধরলেই তবে সে চিহ্ন দেখা যায়, নতুবা দেখা যায় না। ফণা ধরলে ঘাড়ের আঁশগুলি স'রে স'রে যায়; তাতেই চিহ্নটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, সব চক্রধরের মাথায় চিহ্ন থাকে না।

অনেকের ধারণা, বিষধর সাপমাত্রেরই বুঝি ফণা আছে। একথা ঠিক নয়; অনেক বিষধর সাপ আছে যাদের ফণা নেই।

চক্রধর যে ফণা ধ'রে ফোঁসফোঁস শব্দ করে, এ তার শ্বাস নেওয়ার ও শ্বাস ছাড়ার শব্দ। বাতাস যখন সে টেনে নেয়, তখন তার সমস্ত দেহ ফুলে ওঠে। আর বাতাস যখন ছেড়ে দেয়, তখন দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

চক্রধর সাপের প্রধান খাদ্য হ'ল ইঁদুর আর ব্যাং। পাখি ও তার ডিমও এ সাপ খায়। এ কারণে হাঁস ও মুরগির ঘরে তাদের ঢুকতে দেখা যায়। গাছেও উঠে ডিম আর পাখির বাচ্চা খায়। গিরগিটি, কাঠবিড়ালও বাদ পড়ে না। অন্য সাপের বাচ্চাও কখনও কখনও খেয়ে থাকে। অন্য সাপের মত চক্রধরও প্রচুর পরিমাণে জল খায়।

চক্রধর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। জঙ্গলে, ঝোপঝাড়ে, খোলা জায়গায়, লোক-বসতিতে চক্রধর বিচরণ করে। গাছে তো উঠতে পারেই—জলেও বেশ সাঁতার কাটতে পারে।

চক্রধর রাত্রিচর নয়; সাধারণতঃ দিনেই এ সাপ খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। লোকের বসতি বেশী হলে অবশ্য রাতেই শিকার খোঁজে। দিনের আলোতে এ সাপের লক্ষ্য মন্দ; রাতেই এ সাপ ভাল দেখতে পায়। বিকাল যখন প'ড়ে আসে, তখনই এ সাপের বিচরণের ঠিক সময়। চক্রধর সাধারণতঃ জোরে জোরে চলে।

ভারতে সর্বত্রই চক্রধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও চক্রধর সাপ পাওয়া যায়।

চক্রধর সাপের স্ত্রী-পুরুষের মিলন ঘটে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে। সাধারণতঃ মে মাসে স্ত্রী-সাপ ডিম প্রসব করে—সংখ্যায় দশটি থেকে কুড়িটি। চক্রধর সাপ ৪৫টি ডিম পেড়েছে, তারও নজির আছে। ডিমের রং সাদা, আকৃতি প্রায় হাঁস-মুরগীর ডিমের

মত—লম্বায় প্রায় ৫ সেন্টিমীটর। দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে ঐ ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এক একটি বাচ্চা ২৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ হয়। চক্রধরের বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ বিষদাঁত ও বিষগ্রন্থি নিয়েই জন্মায়। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। ধাড়ী চক্রধরের চেয়ে বাচ্চা চক্রধরই বেশী সক্রিয়—বিপজ্জনকও বটে।

সাপের সন্তান-প্রীতি খুব কমই দেখা যায়। চক্রধরের সন্তান-প্রীতির দৃষ্টান্ত আছে। মিলনের পর স্ত্রী-পুরুষ চক্রধরকে একসঙ্গে বাস করতে দেখা যায়। সাপ যারা ধরে তারা কোথাও একটা চক্রধর পেলে তার জোড়ারও খোঁজ নেয়। স্ত্রী-সাপ ডিম পাড়লে স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় সাপে ক্রমান্বয়ে সে ডিম পাহারা দেয়। বাচ্চা হওয়ার পর দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়।

একটি খাঁচায় দুটি চক্রধর—একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী—বহু দিন ধ'রে রাখা হয়েছিল। স্ত্রী সাপ ২২টি ডিম পাড়ে—মার্চ মাসে। স্ত্রী সাপটি যখন ডিম পাড়ছিল, তখনও পুরুষ সাপটি তার সঙ্গে জড়াজড়ি অবস্থায় ছিল। দেহের পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা ডিম পাড়ার ব্যাপারে পুরুষ সাপটি বোধ হয় স্ত্রী সাপটিকে সাহায্য করছিল। এ ঘটনায় আর একটি জিনিস লক্ষ করা যায়, পঞ্চম দিনে স্ত্রী সাপটি তার ডিমের কয়েকটি খেয়ে ফেলে।

একজোড়া বন্দী চক্রধর সাপ জানুয়ারি মাসে যৌন মিলনে রত হয়; একদিন পরে তাদের পুনরায় মিলন ঘটে। মার্চ মাসে স্ত্রী সাপটি ডিম পাড়ে, গর্ভ-ধারণের সময় ছিল ৬২ দিন।

আঁশের বৈশিষ্ট্য : চক্রধর সাপের আঁশের নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

চক্রধর তথা নাগ সাপ মাত্রেরই ওপর ঠোঁটের তৃতীয় আঁশটি

বড় এবং চোখ থেকে নাসা-পাত পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রবাল সাপেরও অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য আছে।

চক্রধর সাপের নিম্ন ঠোঁটের চতুর্থ ও পঞ্চম পাতের মধ্যে একটি ছোট পাত থাকে। কদাচিৎ কোন চক্রধর সাপের থাকে না—অধিকাংশ চক্রধর সাপেরই থাকে। এই পাতকে "কীলক-পাত" বলে।

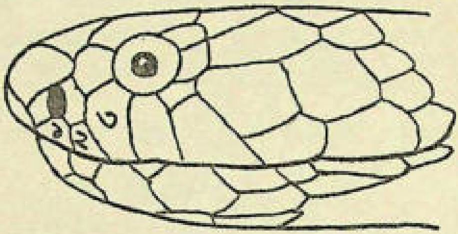

ওপর ঠোঁটের তৃতীয় আঁশ

চক্রধর সাপের অবপুচ্ছ-পাত দু' সারিতে বিভক্ত।

আঁশের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকলে চক্রধর সাপ ব'লে চেনা যায়।

চক্রধর সাপের আঁশের আর একটি বৈশিষ্ট্যও এ প্রসঙ্গে বলি। কোন সাপের ঘাড়ের পর পেটের ওপরে দুই বা তিন সারি কাল আঁশ থাকলে বুঝতে হবে সাপটি চক্রধর। সব চক্রধরের থাকে না; তবে থাকলে বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই চক্রধর সাপ।

দংশন ও বিষক্রিয়া

চক্রধর সাপের মুখের ওপরে জম্ভিকা-দাঁতের পরিবর্তে দু' পাশে একটি ক'রে দুটি সক্রিয় বিষদাঁত থাকে। এই বিষদাঁত খাতগর্ভ এবং সর্বদা খাড়াভাবে থাকে। বিষদাঁতের পেছনে একটি ক'রে ছোট দাঁতও থাকে—কোন কোন সাপের থাকে না।

চক্রধর সাপ কট্ ক'রে দংশন করে। দংশনের পরও চক্রধর সামান্য ক্ষণ দষ্টস্থানে মুখ লাগিয়ে রাখতে পারে বিষ ঠিকমত ঢালার উদ্দেশে। দিনের আলোয় লক্ষ্য মন্দ হওয়ায় দিনের বেলায় চক্রধর সাধারণতঃ ঠিক মত ছোবল দিতে পারে না—অনেক সময়

মুখ বন্ধ ক'রে ছোবল দেয়। রাতে কিন্তু খুব জোরের সঙ্গে ছোবল দেয় এবং কামড় দেওয়ার জন্যেই দংশন করে। বোড়ার তুলনায় বিষদাঁতের খাত তেমন সম্পূর্ণ না হওয়ায় চক্রধরের বিষ ক্ষতস্থান ছাড়াও তার আশপাশেও পড়তে পারে।

অনেকের ধারণা, চক্রধর ফণা ধ'রে মাথা তুলে না দাঁড়ালে দংশন করতে পারে না। এ কথা ঠিক নয়। যে কোন অবস্থা থেকে চক্রধর ছোবল দিতে পারে। তবে চক্রধর সাধারণতঃ মাথা তুলে ফণা মেলে ছোবল দেয়—এবং সেই ছোবল খুব জোরেই হয়। একটু কাত হয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে চক্রধর ছোবল দেয়; তাতে বিষ ঢালার পক্ষে সুবিধা হয়। উদ্যত-ফণা চক্রধর যে উচ্চতায় ফণা মেলে থাকে, তার চেয়ে সামান্য কিছু দূর পর্যন্ত সে দংশন করতে পারে।

চক্রধরের বিষ খুব উগ্র। ঠিকমত ছোবলে একজন লোক সাধারণতঃ দু' ঘণ্টা থেকে ছ' ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। ২০ মিনিটের মধ্যে মারা গেছে এমন নজির আছে। অপরপক্ষে ২৪ ঘণ্টার পর মারা গেছে তারও নজির আছে।

চক্রধর সাপের বিষগ্রন্থিতে যে পরিমাণ বিষ থাকে, গড়পড়তা তার ওজন ৩১৭ মিলিগ্রাম। এক ছোবলে চক্রধর কম-বেশী ২১১ মিলিগ্রাম বিষ ঢালে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃত্যু ঘটাতে চক্রধরের মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষই যথেষ্ট। সুতরাং একজন মানুষের প্রাণহানি ঘটানোর অন্যতম মারাত্মক মাত্রার ১৪ গুণ পর্যন্ত পরিমাণ বিষ চক্রধর এক ছোবলে মানুষের দেহে ঢালতে পারে। এ কথাই আর একভাবে বলা চলে, এক ছোবলে চক্রধর যে পরিমাণ বিষ মানুষের দেহে ঢালে তা' ১৪ জন মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট।

চক্রধরের বিষ প্রধানতঃ নার্ভের ওপর কাজ করে। দংশনের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার মত যন্ত্রণা শুরু হয়। কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে যে যন্ত্রণা হয়, এই যন্ত্রণার সঙ্গে তার

তুলনাই হয় না—এত তীব্র যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা কিছুক্ষণ থাকার পর ক্ষতস্থান অসাড় হয়ে যেতে পারে। দংশনের পরেই ক্ষতস্থান ফুলতে থাকে; যে অঙ্গে সাপ ছোবল দিয়েছে, ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত অঙ্গটা ফুলে ওঠে। লাল রঙের রস ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে—ক্ষতস্থানের মুখে জ'মে যায় না। ক্ষতস্থানের আশপাশের শিরা ও জালক ছিঁড়ে যাওয়ায় তাদের ভেতরকার রক্ত কলাতে জমা হয়। এজন্যে সে জায়গাটা কখনও কখনও বিবর্ণ (অর্থাৎ নীলাভ বা সবজেটে বা বেগুনে) দেখায়। বিষের পরিমাণ রোগীর দেহে যত বেশী পরিমাণে ঢোকে, এসব স্থানীয় লক্ষণ তত তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়।

রক্তের সঙ্গে সঙ্গে বিষ যত ছড়িয়ে পড়ে, রোগীর দেহে সাধারণ লক্ষণগুলি তত প্রকাশ পেতে থাকে। রোগী ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার দেহ অবশ হয়—দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যায়। সে আর দাঁড়াতে পারে না—শুয়ে পড়তে চায়। ঘাড়ের পেশী বিকল হয়ে পড়ায় মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, চোখের পাতা বুজে আসে—রোগীকে দেখলে মনে হয় সে নিদ্রাতুর হয়ে পড়েছে। রোগী কথা বলতে কষ্ট পায়, কিছু গিলতে গেলেও কষ্ট পায়। তার মুখ থেকে লালা পড়তে থাকে।

ক্রমে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। গা বমি-বমি করে—অনেক সময় বমিও হয়। কখনও কখনও দেহের কোন কোন অংশ থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য ব্যাহত হওয়ায় রোগী মারা যায়।

মৃত্যুর পূর্ব অবধি জ্ঞান থাকে; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিশেষ বিকল হয় না।

চক্রধর সাপের উপপ্রজাতি

চক্রধর প্রজাতির তিনটি উপপ্রজাতি আছে: (ক) গোখরো

(নাগম্‌ সামান্যম্‌ সামান্যম্‌), (খ) কেউটে (নাগম্‌ সামান্যম্‌ কৃষ্ণাদি) ও (গ) এড়োরেখা নাগ (নাগম্‌ সামান্যম্‌ রেখাদি)।

গোখরো, কেউটে ও এড়োরেখা নাগকে প্রকার না ব'লে উপপ্রজাতি বললাম। মাত্র রঙের পার্থক্য থাকলে প্রকার বলা হয়। কিন্তু এ তিনটি সাপের মাত্র রঙেরই নয়—ভূমিগত বাসস্থানেরও পার্থক্য আছে। এজন্যে এদের প্রকার না ব'লে উপপ্রজাতি বলা হয়।

অবশ্য এই তিন উপপ্রজাতি চক্রধরের বাসস্থান ও রং সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা কোন কথা বলা সহজ নয়। একই এলাকায় একাধিক উপপ্রজাতির সাপকে বিচরণ করতে দেখা যায়। উপরন্তু একই উপপ্রজাতি সাপের রং ও রঙের বিন্যাস নানা ধরনের। বাচ্চা থেকে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও রঙের পরিবর্তন হয়—সাধারণতঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চিহ্নাদি উঠে যেতে থাকে। তবে মোটামুটিভাবে এদের উপপ্রজাতিগত পার্থক্য এরূপ :

গোখরোর (গোক্ষুরার) প্রধান বাসস্থান ভারতের দক্ষিণাঞ্চল —সাধারণতঃ এর ফণায় চশমার মত চিহ্ন থাকে। কেউটের (কেউটিয়ার) প্রধান বাসস্থান ভারতের পূর্বাঞ্চল—সাধারণতঃ এর ফণায় গোল মত চিহ্ন থাকে। এড়োরেখা নাগের প্রধান বাসস্থান ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ; এর ফণায় এড়ো রেখার মত চিহ্ন থাকে অথবা কোন চিহ্নই থাকে না।

শৈশবাবস্থায় গোখরোর পিঠের সাধারণ রং হলদেটে অথবা অল্প বাদামী থেকে কাল ; সাধারণতঃ ফণার ওপর কাল ও সাদা রঙের বা কাল ও হলদে রঙের চশমার চিহ্ন থাকে ; ফণার নীচে দু' ধারে দুটি বড় কাল ফুটকি থাকে ; ঘাড়ের পর পেটের ওপরে দুটি বা তিনটি কাল চওড়া এড়ো ডোরা থাকে। পেটের অন্য অংশ সাধারণতঃ পিঠের রঙেরই মত—তবে মলিন। কাল বা কালচে রঙের গোখরো ভারতের পূর্বাঞ্চলে বেশ দেখতে পাওয়া যায়।

শৈশবাবস্থায় কেউটের পিঠের সাধারণ রং সবজেটে-হলদে অথবা অল্প বাদামী থেকে কাল; সাধারণতঃ ফণার ওপর হলদে বা নারঙ্গ রঙের গোল চিহ্ন থাকে; ফণার নীচে দু' ধারে দুটি বড় কাল ফুটকি থাকে; ঘাড়ের পর পেটের ওপরে একটি বা দুটি কাল চওড়া এড়ো ডোরা থাকে; পেটের অন্য অংশ সাধারণতঃ পিঠের রঙেরই মত—তবে মলিন। কেউটে জন্মের সময় সাধারণতঃ কাল থাকে; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাল রং ক্রমে ক্রমে অল্প বাদামী বা সবজেটে-হলদেটে পরিণত হয়।

শৈশবাবস্থায় এড়োরেখা নাগের পিঠের সাধারণ রং হালকা পাঁশুটে অথবা অল্প বাদামী; কোনটা-কোনটার পিঠের এই রং সর্বত্রই একইরকম থাকে, কোন-কোনটার পিঠের প্রধান রঙের ওপর প্রধানতঃ আঁশের জোড়মুখে মলিন রঙের জালের মত থাকে, কোনটা-কোনটার আবার প্রধান রঙের ওপর মলিন এড়ো রেখা বা < এই ধরনের রেখা থাকে; ফণার এড়ো রেখা দেহের রেখার চেয়ে বেশী কাল এবং দেহের তলাতেও বিস্তৃত হয়; পেট সাদাটে। পূর্ণবয়স্ক এড়োরেখা নাগের রং অল্প বাদামী বা কালচে—সাধারণতঃ তার ওপর স্পষ্ট কোন চিহ্নাদি থাকে না; পেটের রং পিঠের রঙের চেয়ে হালকা।

গড় দৈর্ঘ্যে এড়োরেখা নাগই সবচেয়ে বড়, তারপর গোখরো, তারপর কেউটে। ফণা এড়োরেখা নাগেরই সবচেয়ে ছোট।

আমাদের দেশে সাধারণ্যে দোরোখা নাগ নামে সাপের কথা শোনা যায়। এ সাপ কিন্তু কোন পৃথক্ ধরনের সাপ নয়। ওপরে যে তিনটি উপপ্রজাতির কথা বললাম, তাদের যে কোনও দুটির মিলনে যেসব বিচিত্র রঙের সাপ হয়, তারাই দোরোখা নাগ ব'লে পরিচিত।

গোখরো ও কেউটে

গোখরো ও কেউটে সাপের কথা বলেছি। এ দুটি সাপের আলোচনার আরও প্রয়োজন আছে।

গোখরোর ফণায় যে চশমার চিহ্নের কথা বলেছি, আমাদের দেশের সাধারণ লোক সেই চিহ্নকে গরুর পায়ের খুর-চিহ্ন ব'লে অভিহিত করে। আর কেউটের ফণার গোল চিহ্নকে বলে পদ্ম-চিহ্ন।

গরুর খুরের চিহ্ন—তাই গোক্ষুর বা গোখরো নাম। কেউ কেউ আবার ঐ চিহ্নকে শিবের খড়মের চিহ্ন ব'লে থাকে; কেউ বা বলে কৃষ্ণের পদ-চিহ্ন। গোখরোকে খড়িশ সাপও বলে। 'খরবিষ' কথাটা থেকে বোধ হয় খড়িশ এসেছে। কুলীন (পাবনা) নামেও এ সাপ পরিচিত; সাপেদের মধ্যে বংশ-গৌরবে বড়; তাই এই নাম। গোখরোকে তঁপ বা তম্পও (মেদিনীপুর) বলা হয়। গোখরোর আর একটি নাম গোমা (জলপাইগুড়ি, পশ্চিম-দিনাজপুর)। গোখরো সাধারণতঃ গম রঙের হয়ে থাকে; তাই গোমা (গহমা, গমুনা) নাম।

কেউটে সাপের নাম বোধ হয় এসেছে 'কৈবর্ত' শব্দ থেকে। কৈবর্তরা সাধারণতঃ কাল হয়ে থাকে; কেউটেও কাল। আর একভাবে এর অর্থ করা যায়। কৈবর্তদের পেশা মাছ ধরা; কেউটেও জলে নেমে মাছ ধরতে খুব পটু। 'কৃষ্ণ' শব্দ থেকেও কেউটে নাম আসতে পারে। কেউটে সাধারণতঃ কাল রঙের হয়ে থাকে; কৃষ্ণও কাল। কেউটের আর একটা নাম মা ছুয়া (পশ্চিম-দিনাজপুর, ময়মনসিংহ); মাছুয়ার অর্থ জেলে। এ সাপের আর একটি নাম ফানস বা পানক (ত্রিপুরা)। কেউটেকে আলাদও (মালদহ, পশ্চিম-দিনাজপুর, শ্রীহট্ট) বলা হয়; আলাদ 'অলগর্দ' শব্দ থেকে এসেছে।

গায়ের বিচিত্র রং হিসাবেও গোখরোর বহু নাম। অল্প কালর

ওপর খইয়ের মত সাদা ফুটকি—খয়ে গোখরো (খইজাতি) নাম। লাল আভা রঙের গোখরোকে বলে পদ্ম-গোখরো। চাঁপা রঙের

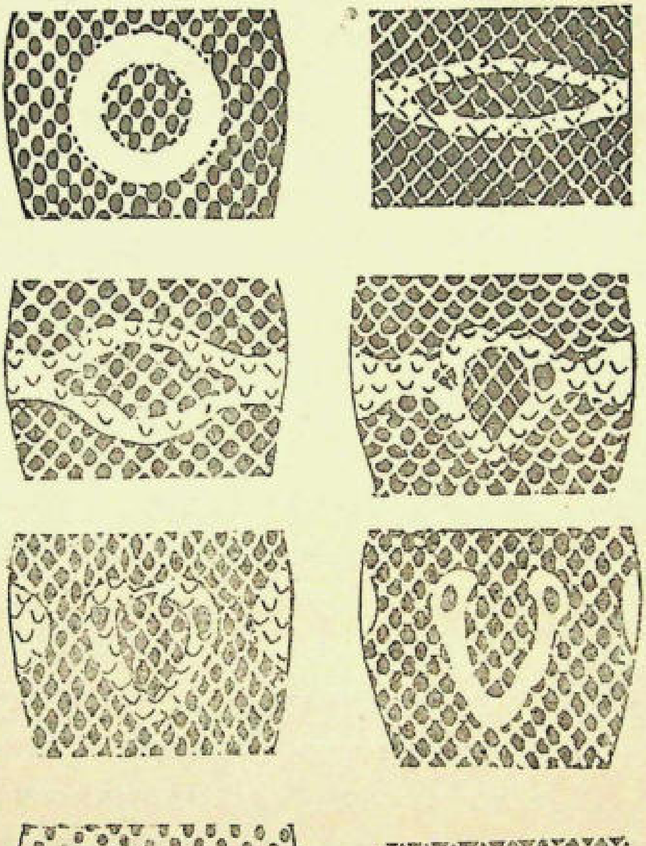

চক্রধরের ফণায় বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন

গোখরো চাঁপা গোখরো। তেঁতুল বিচির মত খয়ের রঙের গোখরোর নাম তেঁতুলে গোখরো ; তেঁতুলে গোখরোকে তামেশ্বরও (তামা

রঙের) বলা হয়। অল্প কাল রঙের গোখরো কালী গোখরো। অল্প সাদা রঙের গোখরো হ'ল দুধে গোখরো, দুধিয়া বা দুধরাজ; দুধে গোখরো কমই দেখা যায়; গাঁয়ের নিরক্ষর লোকে এ সাপকে মারে না। দুধে গোখরোকে তারা শুভ সাপ মনে করে; দুধে গোখরোকে কেউ মারলে তার সর্বনাশ হয়, এই তাদের বিশ্বাস।

গায়ের বিচিত্র রং হিসাবে কেউটেরও বহু নাম। কাল রঙের কেউটে কাল কেউটে; গেঁড়ি বা শামুক ভেঙে গেলে যেমন দেখতে হয় সেরকম কেউটের নাম গেঁড়িভাঙা বা শামুকভাঙা কেউটে; গেঁড়িভাঙা কেউটেকে সরষেফুলী কেউটেও (পশ্চিম-দিনাজপুর) বলে—কালোর ওপর সাদা সরষের ছিট, তাই এই নাম; মাকড়া (মেটে রঙের) কেউটে আর গেঁড়িভাঙা কেউটে বোধ হয় একই; খয়ের রঙের কেউটে তেঁতুলে কেউটে।

কারও কারও মুখে শুনেছি, কেউটে রাতে পুকুর পাড়ে গেঁড়ি ভেঙে খায়; তাই গেঁড়িভাঙা নাম। তাঁরা অবশ্য নিজের চোখে কেউটেকে গেঁড়ি ভাঙতে দেখেন নি; তবে রাতে কেউটে গেঁড়ি ভাঙে, তার শব্দ শোনা যায়। সকালে উঠে দেখা যায়, এধার-ওধার গেঁড়ির খোল প'ড়ে রয়েছে। আসলে কিন্তু বোধ হয়, কেউটের একাজ নয়; পুকুর পাড়ের গর্তে যেসব ধেড়ে ইঁদুর বাস করে, তাদের কাজ।

গোখরো ও কেউটের আচরণ লক্ষ করলে একটি বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। দেহের রঙে ও ভূমিগত বাসস্থানে এদের পার্থক্য তো আছে—প্রকৃতিতেও এদের পার্থক্য স্পষ্ট।

গোখরো ঃ কুলোপানা চক্র! কুলোর মত না হলেও গোখরোর ফণা কেউটের ফণার তুলনায় বেশ বড়ই হয়ে থাকে। কেউটের চেয়ে গোখরো লম্বাতেও বড় হয়। ভীত বা ত্যক্ত হলে গোখরো ফণা মেলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যখন ফোঁসফোঁস

শব্দ করতে থাকে, তখন তাকে দেখলে লাগে ভয়! কেমন একটা আকর্ষণও যেন বোধ হয়। অবশ্য ভয়ই লাগে বেশী।

ভাঙা বাড়ি, ইটের পাঁজা, উইয়ের ঢিপি—এসব শুকনো জায়গায় গোখরো বাস করে। মানুষের বাসস্থানেও এ সাপ বাসা বাঁধে। ইঁদুরের লোভে বাড়ির ভেতরও ঢুকতে দেখা যায়! কলকাতার মত শহরেও পুরোতন বাড়ি ও বস্তি অঞ্চলে গোখরোর কদাচিৎ দর্শন মেলে।

সামান্য কারণেই গোখরো মানুষকে দংশন করে না। মানুষ দেখলে সাধারণতঃ এ সাপ ফোঁসফোঁস ক'রে ফণা তোলে, বলে—কাছে এস না যেন! ভয় দেখায়, তারপর আস্তে আস্তে নিজের পথ ধ'রে চ'লে যায়। কোন মানুষ হঠাৎ গোখরোর সামনে গিয়ে পড়েছে। মানুষটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতে গোখরো তাকে আর কিছু বলে নি, এর বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এক ভদ্রলোক চলেছিলেন পল্লীর পথ ধ'রে। গরম কাল। সন্ধ্যা হয়-হয়। হঠাৎ তার কানে এল খসখস শব্দ…তার পেছনে পড়ে-থাকা শুকনো পাতার খসখস শব্দ। কিন্তু কেন শব্দ হচ্ছে? পেছন ফিরেছেন—সঙ্গে সঙ্গে একটা গোখরো কিছুদূরে সড়াৎ ক'রে মাথা তুলে ফণা মেলে দাঁড়িয়েছে! ভদ্রলোক ছিলেন বেশ সাহসী। তিনি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন, একটুও না ন'ড়ে সে জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। গোখরোটাও আর এগল না—সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ ফোঁসফোঁস ক'রে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। ভদ্রলোক তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

গাঁয়ে বড় মাটির পাত্রে মুড়ি, খই ইত্যাদির মোয়া রেখে মাচায় তুলে রেখে দেওয়া হয়। অনেকদিন ধ'রে এভাবে থাকে। প্রয়োজনমত নামিয়ে খাওয়া হয়। এক ভদ্রলোক তাঁর ছোট বেলাকার কাহিনী বলছিলেন। একদিন তিনি লুকিয়ে মাচায়

উঠে এরূপ একটি পাত্রে হাত ঢুকিয়েছিলেন মোয়া চুরি করতে। কিন্তু তাঁর হাত কেমন যেন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা একটা জিনিসে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতটা বার ক'রে নিলেন। মোয়া চুরির ভয় কাটিয়ে একথা তিনি তাঁর মাকে বললেন। মা পাত্রটা সাবধানে নামিয়ে দেখেন, তার মধ্যে একটা গোখরো সাপ শুয়ে আছে। গায়ে হাত লাগা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে সাপটা ভদ্রলোককে দংশন করে নি। ঠিক এ ধরনের ঘটনা আরও দু-চারজনের মুখে শুনেছি। কোনও বারে সাপটা সঙ্গে সঙ্গে দংশন করে নি।

কোন ভদ্রলোক রাতে তক্তপোষে শুয়েছিলেন। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ভদ্রলোকের মনে হ'ল কি যেন পায়ে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জোরে পাটা ছুঁড়ে দিলেন। জিনিসটা নীচে প'ড়ে গেল। লোক ডাকাতে আলোতে ভদ্রলোক দেখলেন, একটা গোখরো সাপ!

বাংলায় এখনও এমন অনেক পল্লী আছে রাতে যেখানে মশারি না খাটিয়ে শুয়ে থাকলে সর্প-দংশন সুনিশ্চিত। সেখানে অনেক সময় বাড়ির চালা থেকে মশারির ওপর গোখরো প'ড়ে চলাফেরা করে।

মাথা তুলে ফণা মেলে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে লক্ষ রাখার বৈশিষ্ট্যের জন্যে সাপুড়েরা খেলা দেখাতে কেউটের চেয়ে গোখরো সাপকেই বেশী পছন্দ করে।

কেউটেঃ ফোঁস কেউটে ফোঁস! এ সাপ সহজেই ত্যক্ত হয়। একটুতেই ফোঁসফোঁস করতে থাকে।

গোখরো শুকনো জায়গায় বাস করে। কেউটে ভিজা জায়গায় বাস করে। ক্ষেতে ও পুকুরের ধারে কেউটেকে দেখা যায়। ভেক খেতে এ সাপ ওস্তাদ। কখনও কখনও মাছ খেতে পুকুরেও নামে। পদ্মবনে লুকিয়ে থাকে।

গোখরোর মত কেউটে মানুষের বাসস্থানের কাছে বাস করে

না। কেউটে মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়। গোখরোর তুলনায় মানুষ দেখলে সহজেই এ সাপ ভীত বা ত্যক্ত হয়ে ওঠে। একেই বলি আমরা কেউটের রাগ। আসলে গোখরো মানুষের কাছে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সেজন্যে সে মানুষ দেখলেই বিচলিত হয় না। কিন্তু কেউটে মানুষের কাছে বাস করে না। মানুষ দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। সেজন্যে মানুষ দেখলেই সে বিচলিত হয়ে পড়ে—ভয়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ছোবলও দেয়।

গল্প শোনা যায়, কোন মানুষ হয়তো একটা কেউটেকে আঘাত করেছে। সাপটি ম'রে যায় নি—আহত হয়েছে মাত্র। বদরাগী আহত কেউটে তখন মানুষটির নাগাল না পেয়ে তার ছায়াতেই ছোবল মারে। এভাবেই তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। গল্পটির মধ্যে যে সত্য নেই, তা' নয়। তবে সাধারণ লোকে গল্পটির অর্থ যা' বোঝে, তা' ঠিক নয়। কেউটে ছায়াতে ছোবল মারে। কিন্তু ছায়া ভেবে নয়—মানুষ ভেবেই। ছায়া নড়তে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত কেউটে তাকেই তার আঘাতকারী মনে করে।

অনেকের ধারণা, গোখরোর চেয়ে কেউটের বিষ বেশী মারাত্মক। কথাটা ঠিক নয়। দুয়ের বিষ সমান উগ্র।

শঙ্খচূড়

শঙ্খচূড় সাপের রাজা। এরকম উগ্র আর ভয়ংকর সাপ আর নেই। শঙ্খচূড়ের চেয়ে বড় সাপ আছে। তারা বিষহীন। পৃথিবীতে যত বিষধর সাপ আছে, তাদের মধ্যে শঙ্খচূড়ই সবচেয়ে বড়। ৫ মীটর ৬০ সেন্টিমীটর পর্যন্ত লম্বা বড় শঙ্খচূড় সাপ পাওয়া গেছে—যদিও এর সাধারণ দৈর্ঘ্য ৩ মীটর ৫০ সেন্টিমীটর।

শঙ্খচূড় তেমন মোটা হয় না, বড় জোর ৭ সেন্টিমীটর হয়। কিন্তু কোন কোন শঙ্খচূড় বেশ মোটা হয়। ৪ মীটর ৭৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ একটি শঙ্খচূড়ের ওজন ছিল ১২ কিলোগ্রামের ওপর।

শৈশবাবস্থায় শঙ্খচূড়ের পিঠের রং ঘোর কাল—তার ওপর সাদা, হলদেটে বা হলদে রঙের এড়ো রেখা বা < এই ধরনের রেখা থাকে—চারটি রেখা থাকে মাথার ওপরে—একটি নাসাগ্রের ওপর, একটি চোখ দুটির সামনের দিকে, একটি চোখ দুটির পেছন দিকে এবং একটি মাথার পেছন দিকে; দেহের শেষ অংশে কাল রং আরও বেড়ে যায়—এমন কি সাদা রং মোটেই থাকতে না পারে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের চিহ্নাদি উঠে যেতে থাকে—মাথার ও ধড়ের গোড়ার অংশে সাধারণতঃ সব চিহ্ন উঠে যায়—তখন ঐ অংশ বাদামী বা সবজেটে-হলদে রঙের দেখতে হয়; ধড়ের শেষ অংশে চিহ্নাদি স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে রয়ে যায়; লেজ প্রায় সম্পূর্ণ কাল বা আঁশের ধার কাল-রং-সমন্বিত সবজেটে-হলদে হতে পারে। গলা অল্প হলদে বা ননী রঙের হয়। পেট সর্বত্রই একই রঙের হতে পারে অথবা নানা রঙের ছোপসমন্বিত হতে পারে অথবা এড়ো রেখা দ্বারা ভূষিত হতে পারে।

শঙ্খচূড়ের ফণা আছে। দেহের তুলনায় শঙ্খচূড়ের ফণা তত চওড়া নয়—কতকটা লম্বাটে ধরনের। ফণা কতকটা শাঁখের মত; তাই শঙ্খচূড় নাম।

শঙ্খচূড় খুব সাহসী সাপ। অন্য সাপের মত মানুষ দেখলে শঙ্খচূড় সাধারণতঃ দূরে স'রে যায়; কিন্তু বড় আকারের শঙ্খচূড় কখনও কখনও মানুষকে তেড়ে এসেছে, তার নজির আছে। চক্রধর সাপ যখন ফণা মেলে দাঁড়ায়, তখন সে মাথা এপাশ-ওপাশ নাড়তে থাকে। সব সময় তার ভয় শত্রু বুঝি এই তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু শঙ্খচূড় যখন ফণা তুলে দাঁড়ায়, তখন সে মোটে নড়ে না—সোজা একটা লাঠির মত নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবটা এই, আমার ওপর আক্রমণ চালাবে কার এত স্পর্ধা!

হিমালয় অঞ্চলে এক ভদ্রলোক পাখি সংগ্রহ করতে গিয়ে-

ছিলেন। খাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় পাহাড়ের গায়ে হাতের ভর রেখে দাঁড়াতে হয়েছিল। হঠাৎ তাঁর আঙুলে জীবন্ত কিসের স্পর্শ লাগায় তিনি মাথা উঁচু ক'রে দেখেন আড়াই মীটর আন্দাজ একটা শঙ্খচূড় তাঁর হাতের তলা দিয়ে যাচ্ছে! সাপটা ধীরে ধীরে চ'লে যায়। ঐ ভদ্রলোক অবশ্য একদম নড়েন নি।

উদ্যত-ফণা শঙ্খচূড়

কোন প্রাণী-বিদ্যাবিৎ ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে গিয়েছিলেন। নদীর ধার দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন. একটি ঢেমনা সাপ ঝোপে ঢুকছে। তিনি তখনই লেজ ধ'রে তাকে টেনে বের করলেন। তাঁর সহকারী যিনি ছিলেন, তিনি সাপটাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা ঢেমনা নয়—শঙ্খচূড়! সতর্ক ক'রে দিয়ে তিনি ঐ প্রাণী-বিদ্যাবিদের হাতে একটি কাস্তে দিলেন। প্রাণী-বিদ্যাবিৎ সেই কাস্তে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাপটা কেটে ফেললেন। শঙ্খচূড়টা লম্বায় সাড়ে তিন মীটরের কিছু বেশী ছিল।

শঙ্খচূড়টার লেজ ধরাতে সঙ্গে সঙ্গে ছোবল দেয় নি।

ভীত বা ত্যক্ত হলেই চক্রধর সাপ ফণা ধ'রে দাঁড়িয়ে ওঠে; অন্য সময় কদাচিৎ ফণা মেলায়। কিন্তু শঙ্খচূড় অনেক সময় কোনরূপ ভীত বা ত্যক্ত না হয়েও ফণা মেলে মাথা তুলে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। খোলা মাঠের মধ্যেও শঙ্খচূড়কে

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মনে হয়, এভাবে সে তার শিকার খোঁজে। ভোরের রোদেও শঙ্খচূড়কে এভাবে কখনও কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। গাঁয়ের নিরক্ষর লোকে বলে, শঙ্খচূড় সূর্যপ্রণাম করছে। আসলে বোধ হয় রোদ পোহায়। শরতের ভোরে একটি গোখরোকে ফণা মেলে পূর্বদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। সে অবশ্য চক্রধর সাপের স্বভাব অনুযায়ী মাথা এপাশ-ওপাশ করছিল—শঙ্খচূড়ের মত নিশ্চল ছিল না। যেমন উগ্র শঙ্খচূড়ের প্রকৃতি, তেমনি ক্ষিপ্র তার গতি।

অন্য সাপের তুলনায় শঙ্খচূড়ের বেশ বুদ্ধি আছে। কোন বন্দী শঙ্খচূড়ের খাঁচায় রক্ষিত পাত্রে গলা-সরু এক পাত্র দিয়ে বাইরে থেকে জল ঢেলে দেওয়া হ'ত। দু-চারদিন এরকম করার পর একদিন জল ঢালার সময় শঙ্খচূড় সাপটা নিজে থেকে লাফিয়ে ওঠে গলা-সরু পাত্রটার মুখে মুখ লাগিয়ে জল খেতে আরম্ভ ক'রে দিল! এরপর থেকে যখনই তাকে জল খেতে দেওয়া হ'ত, সে লাফিয়ে উঠে পাত্রটির সরু গলায় মুখ লাগিয়ে জল খেত।

শঙ্খচূড়ের খাদ্য বড় অদ্ভুত। অন্য প্রজাতির সাপ হ'ল এর প্রধান খাদ্য। সাপ পেলে অন্য প্রাণী আর খেতে চায় না। ঢেমনা সাপের মত বড় সাপও শঙ্খচূড় খেয়ে ফেলে; চক্রধর-করেতও বাদ পড়ে না—যদিও সাধারণতঃ বিষধর সাপ, বিশেষ ক'রে বোড়া সাপকে এড়িয়ে চলে। ময়াল সাপকেও শঙ্খচূড় আক্রমণ করেছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে—২ মীটর ৭৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ ময়ালকে গিলে খেয়েছেও। শঙ্খচূড় গোসাপ খায়।

বন্দী একটি শঙ্খচূড়কে একটি ঢেমনা খেতে দেওয়া হয়েছিল। শঙ্খচূড় ঢেমনাটার মুখ কামড়ে ধরেছিল। লক্ষ করলাম, শঙ্খচূড়ের মত বিষধর সাপের দংশনের তিন-চার মিনিট পরেও ঢেমনাটার

লেজ নড়ছিল—তখনও সাপটা মরে নি। ঢেমনাটাকে সম্পূর্ণ গিলতে শঙ্খচূড়টার প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেগেছিল।

শঙ্খচূড় গভীর স্যাঁতসেঁতে জঙ্গলে বাস করে। হোগলা বনে এ সাপকে বাস করতে দেখা যায়। থাইরাজ্যে এ সাপ খোলা জায়গাতেও চলাফেরা করে। পাহাড় ও তার আশপাশেও এ সাপ বাস করে। গাছের ওপরও শুয়ে থাকে। সহজেই গাছে উঠতে পারে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১ কিলোমীটার ৮ শত মীটার উঁচু স্থানেও শঙ্খচূড়কে দেখা গেছে। নদীর তীরেও দেখা যায়। জলেতেও প'ড়ে থাকে। লোক-বসতির কাছে এ সাপ থাকে না।

শঙ্খচূড় দিনে বিচরণ করে। শঙ্খচূড়ের প্রধান বাসস্থান হ'ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত)। ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ চীনেও শঙ্খচূড় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে শঙ্খচূড় খুব কমই দেখা যায়। সুন্দরবনে, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে, জলপাইগুড়ি ও চট্টগ্রাম জেলায় শঙ্খচূড় দেখা যায়। জলপাইগুড়ির চা-বাগান অঞ্চলে কখনও কখনও শঙ্খচূড়ের সাক্ষাৎ মেলে। এরূপ একটি স্থানে প্রায় ৪ মীটার দীর্ঘ একটি শঙ্খচূড়কে ধ'রে আলিপুর চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল।

হিমালয়ে, আসামের জঙ্গলে, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে, দক্ষিণ ভারতের পাহাড় ও বনাঞ্চলে শঙ্খচূড় বেশ পাওয়া যায়।

শঙ্খচূড় কুড়ি থেকে চল্লিশটি ডিম পাড়ে। স্ত্রী সাপ সে ডিম পাহারা দেয়; কখনও কখনও পুরুষ সাপকেও ডিম পাহারা দিতে দেখা যায়। এক একটি বাচ্চার দৈর্ঘ্য হয় ৫৩ সেন্টিমীটার।

চক্রধরের চেয়ে শঙ্খচূড়ের সন্তানপ্রীতি আরও বেশী। ডিম পাড়ার আগে শঙ্খচূড় বাসা তৈরি ক'রে নেয়। তাতেই ডিম পাড়ে। শঙ্খচূড়ের বাসা দেখলে মনে হয় শুকনো পাতার বা ফেলে-দেওয়া আনাজ-পাতির স্তূপ প'ড়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে

কিন্তু ঐ স্তূপের মধ্যে আসল বাসা থাকে। ঐ বাসায় থাকে আবার দুটি থাক। নীচের থাকে ডিম থাকে; আর ওপর থাকে স্ত্রী সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ডিম পাহারা দেয়। ওপর থাক থেকে নীচের থাক সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। কখনও কখনও স্ত্রী সাপ ও পুরুষ সাপ ক্রমান্বয়ে পাহারা দেয়—যতক্ষণ না ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

ব্রহ্মদেশের কোন বনে শঙ্খচূড়ের একটি বাসা দেখা গিয়েছিল। ওপর থেকে বাসাটি দেখে মনে হয়েছিল, স্তূপীকৃত শুকনো ও পচা পাতা। এই স্তূপীকৃত বাসার বেড় ছিল ১ মীটরের কিছু বেশী; আর উচ্চতা ছিল ৫০ সেন্টিমীটরের কিছু বেশী। এর মধ্যে আসল বাসাটি ছিল। কঞ্চি এবং অন্যান্য গাছের পাতা ও ডালপালা দিয়ে আসল বাসাটি তৈরী ছিল। আসল বাসাটি ছিল ঠাসা—এমনই ঠাসা যে আলতোভাবে দু' হাতে তুলে একস্থান থেকে আর একস্থানে রাখা যেত। এই আসল বাসাটির মাঝখানে ২০ সেন্টিমীটর বেড় ও তদনুরূপ গভীর বাটির আকারের একটি গর্ত ছিল। গর্তটির মধ্যে ছিল ২৭টি ডিম। ডিমগুলির লম্বা-চওড়ায় বেড় ছিল যথাক্রমে ৫৫ ও ২৭ মিলিমীটর। ডিমগুলি ঠাসাভাবে চাপা ছিল বাঁশ পাতা দিয়ে—তার ওপর সাপটি শুত। স্তূপীকৃত পাতার আড়ালে তার দেহ ঢাকা থাকত।

শঙ্খচূড় কিভাবে তার বাসা তৈরি করে, তা' অজানা ছিল। হাত নেই, পা নেই, অথচ বাসা তৈরি করে! কেমন ক'রে সম্ভব হয়? সম্প্রতি নিউইয়র্ক প্রাণী-উদ্যানে একটি স্ত্রী শঙ্খচূড়কে বাসা তৈরি করতে দেখা গিয়েছিল। শঙ্খচূড়টির দৈর্ঘ্য ৪ মীটরের কিছু বেশী ছিল। তার খাঁচায় বাসা তৈরির কঞ্চির টুকরো-আদি মালমসলা দেওয়া ছিল। শঙ্খচূড় তার দেহ দিয়ে সে মালমসলা ঠেলছিল, তারপর তার দেহটাকে টেনে নিয়ে ফাঁসের মত করছিল। এভাবে সে সব কঞ্চির টুকরো খাঁচার একটি কোণে

এনেছিল। মাথা একদিকে কাত ক'রে দেহটা পাশাপাশি সরিয়ে সে বালি জমিয়েছিল। তারপর দেহের ফাঁস তৈরি ক'রে সে বালি নিয়ে গিয়েছিল খাঁচার কোণে। কঞ্চির টুকরো বা বালি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সাপটার সমুখ অংশ যেন হুকের কাজ করেছিল। কখনও কখনও সাপটি দেহের শেষ অংশ দিয়ে পাতার কাঁড়ি বয়েই নিয়ে গিয়েছিল। মালমসলা যেমন নিয়ে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে সাপটা সেসব মালমসলার ওপর দেহ আন্দোলন ক'রে বাসার মত তৈরি করছিল। এভাবে সে দু' দিনে বাসাটি তৈরি করেছিল। বাসাটির বেড় হয়েছিল প্রায় এক মীটর, আর উচ্চতা ছিল প্রায় আধ মীটর। বাসা তৈরির দু' দিন বাদে সাপটি তাতে ডিম পেড়েছিল। ডিমগুলো পাতা ও কঞ্চির টুকরো দিয়ে ঢাকা দিয়ে সাপটা তার ওপর কুণ্ডলী-কৃত হয়ে শুয়েছিল। এভাবে সে নিয়মিতভাবে ডিমগুলি পাহারা দিত।

আঁশের বৈশিষ্ট্য ঃ শঙ্খচূড়ের ওপর ঠোঁটের তৃতীয় আঁশটি খুব বড় এবং চোখ থেকে নাসা-পাত পর্যন্ত বিস্তৃত। শঙ্খচূড়ের মাথায় মধ্য-ললাট-পাতের পেছনে দুটি বড় পশ্চাৎ-মস্তক-পাত থাকে; চক্রধর সাপের এরূপ কোন পাত থাকে না। চক্রধর সাপের মত নিম্ন ঠোঁটে কোন কীলক-পাত থাকে না। শঙ্খচূড়ের অবপুচ্ছ-আঁশ গোড়ার দিকে অখণ্ড, লেজের শেষের দিকে মাত্র বিভক্ত।

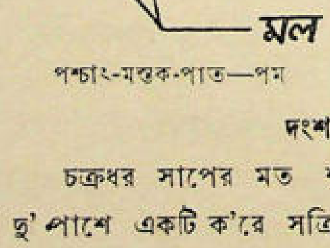

পশ্চাৎ-মস্তক-পাত—পম

দংশন ও বিষক্রিয়া

চক্রধর সাপের মত শঙ্খচূড়েরও জম্ভিকা-দাঁতের পরিবর্তে দু' পাশে একটি ক'রে সক্রিয় বিষদাঁত থাকে। এই বিষদাঁত খাতগর্ভ এবং সর্বদা নিশ্চল খাড়াভাবে থাকে। বিষদাঁতের পেছনে তিনটি ক'রে ছোট নিরেট দাঁতও থাকে।

শঙ্খচূড়ের বিষগ্রন্থিতে যে পরিমাণ বিষ থাকে, গড়পড়তা তার ওজন ৬৫০ মিলিগ্রাম। বলা বাহুল্য, এই পরিমাণ খুবই বেশী। মানুষকে শঙ্খচূড় দংশন করলে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই বেশী। হাতির মত বড় জানোয়ারও শঙ্খচূড়ের ছোবলে মারা যায়। হাতির গায়ের চামড়া বেশ শক্ত হলেও শুঁড়ের অগ্রভাগের এবং পা ও নখের সংযোগস্থলের চামড়া নরম। এসব জায়গায় শঙ্খচূড় ঠিকমত ছোবল দিতে পারলে হাতির পক্ষে বেঁচে ওঠা খুবই শক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে ভারী কাঠ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে ব্যবসায়ীরা অনেক সময় হাতি নিয়োগ করে। বনের পথ দিয়ে যাওয়ার সময় কোন কোন হাতিকে শঙ্খচূড়ের ছোবলে মারা যেতে হয়। একবার কোন ব্যবসায়ীর একটি হাতিকে শঙ্খচূড়ে ছোবল দেয়; হাতিটা তিন ঘণ্টার মধ্যে ম'রে যায়। চক্রধর সাপের ছোবলে হাতির প্রাণহানি ঘটে না—বড় জোর কিছু সময় বিষের জ্বালায় ছটফট করতে পারে।

শঙ্খচূড় একাধিকবার ছোবল দিতে পারে। চক্রধরের মত শঙ্খচূড়েরও বিষ প্রধানতঃ নার্ভের ওপর কাজ করে।

শঙ্খচূড় সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায়। এ সাপ নাকি লেজের ডগার ওপর ভর ক'রে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে দণ্ডায়মান ব্যক্তির মাথায় ছোবল দেয়—সে মানুষ যাতে আর কোনরকমে রক্ষা না পায়। 'শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা ?' কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। লেজের ডগার ওপর সোজা দাঁড়ান কোন সাপের পক্ষে সম্ভব নয়। আর শঙ্খচূড় যত উঁচুতেই ফণা তুলুক দণ্ডায়মান একটা লোকের মাথায় ছোবল মারা তার পক্ষে সহজ নয়। বড় একটা শঙ্খচূড় ১ মীটর ২৫ সেন্টিমীটর পর্যন্ত ফণা তুলে দাঁড়াতে পারে। এ উচ্চতাও অবশ্য বড় কম নয়। একটা বড় শঙ্খচূড় এভাবে যদি ফণা মেলে দাঁড়ায়, তখন তার সামনে যায় কার সাধ্যি! তবে খুব বড়

আকারের শঙ্খচূড় যা' কদাচিৎ দেখা যায়, এর চেয়েও উঁচুতে ফণা মেলতে পারে।

শঙ্খচূড়ের বহু নাম। সাপেদের রাজা, সেজন্যে শঙ্খচূড়কে নাগরাজ, আইরাজ (অহিরাজ), রাজসাপ, শঙ্খরাজ বলা হয়। রাজসাপ বলতে অবশ্য কেউ কেউ শাঁখামুটি সাপকে বুঝে থাকে। সাপদের রাজা আর পাহাড়ের আশপাশে থাকে ব'লে শঙ্খচূড়ের আর একটি নাম পাতরাজ। বড় নাগ, তাই নাম মহানাগ। বড় ফণীও বলে। ভীমরাজও বলে। গোখরোর জ্ঞাতি বড় ভাই, তাই রাজগোখরো। শঙ্খচূড় কালীনাগ (যশোহর) নামেও পরিচিত। ওড়িশায় পাওয়া যায় ব'লে শঙ্খচূড়ের আর একটি নাম কলিঙ্গ। শেষনাগ, অনন্ত নাগ ও বাসুকি নাগ নামেও এ সাপ পরিচিত।

করেত গণ

করেত গণের (কিরাতম্) অন্তর্ভুক্ত সর্বসুদ্ধ ১১টি প্রজাতি রয়েছে। ভারতে রয়েছে ৭টি। এই ৭টির দুটি প্রধান—(১) কালাচ ও (২) শাঁখামুটি। অন্যান্য করেত কমবেশী কালাচের মত ; কোন কোনটি কদাচিৎ দেখা যায়।

করেতের মাথা ও ঘাড় প্রায় সমান ; চোখের তারা গোল।

করেত সম্মুখ-বিষদন্তী সাপ। মারাত্মক বিষধর সাপও বটে। এই সাপের মুখের ওপরে জম্ভিকা-দাঁতের পরিবর্তে দু' পাশে একটি ক'রে দুটি সক্রিয় বিষদাঁত থাকে। এই বিষদাঁত খাতগর্ভ এবং সর্বদা নিশ্চল খাড়াভাবে থাকে। বিষদাঁতের পেছনে দুটি থেকে চারটি ক'রে ছোট নিরেট দাঁত থাকে।

করেত নিরীহ প্রকৃতির সাপ—ত্যক্ত না হলে সহজে দংশন করে না। করেত ডিম পাড়ে। করেত কমবেশী মুক্ত স্থানে বাস করে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১ কিলোমীটর ২৫০ মীটরের উচ্চে কদাচিৎ দেখা যায়।

ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, দক্ষিণ চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত) করেত পাওয়া যায়।

আঁশের বৈশিষ্ট্য ঃ করেতমাত্রেরই নিম্নলিখিত আঁশের বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

(১) দেহের আঁশ খুবই চিক্কণ ; (২) অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ; (৩) মাথা বড় আঁশে ঢাকা ; (৪) পৃষ্ঠ্য-আঁশ সুস্পষ্টভাবে বড় এবং কমবেশী ছকোনা ; মাত্র ছোট কৃষ্ণ করেতে এরূপ থাকে না ; (৫) নিম্ন ওষ্ঠের দুপাশে মাত্র চারটি ক'রে আঁশ থাকে ; (৬) অবপুচ্ছ-আঁশ সাধারণতঃ অখণ্ড—দু' সারিতে বিভক্ত নয়।

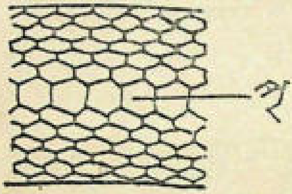

করেতের পৃষ্ঠ্য-আঁশ

করেত চেনার পক্ষে চতুর্থ ও ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট।

কালাচ

মানুষটা শুয়েছিল। সকালে দেখা গেল বিছানায় ম'রে আছে। কি হ'ল ? না সাপে কামড়েছে। কি সাপে কামড়েছে ? না কালাচ সাপে (কিরাতম্ সামান্যম্)।

সত্যি কালাচের বিষ চক্রধর সাপের চেয়েও উগ্র। তাই এর একটা নাম কালনাগ। কেউ বলে কালনাগিনী। ঘুমন্ত মানুষ এর দংশনে অনেক সময় ম'রে প'ড়ে থাকে। সাপ দংশন করল কখন, কখন বা মানুষটি ম'রে গেল, জানতেও পারা যায় না।

কালাচের পিঠের রং কাল বা নীলাভ-কাল ; প্রধান রঙের ওপর সাদা এড়ো রেখা থাকে—কখনও একটি ক'রে, কখনও বা একত্রে দুটি ক'রে থাকে—পেছনের অংশে এই রেখা বেশী স্পষ্ট—এই রেখা সামনের অংশে কখনও কখনও আদৌ থাকে না—শৈশবাবস্থায় দেহের ওপর এই রেখা একটানা পূর্ণ থাকে—

পূর্ণবয়স্কদের বেলায় যুক্ত ফুটকির সারি মনে হয়; প্রাগ্‌নেত্র অংশে সাধারণতঃ একটি সাদা দাগ থাকে; ওপর ঠোঁট সাদা; পেট সাদা।

কোন কোন কালাচ বাদামী রংয়ের হয়ে থাকে। মাঠে-ঘাটে কুণ্ডলী পাকিয়ে যখন শুয়ে থাকে, মনে হয় একতাল গোবর প'ড়ে আছে। বীরভূমে এ রঙের সাপকে গোদাচিতি বলে।

কালাচ দৈর্ঘ্যে ১ মীটর ২০ সেন্টিমীটর হয়। কখনও কখনও দেড় মীটরেরও ওপর হয়।

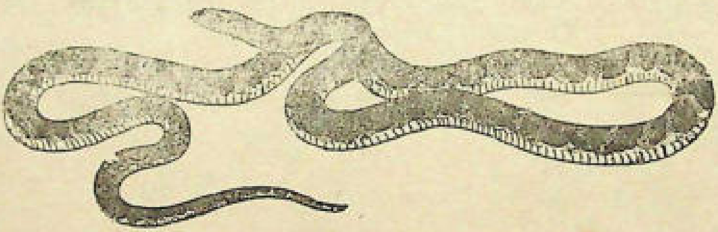

কালাচ

কালাচ ইঁদুর-ব্যাং তো খায়ই—অন্য সাপও খায়। বিষধর সাপও বাদ পড়ে না—তবে সাধারণতঃ পুঁয়ে-আদি ভূনিম্নবাসী সাপ খেয়ে থাকে।

কমবেশী মুক্ত স্থানে কালাচ বিচরণ করে। ক্ষেতের জমিতে অনেক সময় এ সাপ ঘোরাফেরা করে। লোক-বসতিতেও কালাচ বেশ দেখা যায়। বাগানে বারান্দায়—এমন কি ঘুমন্ত মানুষের বিছানায় কালাচকে দেখা যায়। মানুষটি সারারাত ঘুমিয়েছে; ভোরে উঠে দেখে ঠিক তার পাশেই একটি কালাচ শুয়ে আছে। গাঁয়ে এ ধরনের ঘটনার অভাব নেই। ঘুমন্ত অবস্থাতেও ভাগ্যক্রমে তার হাত-পা কালাচটির গায়ে লাগে নি। কালাচের গায়ে আঘাত লাগলে তার জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ত।

কালাচ রাত্রিচর। দিনে কদাচিৎ চলাফেরা করে। সন্ধ্যা নামলে এ সাপ শিকার ধরতে বেরয়। সাধারণতঃ স্ত্রী-পুরুষ—দুটি

কালাচ একত্রে ঘোরাফেরা করে—একসঙ্গে থাকেও। সুতরাং একটি কালাচ দেখলে অপরটির খোঁজ নেওয়া দরকার।

কালাচ ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। বিহার ও তার আশপাশে খুবই দেখা যায়। সিংহলেও কালাচ পাওয়া যায়—যদিও খুব কম।

স্ত্রী কালাচ ছটি থেকে দশটি বা তার বেশী ডিম পাড়ে। মাটির গর্তে বা শুকনো পাতার তলায় এই ডিম লুকনো থাকে। কালাচকে কখনও কখনও ডিম পাহারা দিতে দেখা যায়। স্ত্রী কালাচ ডিম ঘিরে কুণ্ডলী অবস্থায় থাকে—মনে হয় তা দেয়। স্ত্রী কালাচ এপ্রিল ও মে মাসে ডিম পাড়ে এবং জুলাই মাসের মধ্যে সে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়।

ভাঙা ইট-পাটকেল ধুলো-মাটি সরাতে সরাতে দুই স্থানে দু' জোড়া কালাচ পাওয়া যায়। এক জোড়ার কাছে ১২টি, অপর জোড়ার কাছে ১৫টি ডিম পাওয়া যায়।

জন্মাবার সময় কালাচের বাচ্চা ২৮ সেন্টিমীটর দীর্ঘ থাকে। ডিসেম্বর মাসে ঠাণ্ডার সময়ও বন্দী একটি কালাচের বাচ্চাকে নিজের মনে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতে দেখেছিলাম। বাচ্চাটা কখনও কখনও প্রায় ১৫ সেন্টিমীটর উঁচুতে মাথা তুলে ধরছিল।

কোন ভদ্রলোক একদিন লক্ষ করলেন, একটি কালাচ সাপ বেশ ক'রে দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে তার মধ্যে মাথাটা লুকিয়ে আছে, আর তাঁর পোষা বিড়াল মাঝে মাঝে এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে কুণ্ডলীটা খোলার চেষ্টা করছে। সাপটা যেন মৃত, এমন ভান করছিল। সাপটাকে লাঠি দিয়ে মেরে ফেলা হয়। সাপটা লম্বায় ছিল ৬০ সেন্টিমীটর।

দংশন ও বিষক্রিয়া: কালাচের বিষ চক্রধর সাপের বহুগুণ বেশী উগ্র। একজন মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে কালাচের ১

মিলিগ্রাম বিষই যথেষ্ট। এক ছোবলে কালাচ সাধারণতঃ ৫ মিলিগ্রাম বিষ ঢালে।

চক্রধরের বিষের চেয়ে কালাচের বিষ বেশী উগ্র হলেও চক্রধরের দংশনে যত লোক মারা যায়, তার চেয়ে অনেক কম লোক মারা যায় কালাচের দংশনে। এর কারণ কি? কালাচের মুখ ছোট—বড় হাঁ ক'রে কাউকে যে ঠিকমত দংশন করবে, তা পারে না। কালাচের বিষগ্রন্থিও ছোট—সমান্ত দংশন ক'রে অনেকটা বিষ যে ঢেলে দেবে, তাও পারে না। সেজন্যে বিষ খুব উগ্র হলেও এর দংশনে লোকে অনেক সময় বেঁচেও ওঠে।

কালাচ নিরীহ প্রকৃতির সাপও বটে। সহজে কাউকে দংশন করে না। এর দংশনে একটা জিনিস প্রায়ই লক্ষ করা যায়। হয় এর ওপর পা তুলে দেওয়া হয়েছে, না হয় অন্য কোনভাবে তাকে জ্বালাতন করা হয়েছে। তাড়া দিলেও এ সাপ পালাতে চায় না। সেজন্যে কোথাও কোথাও গাঁয়ের লোকে একে বয়িরালাদ (বধিরালাদ) বলে। বধিরালাদ অর্থাৎ কালা সাপ। সব সাপই যে কালা সে খোঁজ অবশ্য তারা রাখে না।

চক্রধরের মত কালাচের বিষও প্রধানতঃ নার্ভের ওপর কাজ করে। দেহ ক্রমশঃ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। কালাচের ক্ষেত্রে উপরন্তু আর একটি লক্ষণ দেখা যায়—তলপেটে ভয়ংকর যন্ত্রণা হয়। দেহের ভেতর রক্তক্ষরণের জন্যে বোধ হয় এই যন্ত্রণা।

এক ভদ্রলোক রাতে বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। তলপেটে যন্ত্রণা হওয়ায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ভাবলেন, বুঝি বাহ্যের বেগ পেয়েছে। পায়খানায় গেলেন। মলের সঙ্গে রক্ত বেরল। কিছুক্ষণ বাদেই ভদ্রলোক মারা গেলেন। পরে তার বিছানায় পাওয়া গেল একটি কালাচ। ঐ সাপটিই তাঁকে দংশন করেছিল।

কালাচের দংশনে মানুষে সাধারণতঃ ৬ ঘন্টা থেকে ২৪ ঘণ্টার

মধ্যে মারা যায়। অবশ্য ৬ ঘণ্টার আগে অথবা কয়েক দিন পরেও মারা গেছে, এমন নজিরও আছে।

কালাচ সাপের সঙ্গে অনেক সময় ঘরচিতি সাপের গণ্ডগোল হয়ে যায়। ঘরচিতি বিষহীন সাপ, আর কালাচ মারাত্মক বিষধর সাপ। সুতরাং এদের পার্থক্য জেনে রাখা দরকার।

কালাচ ও ঘরচিতি প্রায় একই আকারের। দুটি সাপকেই বাড়ির মধ্যে বা আশপাশে দেখা যায়। দুটি সাপই রাত্রিচর।

কালাচ ও ঘরচিতি—উভয়েরই গায়ের ওপর সাদা এড়ো রেখা থাকে; তবে কালাচের সাদা এড়ো রেখা সাধারণতঃ মাথার কিছু দূর থেকে আরম্ভ হয়ে লেজের শেষ অংশ পর্যন্ত চ'লে যায়; অপরপক্ষে ঘরচিতির সাদা এড়ো রেখা সাধারণতঃ মাথার নিকট থেকে আরম্ভ হয়, কিন্তু লেজের শেষ অংশ পর্যন্ত যায় না। কালাচের প্রধান রং সাধারণতঃ কাল, কিন্তু ঘরচিতির প্রধান রং সাধারণতঃ বাদামী। কালাচ নিরীহ সাপ, কিন্তু ঘরচিতি ক্ষিপ্র সাপ।

যা' হ'ক, এসব হ'ল উপরি-উপরি পার্থক্য। এসব লক্ষণে সব সময় দুটি সাপকে সঠিকভাবে চেনা যায় না—কখনও কখনও ভুল হয়ে যায়। সুতরাং এ দুটি সাপের আঁশের পার্থক্য আমাদের জেনে রাখা দরকার।

কালাচের পৃষ্ঠ্য-আঁশ বড় ও ছকোনা; ঘরচিতির সেরকম নয়। কালাচের অবপুচ্ছ-আঁশ অখণ্ড, কিন্তু ঘরচিতির অবপুচ্ছ-আঁশ দু' সারিতে বিভক্ত।

গায়ের রং কাল, তাই কালাচ নাম। কালচিতিও বলে এ সাপকে। কালাচ শেয়রচাঁদা (শিখরচাঁদা, শিয়রচাঁদা) নামেও পরিচিত। কালাচের প্রাগ্‌নেত্র আঁশে সাধারণতঃ যে সাদা দাগ থাকে, তা' থেকেই বোধ হয় শেয়রচাঁদা নাম। শেয়রচাঁদা বলতে অনেকে চন্দ্রবোড়া বুঝে থাকে। কালাচের আর একটি নাম

কানড় বা কাঁদোড় (খুলনা, যশোহর)। কানড়ের অর্থ নীল পদ্ম। নীলাভ কাল হওয়ায় কালাচের নাম বোধ হয় কানড় হয়েছে। করেত (করাইত) কিরাত শব্দ থেকে এসেছে। কিরাত যেমন শরনিক্ষেপে তার শিকারকে হত্যা করে, এ সাপও বুঝি তার দংশনে মানুষকে সুনিশ্চিতভাবে যমের দুয়ারে পাঠায়। চিতি, বড় চিতি, চিতিবোড়া বা বিষাক্ত চিতা নামেও এ সাপের পরিচয় দেওয়া হয়। গড়াচ বলতে কালাচকেই বুঝয়। ফণা নেই—মাটিতে সর্বাঙ্গ লাগিয়ে চলে ব'লে এই নাম।

গায়ের রং কতকটা ধোঁয়ার মত। তাই এ সাপের নাম ধূমনা-চিতি (ধূমলাচিতি)। ডোমনাচিতি নামটা ধুমনাচিতি থেকে এসেছে। ডোমনাচিতি নিরীহ সাপ, অথচ দংশন করলে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। তাই একটা কথা প্রচলিত আছে: ছিল ডোমনা, হ'ল বামনা। নিরীহ ডোম ছিল, উগ্র বামুন হয়ে উঠল। আর একভাবে একথাটির চলন আছে: খেলে ডোমনা, ডাক বামনা। এর অর্থ মিথ্যা চিকিৎসা করতে যেও না; সৎকারের জন্যে বামুন ডাক।

শাঁখামুটি

শাঁখামুটি (কিরাতম্ বিশেষম্) বেশ বড় ও মোটা সাপ। বস্তুতঃ সকল করেত সাপের মধ্যে শাঁখামুটিই সবচেয়ে বড়—এবং বেশ বড়। শাঁখামুটি দৈর্ঘ্যে ১ মীটর ৮০ সেন্টিমীটর হয়; কোনটা কোনটা দু' মীটরের ওপরও হয়।

শাঁখামুটির রঙের বাহার ভারী সুন্দর। দেখলেই সাপটাকে চেনা যায়। গায়ের ওপর কাল (বা বেগুনে কাল) ও হলদে (বা হলদেটে) চওড়া ডোরা পর্যায়ক্রমে থাকে—ডোরাগুলোর প্রস্থ তিন-চার সেন্টিমীটর হয়ে থাকে। কোনটায় কোনটায় হলদে

ডোরার মধ্যস্থানে কাল ফুটকি-ফুটকি থাকে। একটি বড় কাল দাগ ঘাড়ের ওপর থেকে ছুঁচলো হয়ে মাথায় চোখের মধ্যস্থলে যায়—এই দাগের দু'ধার হলদে রঙের; মাথার অবশিষ্ট অংশ বাদামী—তার ওপর হলদে ছোপ।

শাখামুটির পৃষ্ঠ্য-আঁশ বেশ শির-করা। শাখামুটির লেজের বৈশিষ্ট্য আছে; লেজটা হঠাৎ ভোঁতা হয়ে শেষ হয়েছে—সাধারণতঃ লেজের শেষ অংশ থেবড়া হয়ে থাকে।

শাখামুটির হলদে রঙের ডোরাগুলি কতকটা ঢাকাই শাখার মত। তাই নাম শাখামুটি।

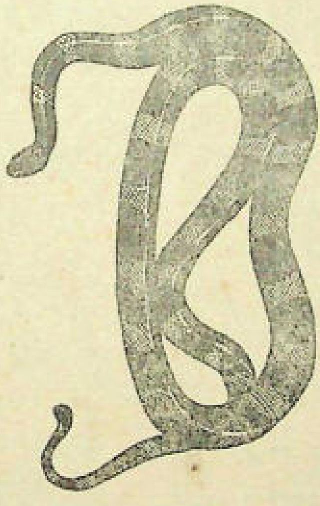

শাখামুটি

সাপ শাখামুটির প্রিয় খাদ্য। এ ছাড়া ইঁদুর-ব্যাং তো আছেই। একটি দেড় মীটর শাখামুটি একটি সওয়া মীটর জলঢোঁড়াকে গিলেছিল। শাখামুটি জল পছন্দ করে। তাই অনেক সময় নালা-ডোবার আশপাশে এ সাপকে ঘুরতে-ফিরতে দেখা যায়। শাখামুটি অলস প্রকৃতির। কিন্তু জলে নেমে যখন সাপ ধরে তখন খুব তৎপর হয়ে ওঠে।

ভারতের প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে শাখামুটি দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত) এবং দক্ষিণ চীনেও এ সাপ পাওয়া যায়। স্ত্রী শাখামুটি আটটি থেকে এগারটি ডিম পাড়ে। জন্মের সময় বাচ্চাদের দৈর্ঘ্য থাকে কমবেশী ৩৫ সেন্টিমীটর।

শাখামুটি এমনই নিরীহ যে লোকে ভাবে বুঝি বিষহীন সাপ। কদাচিৎ কাউকে দংশন করে। ধরলে কদাচিৎ পালাতে চেষ্টা করে।

লাঠি দিয়ে যদি ত্যক্ত করা যায়, তা' হলে দু' একবার দেহের জোর ঝাঁকুনি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথাটা তলায় লুকিয়ে ফেলে। গাঁয়ে শঙ্কাবতী নামে একটি সাপের নাম শোনা যায়। মনে হয়, শাঁখামুটির মুখ লুকনো অভ্যাস দেখে তাকেই শঙ্কাবতী বলা হয়। এমন ঘটনা দেখেছি, ছোট ছেলে না জেনে খেলাচ্ছলে শাঁখামুটিকে বারবার পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে; ঐ সাপ তাকে দংশন করে নি। কিন্তু শাঁখামুটির বিষ ভয়ংকর। শাঁখামুটি সাপের বিষ-লক্ষণ কালাচ সাপেরই মত।

বিষহীন এই ভ্রান্ত ধারণায় শাঁখামুটিকে অনেকে আমল দেয় না—বাড়ির আশপাশে থাকলেও। তার ওপর এ সাপ অন্য সাপ খায়। সুতরাং একে মারা উচিত নয়। কিন্তু এ ঠিক কথা নয়। শাঁখামুটির দংশনে মৃত্যুর ঘটনা আছে। একটি বলদকে শাঁখামুটিতে দংশন করেছিল; প্রায় ২০ মিনিটে সেটি মারা যায়।

শাঁখামুটিকে দুমুখো সাপ বলা হয়। আসলে কিন্তু এর দুটি মুখ নেই। শাঁখামুটির লেজের শেষ অংশ থেবড়া—সাধারণতঃ সাপের লেজ যেমন হয়ে থাকে তেমন নয়। পরন্তু অন্যান্য করেত সাপের মত শাঁখামুটিরও মাথা খুব ছোট। সেজন্যে হঠাৎ দেখলে কোন্‌টা মাথা আর কোন্‌টা লেজ ঠাওর করা যায় না। সেজন্যে অজ্ঞ লোকে ধারণা ক'রে নিয়েছে শাঁখামুটির বুঝি দুটি মুখ। সে ধারণা থেকেই দুমুখো সাপ নাম।

শাঁখামুটি বিষধর হয়েও কেন সহজে দংশন করে না, তার একটি মজার কৈফিয়ত আছে। কাউকে দংশন করতে হলে শাঁখামুটির দুটি মুখের মধ্যে ঝগড়া বাধে—কে দংশন করবে? ফলে কারুরই আর দংশন করা হয় না।

প্রচলিত সংস্কার আছে, শাঁখামুটির দেহের হাড়ের টুকরো মানুষের দেহে বেঁধে রাখলে বাত সারে—সাপেও দংশন করে না।

এ উদ্দেশে শাঁখামুটির হাড়ের টুকরো বেদেরা বিক্রি ক'রেও থাকে। এ ধারণার মধ্যে কিন্তু কোন সত্য নেই। শাঁখামুটি অতি অলস প্রকৃতির, অথচ একে বাতে ধরে না। নিশ্চয়ই এর হাড়ে এমন কিছু আছে যাতে বাত সারে। শাঁখামুটি সাপ খায়। সুতরাং যার গায়ে শাঁখামুটির হাড় বাঁধা আছে অন্য সাপ তার কাছে আসতে নিশ্চয়ই ভয় করবে। সুতরাং কোন সাপ দংশন করবে না। শাঁখামুটির হাড়ের ভেলকি ক্ষমতার পেছনে এ ধরনেরই মনস্তত্ত্ব লুকিয়ে আছে।

শাঁখামুটি সাপের চোখে মোহিনী শক্তি আছে ব'লেও জনসাধারণের বিশ্বাস। শাঁখামুটি হাঁ ক'রে মাটির ওপর প'ড়ে থাকে, আর অন্য সাপ সম্মোহিত হয়ে তার মুখের মধ্যে গিয়ে ঢোকে! বলা বাহুল্য, একথায় কোন সত্য নেই। শাঁখামুটি নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকতে পারে এবং অন্য কোন সাপ ঘুরতে-ফিরতে তার কাছে গিয়ে পড়তে পারে—শাঁখামুটিও কাছে পেয়ে তাকে কামড়ে ধ'রে গিলতে পারে। তবে শিকার যে শাঁখামুটির কাছে যায়, শাঁখামুটির মুখের মধ্যে ঢোকার জন্যে নয়—বরং অজানতেই শাঁখামুটির কাছে যায়। সাপের চোখের বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে স্মরণীয়। নিশ্চল কোন জিনিসের উপস্থিতি সে ভালভাবে দেখতে পায় না।

বাংলার পূর্বাংশে শাঁখামুটিকে বলা হয় শঙ্খিনী (শাঁখিনী, শাখনি, সানি)। শাঁখামুটিকে রাজসাপও বলা হয়। সাপেদের রাজা শঙ্খচূড়কে রাজসাপ বলা হয়। কিন্তু শাঁখামুটিকে রাজসাপ বলার কি কারণ থাকতে পারে? শাঁখামুটি উগ্র বিষধর সাপ, দৈর্ঘ্যেও খুব বড় হয়, অন্য সাপ এর খাদ্য, তার ওপর শিকার ধরতে ছুটোছুটি ক'রেও বেড়ায় না, এক জায়গাতেই প'ড়ে থাকে—সেজন্যেই বোধ হয় রাজসাপ বলা হয়। রানাসাপ (মেদিনীপুর) নামেও এ সাপ পরিচিত। ঘাটের উঁচু পাড়কে বলে রানা।

শাঁখামুটির গায়ের চওড়া ডোরাগুলো রানার মত দেখতে ব'লে এই নাম? না, শাঁখামুটিকে অনেক সময় রানার ওপর শুয়ে থাকতে দেখা যায় ব'লে এই নাম? শাঁখামুটিকে গোয়ালে সাপও (পশ্চিম-দিনাজপুর) বলে। কোথাও বলে পানিচিতা: জল পছন্দ করে, তাই এই নাম।

অন্যান্য করেত সাপ

পাথরে করেত: পাথরে করেতের (কিরাতম্ অন্তম্) পিঠের রং নীলাভ কাল—তার ওপর পরপর লাগোয়া ফুটকির সাদা এড়ো রেখা; ওপর ঠোঁট সাদা; মাথা ও ধড়ের তলার অংশ সাদা—মাত্র লেজের তলা বাদামী রঙের হালকা প্রলেপ দেওয়া; প্রাগ্‌নেত্র আঁশে কোন সাদা দাগ থাকে না।

দৈর্ঘ্যে ১ মীটর ৬৫ সেন্টিমীটর। বাংলা (মেদিনীপুর), ওড়িশা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ করেত: কৃষ্ণ করেতের (কিরাতম্ কৃষ্ণম্) পিঠের রং সর্বত্রই কাল বা নীলাভ কাল; পেট সাদা—দু' ধারে অস্পষ্ট কাল রঙের চিত্র-বিচিত্র করা। দৈর্ঘ্যে এ সাপ ১ মীটর ২০ সেন্টিমীটর পর্যন্ত হয়।

কৃষ্ণ করেত পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল, আসাম ও বাংলায় (দার্জিলিং) দেখা যায়।

ছোট কৃষ্ণ করেত: ছোট কৃষ্ণ করেতের (কিরাতম্ অসিতম্) পিঠের রং কৃষ্ণ করেতের মত; পৃষ্ঠ্য-আঁশ সামান্য বড়। দৈর্ঘ্য ১ মীটর।

ছোট কৃষ্ণ করেত কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। আসাম ও বাংলার উত্তরাংশে এ সাপের বাস।

কাঁকনবালা: কাঁকনবালা করেতের (কিরাতম্ এককম্)

পিঠের রং কাল বা খুব গাঢ় বাদামী—তার ওপর পরপর লাগোয়া ফুটকির সাদা বা হলদেটে এড়ো রেখা অথবা ঐ রঙের স্পষ্ট এড়ো রেখা; নাসাগ্র বরাবর একটি সাদা রেখা থাকে; দু' পাশে একটি ক'রে বক্র রেখা প্রাগ্‌ললাট আঁশ থেকে মুখের কোণ পর্যন্ত গেছে; চোখের পেছন থেকে ঠোঁট পর্যন্ত একটি ক'রে রেখা গেছে; বয়স হলে কোন কোন সাপের মাথায় এই চিহ্নগুলি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দৈর্ঘ্যে এ সাপ ১ মীটর ৪০ সেন্টিমীটর পর্যন্ত হয়।

কাকনবালা কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল, আসাম ও বাংলায় (দার্জিলিং) এ সাপের বাস। ব্রহ্মদেশেও পাওয়া যায়।

বহুপট্টিত করেত: বহুপট্টিত করেতের (কিরাতম্ পট্টিতম্) পিঠের রং কাল বা নীলাভ কাল—তার ওপর স্পষ্ট সাদা এড়ো ডোরা—কোনটায় কোনটায় সাদা ডোরার মধ্যস্থানে কাল ফুটকি-ফুটকি থাকে, মাথার রং গাঢ় বাদামী বা কাল; ওপর ঠোঁট সাদা, দেহের তলা সাদা—তবে লেজের তলা চিত্র-বিচিত্র এবং গাঢ় বাদামী রঙে চিহ্নিত।

দৈর্ঘ্যে এ সাপ ১ মীটর ১০ সেন্টিমীটর পর্যন্ত হয়।

বহুপট্টিত করেত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। চীন, তাইওয়ান এবং কদাচিৎ ব্রহ্মদেশেও পাওয়া যায়।

বোড়া গণ

বোড়া গণের (বোড্রম্) অন্তর্ভুক্ত সর্বশুদ্ধ ১০টি প্রজাতি আছে : ভারতে রয়েছে ২টি। এই দুটির নাম—(১) চন্দ্রবোড়া ও (২) কাশ্মীরী-বোড়া। বোড়া গণ বিবরহীন বোড়ার অন্তর্ভুক্ত।

এশিয়া, ইওরোপ, অ্যাফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বোড়া সাপ পাওয়া যায়।

চন্দ্রবোড়া

চন্দ্রবোড়া (বোড্রম্‌ চান্দ্রম্‌) অলস প্রকৃতির। চলাফেরা করে গদাইলশকরী চালে। কিন্তু শিকার ধরার বা কাউকে দংশনের ঠিক মুহূর্তে খুব ক্ষিপ্রতা প্রকাশ করে। চক্রধরের সে ক্ষিপ্রতা দেখা যায় না। কাউকে দংশন করতে চক্রধর যে সময় নেয়, চন্দ্রবোড়া তার অনেক কম সময় নেয়।

চন্দ্রবোড়া

চন্দ্রবোড়া দেখতে সুন্দর। পিঠের রং বাদামী বা মেটে-হলদে। প্রধান রঙের ওপর তিন সারি বড় চাকা-চাকা কাল দাগ—একটি

সারি থাকে পিঠের ঠিক ওপরে, অপর দুটি সারি থাকে দেহের দু' পাশে।

চাকা-চাকা কাল দাগের ধরন কতকটা এরকম: গায়ের প্রধান রং ঘিরে একটা হালকা বা সাদা রঙের বেড় থাকে; আর সেই সাদা বেড়টিকে ঘিরে থাকে কাল রঙের একটা মোটা বেড়; কখনও কখনও কাল বেড়ের মধ্যে দেহের প্রধান রং থাকে না—সমস্তটাই কাল হয়।

তেইশটি থেকে ত্রিশটি চাকা-চাকা দাগ থাকে। মাথার ওপর হালকা রঙের < এই চিহ্ন থাকে—ছুঁচলো মুখটা থাকে সামনের দিকে। পেটের রং সাদা—তার ওপর কোথাও কোথাও থাকে কাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফোঁটা। চন্দ্রবোড়ার মাথা ঘাড় থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক্; চোখ বড়, তারা খাড়া উপবৃত্তাকার; তারার চারপাশে থাকে সোনালী ফুটকি। লেজ ছোট; দেহ বেশ মোটা-সোটা; মাথাটা চেপটা ও কতকটা তেকোনা। ময়াল ছাড়া আর কোন ভারতীয় সাপ চন্দ্রবোড়ার মত মোটা নয়।

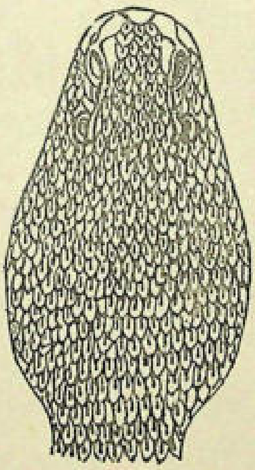

চন্দ্রবোড়ার মাথার আঁশ

বিবরহীন বোড়ার যেমন হয়ে থাকে, চন্দ্রবোড়ার মাথার আঁশ ছোট। অঙ্কতল-আঁশ বড়। অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত। চন্দ্রবোড়ার গায়ের রং ও চিহ্ন দেখে এ সাপকে বেশ চেনা যায়। ১ মীটর ৬০ সেন্টিমীটর দীর্ঘ হয়। একটি চন্দ্রবোড়ার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২ মীটর।

চন্দ্রবোড়া সাধারণতঃ খোলা জায়গায় বাস করে। ঘন বন-জঙ্গলে থাকে না। রোদওলা জায়গাই পছন্দ করে। দিনে চুপচাপ থাকে; ঘাসে বা অনুরূপ কোনস্থানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। সন্ধ্যা নামলে শিকারের সন্ধানে বেরয়। রাত্রিচর

সাপ। দিনের আলোতে কদাচিৎ চলাফেরা করতে দেখা যায়। ইঁদুরের খোঁজে গৃহস্থের বাড়িতেও ঢোকে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২ কিলোমীটর উচ্চেও এ সাপ দেখা যায়। চন্দ্রবোড়া গাছেও উঠতে পারে, জলেও সাঁতার কাটতে পারে—তবে নিতান্ত বাধ্য না হলে তা' করে না।

চন্দ্রবোড়া ইঁদুর-আদি স্তন্যপ খেতে ভালবাসে। তবে ব্যাং, গিরগিটি, পাখি বাদ পড়ে না। দুটি চন্দ্রবোড়াকে খাঁচায় রাখা হয়েছিল। প্রথম দু-তিন সপ্তাহ তারা কিছু খেত না; তারপর সহজেই সদ্য-নিহত ইঁদুর ও চড়ুই পাখি খেত। একটি চন্দ্রবোড়াকে মারতে দেখেছিলাম। তার পেট থেকে আস্ত একটা মরা ইঁদুর আর আস্ত একটা মরা ব্যাং বেরিয়ে পড়ে।

ভারতের প্রায় সর্বত্র—বিশেষ ক'রে পূর্বাংশে চন্দ্রবোড়া দেখা যায়। পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায়ও এ সাপ পাওয়া যায়।

চন্দ্রবোড়া বাচ্চা দেয়—একবারে কুড়ি থেকে তেষট্টিটি বাচ্চা দেয়। বাচ্চাগুলি সাধারণতঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেরয়—কখনও কখনও বা কতকগুলি থলের মধ্যে থাকে। জানুয়ারি নাগাদ স্ত্রী ও পুরুষ চন্দ্রবোড়ার মিলন ঘটে এবং জুন-জুলাই-এ বাচ্চা হয়। জন্মের সময় চন্দ্রবোড়ার বাচ্চার দৈর্ঘ্য কুড়ি সেন্টিমীটর থেকে আটাশ সেন্টিমীটর পর্যন্ত হয়। পূর্ণবয়স্ক চন্দ্রবোড়ার তুলনায় অল্পবয়স্ক চন্দ্রবোড়া অধিকতর সক্রিয়। চন্দ্রবোড়ার বাচ্চা ছোটবেলা থেকে খুবই বিষধর থাকে।

একটি চন্দ্রবোড়া উঁচু কার্নিস বয়ে যাচ্ছিল। কোন কারণে নীচে প'ড়ে যায়। আঘাতে তার পেট থেকে কয়েকটা বাচ্চা বের হয়ে পড়ে। বাচ্চাগুলো ও তাদের মা বেঁচেছিল। স্বভাবতঃই চন্দ্রবোড়াটা পূর্ণগর্ভা ছিল।

দংশন ও বিষক্রিয়া: চন্দ্রবোড়া মারাত্মক বিষধর সাপ। এ

সাপের ওপর চোয়ালে সম্মুখের দিকে বিষদাঁত থাকে। এই বিষদাঁত খাতগর্ভ এবং তালুর ওপর আধশোয়া অবস্থায় থাকে; দংশনের সময় খাড়া হয়। বিষদাঁতের পেছনে কোন নিরেট দাঁত থাকে না। চন্দ্রবোড়ার সক্রিয় বিষদাঁত বেশ বড়—দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় সেন্টিমীটর হয়।

দংশনের ব্যাপারে চন্দ্রবোড়ার খুব উৎসাহ নেই। কেউ কাছে এলে সাধারণতঃ খুব জোরে ফোঁসফোঁস করতে থাকে দেহ ফুলিয়ে। যেন বলে, সাবধান! আমি আছি এখানে। চন্দ্রবোড়ার ফুসফুস ও নাসারন্ধ্র বেশ বড়; সেজন্যে সে শব্দ বেশ জোরে হয়। সাড়ে সাত মীটর দূর থেকেও সে শব্দ শোনা যায়। ছুটে পালান চন্দ্রবোড়ার ধাতে নেই। যেখানে থাকে, শত্রুর উপস্থিতিতেও সেখানে রয়ে যায়। যদি আদৌ পিছু-পা হয়, ধীরে ধীরে গদাইলশকরী চালেই হয়।

কোন ভদ্রলোক পথে একটি প্রায় ৭৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ চন্দ্রবোড়া দেখতে পান। চন্দ্রবোড়াটা একটা পাঁচিলের গা ঘেঁষে এমনভাবে ছিল যাতে তাকে লাঠি দিয়ে ঠিকমত মারা যাচ্ছিল না। পাঁচিল থেকে যাতে সাপটা দূরে স'রে আসে, সেই উদ্দেশে তিনি তার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকতে লাগলেন। তখন সাপটা ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে ৩০।৩৫ সেন্টিমীটর আন্দাজ লাফিয়ে এল। ভদ্রলোকও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পা টেনে নিলেন। তখন সাপটা আবার আগের মত পাঁচিলের পাশে গিয়ে ধীরে ধীরে যেতে লাগল। অদূরেই ভাঙা পাথরের একটি ঢিবি ছিল। তার মধ্যে ঢুকে সে আশ্রয় নিল।

কোন তরুণ প্রাণী-বিজ্ঞাবিৎ ময়ালের বাচ্চা ভেবে একটি চন্দ্রবোড়া হাতে ধ'রে বাড়ি নিয়ে গেছলেন। চন্দ্রবোড়াটা তাঁর কুকুরকে দংশন করলে কুকুরটা ম'রে যায়। তখন তাঁর খেয়াল হয়, যাকে তিনি ময়ালের বাচ্চা ভেবেছিলেন আসলে সেটা মারাত্মক বিষধর চন্দ্রবোড়া!

খোলা জায়গায় পথের ওপর চন্দ্রবোড়া শুয়ে থাকে। মানুষ কাছে এলেও নড়ে না। সেজন্যে মানুষ অজানতে তার গায়ের ওপর পা দিয়ে দেয়। আর চন্দ্রবোড়া তাকে দংশন করে। সহজে কাউকে দংশন না করলেও দংশন করলে খুব জোরেই দংশন করে। চন্দ্রবোড়ার বিষদাঁত বড় হওয়ায় দংশনটাও তাই হয় খুব জোরাল। কখনও কখনও দংশন এত জোরে হয় যে সাপটা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে আটকানোই থাকে; সাপটাকে জোরে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়।

চন্দ্রবোড়া সরল গতিতে দংশন করে। কখনও কখনও লাফিয়ে গিয়েও দংশন করে। একটি চন্দ্রবোড়া লাফিয়ে একজনের হাঁটুতে দংশন করেছিল।

এক ভদ্রলোক একটি চন্দ্রবোড়াকে গুলি ক'রে আহত করে-ছিলেন। গুলিটা চন্দ্রবোড়ার দেহের পেছন অর্ধাংশে লেগেছিল। চন্দ্রবোড়াটা প্রায় ৯০ সেন্টিমীটর লম্বায় ছিল, আর তার দেহের বেড় ছিল ৮ সেন্টিমীটর। আহত চন্দ্রবোড়াটার কাছে গেলে তখনও সে লাফিয়ে দংশন করতে চেষ্টা করেছিল—প্রায় ৩০ সেন্টিমীটর দূরে লাফিয়ে এসেছিল।

চন্দ্রবোড়ার বিষ প্রধানতঃ রক্তের ওপর কাজ করে। এই বিষ রক্ত-সংবহন ব্যবস্থার ওপর কার্যকর হয়ে রক্তবাহ নালী প্রসারিত করে; তার ফলে রক্তক্ষরণ হয় অথবা ফুসফুস-ধমনীতে রক্ত-তঞ্চন ঘটে।

চন্দ্রবোড়ার বিষগ্রন্থিতে গড়পড়তা ১০৮ মিলিগ্রাম পরিমাণ বিষ থাকে। এক ছোবলে চন্দ্রবোড়া সাধারণতঃ ৭১ মিলিগ্রাম বিষ ঢালে। একজন মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে চন্দ্রবোড়ার ৪২ মিলিগ্রাম বিষই যথেষ্ট।

চন্দ্রবোড়ার দংশনে তীব্র যন্ত্রণা হয়। চক্রধরের দংশনের যন্ত্রণার তুলনায় এ যন্ত্রণা অধিকতর স্থায়ী। ক্ষতস্থান বেশ ফুলে

ওঠে এবং আশপাশের ত্বক্ বিবর্ণ হয়। ক্ষতস্থান থেকে পাতলা লাল রঙের রস গড়াতে থাকে—ক্ষতস্থানের মুখে রক্ত জ'মে যায় না। রক্তে বিষ মেশাতে হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ ক'মে যায়, ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে, বমন হয়। দেহের বিভিন্ন রন্ধ্রস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে, রক্তস্রাবে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। দৈহিক অবনমনে দেহ শীতল হয়, ঘাম বেরয়, রোগী জ্ঞান হারায়।

চন্দ্রবোড়ার দংশনে সাধারণতঃ দু' দিন থেকে চার দিনে মৃত্যু ঘটে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেও মৃত্যু হতে পারে। চার দিনেরও পরে মৃত্যু হতে পারে।

কয়েক দিনের মধ্যে মারা না গেলে পচা ক্ষতস্থান থেকে মরা মাস খ'সে পড়ে—চন্দ্রবোড়ার বিষ ক্ষতস্থানের আশপাশের কলা নষ্ট ক'রে দেয়। কখনও কখনও চন্দ্রবোড়ার বিষে নয়—চন্দ্রবোড়া কর্তৃক দষ্টস্থান প'চে বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায়ও লোকে মারা যায়।

চক্রধরের বিষের তুলনায় চন্দ্রবোড়ার বিষ তত উগ্র নয়। চক্রধরের বিষ চন্দ্রবোড়ার বিষের ৫ গুণ উগ্র।

গায়ের ওপর চাঁদের মত চাকা-চাকা দাগ থাকায় চন্দ্রবোড়া নাম। একই কারণে এ সাপকে চক্রবোড়াও বলে। লাল চন্দনের মত রং; সেজন্যে কেউ কেউ বলে চন্দনেবোড়া। উলুবনে বাস করে; সেজন্যে উলুবোড়া নাম। চন্দ্রবোড়া কর্তৃক দষ্টস্থান অনেক সময় প'চে যায়; সেজন্যে পচাবোড়া নাম। রক্তক্ষরণ হয় ব'লে রক্তছুটে নাম। গরুর মত নাসারন্ধ্র বড় ব'লে গোনস নাম। বোড়া বললে চন্দ্রবোড়াই বোঝয়।

কাশ্মীরী-বোড়া

কাশ্মীরী-বোড়ার (বোড্রম্ কাশ্মীরীয়ম্) পিঠের রং পাঁশুটে বা ম্লান বাদামী; প্রধান রঙের ওপর সারিবদ্ধ বাদামী ছোপ—

কখনও কখনও এই ছোপের ধার কাল হয়। পেট সাদা, তার ওপর বাদামী ফোঁটা। লেজের শেষ ভাগ হলদে।

দৈর্ঘ্যে ১ মীটর ৬০ সেন্টিমীটর পর্যন্ত হয়।

কাশ্মীরী-বোড়া ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে পাওয়া যায়। এশিয়ার পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে এবং উত্তর অ্যাফ্রিকায়ও পাওয়া যায়।

কর্কোটক গণ

কর্কোটক গণের (কর্কোটকম্) অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রজাতি রয়েছে : ভারতে পাওয়া যায় একটি—ফুরসা। কর্কোটক গণ বিবরহীন বোড়ার অন্তর্ভুক্ত।

ভারত, সিংহল, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর অ্যাফ্রিকায় কর্কোটক পাওয়া যায়।

ফুরসা

ফুরসা (কর্কোটকম্ বিবর্ণম্) ছোট সাপ। কদাচিৎ ৬০ সেন্টিমীটরের ওপর হয়। আকারে ছোট হলে কি হবে, খুব উগ্র প্রকৃতির। সামান্য কারণেই দংশন করতে উদ্যত হয়। ভীত বা ত্যক্ত হলে ৪ সংখ্যার আকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথাটা মাঝে রেখে ক্রমাগত গায়ে গা ঘষতে থাকে। এর পিঠের আঁশ এবড়ো-খেবড়ো। তাই গা ঘষায় জোরে খসখস শব্দ হয়। সাপটা মুখেও হিসহিস শব্দ করে।

গা ঘ'ষে খসখস শব্দ করে ব'লে এর নাম ফুরসা।

ফুরসার গায়ের রং বাদামী বা বালি রঙের—ঘোলাটে সবুজ রঙেরও হয়। পিঠের দু' পাশে থাকে একটি ক'রে দুটি আঁকাবাঁকা

অল্প সাদা রেখা। কোন কোনটার পিঠের মাঝ বরাবর ছোট বরফির মত সাদা ছক কাটা থাকে। চন্দ্রবোড়ার মত ফুরসারও মাথা চেপটা ও কতকটা তেকোনা। মাথার ওপর একটা সাদা চিহ্ন থাকে—অনেকটা পাখির পায়ের মত। কেউ কেউ এ চিহ্নকে বাণ মনে করে, কেউবা মনে করে ত্রিশূলের চিহ্ন। পেটের রং সাদাটে—কোনটায় কোনটায় তার ওপর বাদামী ফুটকি থাকে।

ফুরসা বালুময় শুকনো জায়গায় বাস করতে ভালবাসে। ঘন গাছপালা বা জঙ্গলে সাধারণতঃ থাকে না। সূর্য-কিরণের তীব্রতা এ সাপ বেশ সহ্য করতে পারে। খুব গরমের সময়ও বালির ওপর এ সাপকে প'ড়ে থাকতে দেখা যায়; সূর্য-কিরণে তপ্ত পাথরের তলায়ও এ সাপ স্বচ্ছন্দে থাকে। ফুরসা সাধারণতঃ দিনে দেখা যায়। নেংটি ইঁদুর প্রধান খাদ্য। সমতলভূমিতে বাস করলেও সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১ কিলোমীটর ৮০০ মীটর উঁচুতেও এ সাপ দেখা যায়। গাছে ফুরসা কদাচিৎ ওঠে।

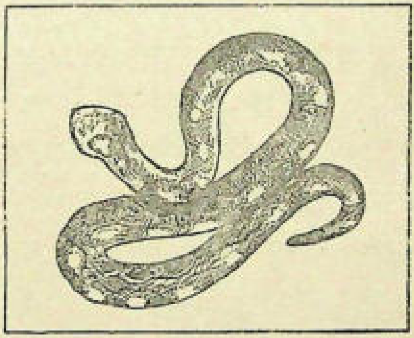

ফুরসা

কোন ভদ্রলোক মাটির ঢিপির ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। কানে ফোঁসফোঁসানি শব্দ আসায় সুমুখে চেয়ে দেখেন কিছুদূরে একটি ফুরসা। একপাশে স'রে দাঁড়াতে ভদ্রলোক যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেই পথ ধ'রে সাপটা একটা গর্তে গিয়ে ঢুকল। স্পষ্টই বোঝা গেল, বাসায় যাওয়ার পথ আটক করায় ফুরসাটা রাগে ফোঁসফোঁস করছিল।

ভারতে গঙ্গানদীর দক্ষিণে ফুরসা সর্বত্র পাওয়া যায়। বাংলায়

কদাচিৎ দেখা যায় ; যা' পাওয়া যায়, উত্তরাংশে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতেই এ সাপের বসতি বেশী। সিংহল, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর-অ্যাফ্রিকায়ও এ সাপ পাওয়া যায়।

চন্দ্রবোড়ার মত ফুরসারও বাচ্চা হয় ; তিনটি থেকে বারটা বাচ্চা দেয়।

চন্দ্রবোড়ার মত ফুরসারও মাথার আঁশ ছোট এবং অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ; চন্দ্রবোড়ার অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত, কিন্তু ফুরসার অবপুচ্ছ-আঁশ অখণ্ড। ফুরসার অন্যান্য নাম—শঙ্খবোড়া, চিত্রবোড়া, বাঘোরাজ।

চন্দ্রবোড়ার মত ফুরসার বিষও প্রধানতঃ রক্তের ওপর ক্রিয়া করে। অন্যান্য বিষ-লক্ষণও চন্দ্রবোড়ার মত। ফুরসা সামান্য কারণেই ছোবল মারে বটে ; তবে আকারে ছোট ব'লে বেশী বিষ ঢালতে পারে না। দংশনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হতে পারে। ২ দিন—এমন কি ২০ দিন পরেও মৃত্যু হয়।

ত্রিপত্রক গণ

ত্রিপত্রক গণের (ত্রিপত্রকম্) অন্তর্ভুক্ত সর্বশুদ্ধ ৫০টির অধিক প্রজাতি আছে ; তাদের মধ্যে ভারতে রয়েছে কমবেশী ১২টি। ত্রিপত্রক সবিষর বোড়া।

ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত), চীন, জাপান ও আমেরিকায় ত্রিপত্রক পাওয়া যায়।

গেছোবোড়া

সবিষর বোড়াদের মধ্যে গেছোবোড়াই (ত্রিপত্রকম্ দূর্বীয়ম্) ভারতে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। গেছোবোড়ার পিঠের প্রধান রং সাধারণতঃ জ্বলজ্বলে সবুজ অথবা হলদেটে সবুজ। সম্পূর্ণরূপে

এই রঙেরই হয়—কখনও কখনও প্রধান রঙের ওপর গাঢ় বাদামী ফুটকি থাকে। ওপর ঠোঁট সাদাটে। দেহের দু' পাশে একটি ক'রে ছুটি হলদে বা সাদা রেখা সাধারণতঃ থাকে। কখনও কখনও মাথার ওপর গাঢ় রঙের রেখা থাকে। পেটের রং সাদাটে বা সবজেটে।

কদাচিৎ হলদে বা বাদামী রঙেরও গেছোবোড়া দেখা যায়।

গেছোবোড়ার মাথা ঘাড় থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক্; চোখের তারা খাড়া উপবৃত্তাকার; তারার চারপাশ সোনালী; লেজ পরিগ্রাহী অর্থাৎ লেজ দিয়ে গাছপালা জড়িয়ে ধরতে পারে। মাথা চেপটা, চওড়া ও ত্রিকোণাকার।

গেছোবোড়ার দৈর্ঘ্য ৬০ সেন্টিমীটর—যদিও কখনও কখনও ৯০ সেন্টিমীটরের ওপরও হয়।

গেছোবোড়া বাঁশবনে ও ঝোপে-ঝাড়ে বাস করে। গাছের ডালপালায় শুয়ে থাকে। বাঁশবনে পাওয়া যায় ব'লে এ সাপের আর একটি নাম বাঁশবনে বোড়া। গাছপালার রঙের সঙ্গে এ সাপের দেহের রং এমন মিশে যায় যে, চট্ ক'রে এ সাপ দেখতে পাওয়া যায় না। যখন নড়ে, তখনই মাত্র চোখে পড়ে।

ইঁদুর, পাখির ছানা, গিরগিটি গেছোবোড়ার খাদ্য। শিকারকে আঘাত করার সময় গেছোবোড়া তার লেজের শেষ ভাগ মুহুর্মুহু নাড়তে থাকে। কোন কোন গেছোবোড়ার লেজের শেষ অংশ লাল রঙের হয়। এই লাল লেজ নাড়ালে মনে হয় যেন কোন পোকা নড়চড় করছে। পাখি-আদি প্রাণী তা' খেতে এলে নিজেই গেছোবোড়ার শিকারে পরিণত হয়।

ভারতের প্রায় সর্বত্র গেছোবোড়া দেখা যায়। ৪৫০ মীটর থেকে ১৮০০ মীটর উঁচু সমস্ত পাহাড়েই এ সাপ দেখা যায়। সাধারণতঃ পাহাড়ে জায়গায় পাওয়া গেলেও সমতল অঞ্চলেও দেখা যায়। সুন্দরবনে এ সাপ বেশ দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতের

পাহাড়ে জায়গায় এবং হিমালয় অঞ্চলে গেছোবোড়া একটি সাধারণ সাপ। ব্রহ্মদেশেও এ সাপ পাওয়া যায়।

গেছোবোড়া অলসপ্রকৃতির সাপ। কিন্তু ত্যক্ত হলে উগ্র হয়ে ওঠে—খুব জোরে দংশন করে। সম্মুখ-বিষদন্তী সাপ হলেও গেছোবোড়াকে সাধারণতঃ মারাত্মক বিষধর সাপ ব'লে গণ্য করা হয় না। এ সাপের দংশনে কদাচিৎ মানুষে মারা যায়। বমি হয়, সামান্য জ্বরও হয়; কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এসব লক্ষণ দূর হয়। ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে, বিবর্ণ হয়—কখনও কখনও তা' থেকে ছাল উঠে আসে।

চোখের তারা খাড়া উপবৃত্তাকার আর গায়ের রং সবুজ—এ হিসাবে গেছোবোড়াকে চেনা সহজ। গেছোবোড়ার মাথার আঁশ ছোট, অঙ্কতল-আঁশ চওড়া এবং অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

গেছোবোড়া সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এ সাপ কোন মানুষকে দংশন ক'রে গাছে উঠে যায়। গাছ থেকে লক্ষ করে, মানুষটা মরল কিনা। বস্তুতঃ গেছোবোড়া গাছেরই সাপ। মাটিতে কখনও কখনও নামে। মাটিতে থাকা কালে সে কাউকে দংশন করতে পারে—এবং স্বভাবতঃই গাছে উঠে যেতে পারে। গাছ থেকে সে লক্ষ করে, তা' মানুষের কল্পনা।

গেছোবোড়া বাচ্চা দেয়। সবুজ রঙের জন্যে গেছোবোড়াকে টিয়েবোড়া, পাতাড় সাপ, সবুজ চিতি ও নীল চিতিও বলে। মুখ চেপটা ব'লে গেছোবোড়ার আর এক নাম গালটাওয়া (চট্টগ্রাম)।

অন্য-ত্রিপত্রক বোড়া

অন্য-ত্রিপত্রক বোড়ার (ত্রিপত্রকম্ অন্যম্) পিঠের রং একদম সবুজ—কখনও কখনও বেগুনে-বাদামী রঙের অথবা সবুজ ও বাদামী মিশ্রিত রঙেরও হয়। দেহের দু' পাশে একটি ক'রে দুটি হলদে বা সাদা রেখা সাধারণতঃ দেখা যায়। ওপর ঠোঁট সাদাটে বা ম্লান

সবুজ। লেজের শেষ অংশ সাধারণতঃ বাদামী হয়। পেটের রং ম্লান সবুজ বা হলদেটে। লেজ পরিগ্রাহী।

অন্ধ-ত্রিপত্রক বোড়া দৈর্ঘ্যে ১ মীটর হয়। গেছোবোড়ার সঙ্গে এ সাপের গণ্ডগোল হয়ে যায়।

ভারতে বাংলা, আসাম ও হিমালয় অঞ্চলে অন্ধ-ত্রিপত্রক বোড়া দেখা যায়। নাগাভূমির একটি সাধারণ সাপ।

গিরিবাসী বোড়া

গিরিবাসী বোড়া (ত্রিপত্রকম্ গিরিবাসি) ভারতে মাত্র হিমালয় অঞ্চলেই পাওয়া যায়। পিঠের প্রধান রং হলদেটে অথবা অল্প বাদামী —তার ওপর পিঠের মাঝ বরাবর কাল কাল ছোপ। মাথার রং গাঢ় বাদামী—অনেক সময় চোখ থেকে মুখের কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত হালকা রঙের ডোরা থাকে। পেটের রং সাদাটে—তার ওপর বাদামী ছোপ। দৈর্ঘ্যে ১ মীটরের বড় হয়।

গিরিবাসী বোড়া ডিম দেয়। বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সাপ ডিম পাহারা দেয়।

অন্যান্য ত্রিপত্রক বোড়া

অশ্বনাল-বোড়া : অশ্বনাল-বোড়ার (ত্রিপত্রকম্ নালীয়ম্) ঘাড়ে ম্লান হলদেটে রঙের অশ্বনালের চিহ্ন থাকে। তাই এই নাম। দৈর্ঘ্যে ৪৫ সেন্টিমীটর হয়। দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ে জায়গায় পাওয়া যায়।

আন্দামানীয় বোড়া : আন্দামানীয় বোড়া (ত্রিপত্রকম্ দ্বৈপায়নম্) আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সাপ। দৈর্ঘ্য ১ মীটর ১৫ সেন্টিমীটর।

অপর-ত্রিপত্রক বোড়া : অপর-ত্রিপত্রক বোড়া (ত্রিপত্রকম্

অপরম্) ভারতে আসামে মাত্র পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মীটর।

মালাবারীয় বোড়া: মালাবারীয় বোড়া (ত্রিপত্রকম্ মালাবারীয়ম্) দক্ষিণ ভারতের পাহাড় অঞ্চলের সাপ। দৈর্ঘ্য ৮০ সেন্টিমীটর।

বড়-আঁশ বোড়া: মাথার আঁশ বড় ব'লে বড়-আঁশ বোড়া (ত্রিপত্রকম্ বৃহৎশকলি) নাম। দক্ষিণ ভারতের পাহাড় অঞ্চলের সাপ। দৈর্ঘ্য ৬০ সেন্টিমীটর।

অংশুশির-বোড়া: নাগাভূমির সাপ। অংশুশির-বোড়া (ত্রিপত্রকম্ অংশুশিরম্) ডিম পাড়ে। দৈর্ঘ্য ১ মীটর ১৫ সেন্টিমীটর।

পূর্বাঞ্চলীয়-বোড়া: ভারতে আসাম ও পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলে পূর্বাঞ্চলীয়-বোড়া (ত্রিপত্রকম্ পূর্বাঞ্চলীয়ম্) পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য ৮০ সেন্টিমীটর।

নিকোবরীয়-বোড়া: নিকোবরীয়-বোড়া (ত্রিপত্রকম্ নিকোবরীয়ম্) নিকোবর দ্বীপে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য ৪৫ সেন্টিমীটর।

শ্বেতওষ্ঠ ত্রিপত্রক-বোড়া: শ্বেতওষ্ঠ ত্রিপত্রক-বোড়া (ত্রিপত্রকম্ শ্বেতওষ্ঠম্) উত্তর ভারতে (দার্জিলিং সমেত) পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য ৬০ সেন্টিমীটর।

পিঠরক গণ

পিঠরক গণের (পিঠরকম্) অন্তর্ভুক্ত সর্বশুদ্ধ ১২টি প্রজাতি আছে; ভারতে রয়েছে ২টি প্রজাতি। পিঠরকের দেহ বেলনাকার। পিঠরক বোড়া এশিয়া, পূর্ব ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়।

তেঁতুলে-বোড়া: তেঁতুলে-বোড়ার (পিঠরকম্ হিমাচলীয়ম্) পিঠের রং বাদামী—তার ওপর গাঢ় বাদামী বা কাল এড়ো রেখা

অথবা আঁকাবাঁকা রেখা—এই সব রেখা কখনও কখনও অস্পষ্ট থাকে। দু' রগে চোখ থেকে মুখের কোণ পর্যন্ত একটি ক'রে গাঢ় রঙের ডোরা থাকে—এই ডোরা কখনও কখনও ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ওপর ঠোঁট সামান্য বাদামী—তার ওপর কাল দাগ। পেটের রং বাদামী—সর্বত্র বাদামী অথবা কোনটা কোনটায় প্রধান রঙের ওপর কাল ও সাদা ছোপ থাকে। পিঠের প্রধান রং বাদামী—তাই তেঁতুলে-বোড়া নাম। দৈর্ঘ্য ৮০ সেন্টিমীটর।

পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চল থেকে সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে পাওয়া যায়। পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চলের কোন কোন অংশের একটি সাধারণ সাপ।

প্রকৃতিতে তেঁতুলে-বোড়া শান্ত ও ভীরু প্রকৃতির। ধরলেও সহজে দংশন করে না। একবারে পাঁচটি থেকে সাতটি বাচ্চা দেয়।

কুব্জনাসা-বোড়া : কুব্জনাসা-বোড়ার (পিঠরকম্ কুব্জনাসিকম্) পিঠের রং পাঁশুটে বা অল্প বাদামী—তার ওপর ঘনভাবে বাদামী ছোপ ; দেহের দু' পাশে বড় কাল চিহ্নের সারি ; পেটের রং পাঁশুটে বা হলদেটে বা অল্প বাদামী ; মাথার ওপরের রং সাধারণতঃ গাঢ় বাদামী ; লেজের শেষাংশ কখনও কখনও হলদেটে বা লালচে হয়। দৈর্ঘ্য ৫০ সেন্টিমীটর।

কুব্জনাসা-বোড়া ভূমিতে চলাফেরা করে এবং গাছেও ওঠে। ঝোপে-ঝাড়েও ঘুরে বেড়ায়।

কুব্জনাসা-বোড়া ভারতে পশ্চিম-ঘাট অঞ্চলে পাওয়া যায়। সিংহলেও এ সাপ বাস করে। এ সাপ চারটি থেকে দশটি বাচ্চা দেয়।

প্রবাল গণ

ভারতীয় প্রবাল-সাপ বা সংক্ষেপে প্রবাল-সাপ (প্রব্যালম্) সম্মুখ-বিষদন্তী ; বিষদাঁতের পেছনে কোনটা কোনটায় আর কোন

দাঁত থাকে না, কোনটা কোনটায় কিছুটা ফাঁকের পর এক থেকে পাঁচটা ছোট নিরেট দাঁত থাকে। বিষদাঁত খাতগর্ত এবং সর্বদা নিশ্চল খাড়াভাবে থাকে।

অধিকাংশ প্রবাল-সাপ ছোট; দেহ সুন্দর রঙে চিত্রিত। পেটের রং সাধারণতঃ প্রবালের মত লাল—তাই প্রবাল নাম। দেহ বেলনাকার, বেড় দেহের সর্বত্র প্রায় সমান; মাথা ঘাড় থেকে পৃথক্ নয়; লেজ ছোট; চোখের তারা গোল।

প্রবাল গণে ১২।১৩ টি প্রজাতি আছে; ভারতে রয়েছে ৪টি।

প্রবাল-সাপ ভীরু প্রকৃতির। রাতে চলাফেরা করে; দিনের বেলায় কাঠ, পাতা ইত্যাদির আড়ালে মাটির তলায় নিজের দেহ লুকিয়ে অবস্থান করে। ছোট সাপই এদের প্রধান খাদ্য। প্রবাল-সাপ ডিম পাড়ে।

দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন ও জাপানে প্রবাল-সাপ পাওয়া যায়।

সম্মুখ-বিষদন্তী হলেও প্রবাল-সাপকে কার্যতঃ মারাত্মক বিষধর ব'লে গণ্য করা হয় না। এদের দংশনে সাধারণতঃ মানুষের মৃত্যু ঘটে না।

সাধারণ প্রবাল-সাপ : ভারতীয় প্রবাল-সাপের মধ্যে সর্ববৃহৎ হ'ল সাধারণ প্রবাল-সাপ (প্রব্যালম্ সামান্যম্)। দৈর্ঘ্য ১ মীটর ১৫ সেন্টিমীটর। পিঠের রং লাল বা বাদামী—তার ওপর তিন বা পাঁচ সারি কাল রেখা; মাথা ও ঘাড় কাল—মাথার পেছনে একটি বাঁকা হলদে রেখা; পেটের রং হলদেটে।

সাধারণ প্রবাল-সাপ পাহাড়ে অঞ্চলে বাস করে; দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়।

কৃশ-প্রবাল-সাপ : কৃশ-প্রবাল-সাপ (প্রব্যালম্ কৃশম্) খুব ছোট ও কৃশ—দৈর্ঘ্য ৩৫ সেন্টিমীটর। পিঠের রং অল্প হলদে-বাদামী; মাথা ও ঘাড় কাল; লেজে দুটি কাল অঙ্গুরীয়াকার

রেখা আছে—একটি থাকে লেজ যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, অপরটি থাকে লেজের শেষে : গোটা পেটটা বা কিছু অংশ প্রবালের মত লাল।

ত্যক্ত হলে এ সাপ লেজটা গুটিয়ে পিঠের ওপর তুলে ধরে : তখন তার পেটের লাল রং স্পষ্ট দেখা যায়।

কৃশ-প্রবাল-সাপ (প্রব্যালম্ কৃশম্) দক্ষিণ ভারত ও বাংলায় পাওয়া যায় ; সিংহলেও এ সাপ দেখা যায়। এ সাপ কদাচিৎ দেখা যায়।

অন্ত্য-প্রবাল-সাপ : অন্ত্য-প্রবাল-সাপের (প্রব্যালম্ অন্ত্যম্) পিঠের রং লাল বা বাদামী—সাধারণতঃ ধড় ও লেজে কাল এড়ো ডোরা থাকে—কোনটা কোনটায় কাল ডোরা না থেকে কাল ফুটকি ফুটকি থাকে—কোনটা কোনটায় পিঠ বরাবর একটি কাল ডোরা থাকে ; মাথার রং কাল—চোখের পেছনে একটি সাদা এড়ো ডোরা ; পেটের রং হলদেটে—তার ওপর কাল এড়ো রেখা অথবা চতুষ্কোণ দাগ। দৈর্ঘ্য ৮০ সেন্টিমীটর।

অন্ত্য-প্রবাল-সাপ আসাম, বাংলা (দার্জিলিং), সিকিম ও নেপালে পাওয়া যায় ; ব্রহ্মদেশেও এ সাপ পাওয়া যায়।

একক-প্রবাল-সাপ : একক-প্রবাল-সাপের (প্রব্যালম্ এককম্) পিঠের রং লালাভ অথবা বেগুনে-বাদামী—তার ওপর কাল এড়ো রেখা ; মাথার প্রথমাংশ কাল ; পেটের রং লাল—তার ওপর বড় কাল ফুটকি—কখনও কখনও ফুটকিগুলি যুক্ত হয়ে এড়ো ডোরায় পরিণত হয়। দৈর্ঘ্য ৮০ সেন্টিমীটর।

পশ্চিম-ঘাট পর্বতে পাওয়া যায় ; কদাচিৎ দেখা যায়।

দৈত্যাকার সাপ

সারা পৃথিবীতে ছটি সাপকে দৈত্যাকার সাপ বলা হয়। এরা লম্বায় যেমন বড় হয়, মোটাও তেমনি হয়। ছটি সাপের নাম—

চিত্র-ময়াল, ভারতীয় ময়াল, অ্যানাকণ্ডা, আফ্রিকীয় পাহাড়ী ময়াল, নীললোহিত মহাকাল, সংপীড়ক উপকাল। এদের মধ্যে আবার চিত্র-ময়াল সবচেয়ে বড়—দৈর্ঘ্যে ১০ মীটর পর্যন্ত হয়। তার পরের সর্ববৃহৎ সাপ হ'ল ভারতীয় ময়াল—দৈর্ঘ্যে ৭ মীটর ৭৫ সেন্টিমীটর পর্যন্ত বড় হয়। সবচেয়ে মোটা সাপ কিন্তু অ্যানাকণ্ডা—এর দেহের বেড় ৭৫ সেন্টিমীটর পর্যন্ত হয়। দ্বিতীয় সবচেয়ে মোটা সাপ হ'ল ভারতীয় ময়াল—৬৫ সেন্টিমীটর পর্যন্ত বেড় হয়। ৫ মীটর দীর্ঘ একটি অ্যানাকণ্ডার ওজন ৭ মীটর দীর্ঘ একটি চিত্র-ময়ালের ওজনের সমান ছিল।

এই ছটি দৈত্যাকার সাপের মধ্যে মাত্র একটি—ভারতীয় ময়ালই—আমাদের দেশে পাওয়া যায়। এ সাপ ময়াল গণের অন্তর্ভুক্ত।

ময়াল গণ

ময়াল (মহাকালম্) বিষহীন সাপ। বড় ও মোটা যত সাপ তার অধিকাংশই এই ময়াল গণের অন্তর্ভুক্ত। দেহ বেলনাকার; লেজ অপেক্ষাকৃত ছোট, তবে পরিগ্রাহী; মাথা বেশ চওড়া এবং ঘাড় থেকে বেশ পৃথক্; মাথার ওপর বড় আঁশ আছে; নাসারন্ধ্র বেশ বড়—এবং মাথার ওপর দিকে থাকে; চোখ মাঝামাঝি আকারের; তারা খাড়া; তারার চারপাশ সোনালী; পেটের আঁশ সংকীর্ণ; অবপুচ্ছ-আঁশ সাধারণতঃ বিভক্ত; ওষ্ঠ-আঁশে মুখাবয়ব বিবর আছে; ওপর ও নীচের চোয়ালের সামনের দাঁত বেশ বড়।

ময়াল গাছে বা জলাশয়ের ধারে বাস করে; পাহাড় অঞ্চলে দেখা যায়; রাতে চলাফেরা করে। সাপ সাধারণতঃ ডিমে তা দেয় না, কিন্তু ময়ালকে ডিমে তা দিতে দেখা যায়।

ময়াল গণে ৭টি প্রজাতি আছে। ভারতে পাওয়া যায় ১টি—ভারতীয় ময়াল।

দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত) ও অ্যাফ্রিকায় ময়াল পাওয়া যায়।

ময়াল

ভারতের বিষহীন সাপদের মধ্যে ভারতীয় ময়ালেরই (মহাকালম্ ভারতীয়ম্) কথা সর্বাগ্রে মনে হয়। ভারতীয় ময়ালকেই সংক্ষেপে ময়াল বলা হয়। লম্বায় ময়াল যেমন খুব বড় হয়, তেমনি মোটাও হয় খুব। ময়াল দৈর্ঘ্যে ৭ মীটর ৭৫ সেন্টি-মীটর পর্যন্ত হয়; গড়পড়তা দৈর্ঘ্য অবশ্য ৪ মীটর। ৬ মীটর দীর্ঘ একটি ময়ালের ওজন ছিল ৯৫ কিলোগ্রাম। বৃহৎ আকারের জন্যে ময়ালকে দেখলেই লাগে ভয়। তার ওপর যদি বিষ থাকত!

ময়ালের রং বিচিত্র। মাথার ও পিঠের প্রধান রং হালকা হলদে থেকে ননী পাঁশুটে বা অল্প বাদামী—তার ওপর জালের মত কাল, কখনও কখনও হলদেটে রেখা থাকে—মনে হয় প্রধান রঙের বড় বরফির সারি; দেহের পেছন অংশে এ সুনির্দিষ্টতাও অনেক সময় দেখা যায় না; পেটের রং হলদেটে—পেটের ছু' ধারে গাঢ় রঙের ছোপ থাকে; লেজের তলায় থাকে হলদে ও কাল রঙের ছোপ।

কোন কোন ময়ালের দেহে কাল রংটা এমন প্রকট হয়ে ওঠে যে মনে হয় গায়ের প্রধান রংই বুঝি কাল। একটি সাদা রঙের ময়াল কোন সাপুড়ে সংগ্রহ করেছিল; তার গায়ে আর কোন রং ছিল না।

ময়ালের মাথা কতকটা চেপটা; মাথায় বর্শার ফলার মত একটি চিহ্ন থাকে।

ময়ালের দেহে শ্রোণীচক্র অস্থির অবশেষ রয়েছে। পেছন পায়ের নিদর্শন স্বরূপ অবসারণী-ছিদ্রের ছু' পাশে ছুটি নখরাকৃতি উদ্গত অংশ দেখা যায়। উদ্গত অংশ ছুটি দিয়ে পায়ের কাজ আর হয় না, তবে অন্য কাজ সম্পন্ন হয়। এই নখরাকৃতি উদ্গত

অংশ দিয়ে পুরুষ সাপ পূর্বরাগের সময় স্ত্রী ময়ালের অবসারণী-ছিদ্রের আশপাশে ঘষতে থাকে, তাতে স্ত্রী সাপটি মিলনে উদ্দীপিত হয়।

ময়াল সাধারণতঃ পাহাড় অঞ্চলে বাস করে। বন-জঙ্গলে গাছের ডালে এ সাপ জড়িয়ে থাকে। বন-বাদাড় যেখানে নেই সেখানে নদী-নালা ঝিল-বিলের ধারে এ সাপকে থাকতে দেখা যায়।

গাছের গুঁড়ি বা মোটা ডালের রঙের সঙ্গে ময়ালের রং অনেক সময় মিশে যায়; তখন এ সাপকে হঠাৎ চিনতে পারা সহজ হয় না। কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গেছে; গাছের গুঁড়ি ভেবে ময়ালের দেহেই কুড়ুলের ঘা বসিয়ে দিয়েছে। এর চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শোনা যায়। কাঠ সংগ্রহ করতে বনে ঢুকে কাঠুরেদের অনেক সময় সেখানেই রান্না ক'রে খেতে হয়। একবার কয়েকজন কাঠুরে একটি গাছের ভূমিতলে শায়িত মোটা ডালের গায়ে উনুন ক'রে আগুন জ্বেলে হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে তারা লক্ষ করে, গাছের ডালটা যেন নড়ছে! তারা যাকে গাছের গুঁড়ি ভেবেছিল, আসলে সেটা ছিল একটা ময়াল সাপ!

ময়াল গাছে খুব ভালভাবে উঠতে পারে, গাছে চলাফেরাও করতে পারে। লেজ পরিগ্রাহী—লেজের গঠন এমন যাতে সহজেই গাছের ডালপালা জড়িয়ে ধরতে পারে; নিজের দেহও ঝুলিয়ে দিতে পারে। সাঁতার কাটতে ময়াল খুব ওস্তাদ। জল এ সাপ খুব পছন্দ করে। গরমের সময় কোন কোন ময়ালকে জলের মধ্যে প্রায় সমস্ত দেহ বা কিছুটা অংশ ডুবিয়ে থাকতে দেখা যায়। এ স্বভাব থাকায় অজ্ঞ সাধারণ লোকে ময়ালকে জলবাসী সাপ ব'লে ভুল করে। জলের তলায় ময়াল আধঘণ্টা পর্যন্ত একদম ডুবে থাকতে পারে। বন্দী ময়ালকে কখনও কখনও দিনের পর দিন জলে প'ড়ে থাকতে দেখা যায়।

ময়াল খুবই অলস প্রকৃতির। তেমন তাড়াতাড়ি চলাফেরাও করে না। ময়ালের তুলনায় চিত্র-ময়াল অধিকতর ক্ষিপ্র। বনে-বাদাড়ে ময়াল ভীত হয় না। তবে কোন কারণে পালাতে হলে খুব ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। শিকার ধরার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও ময়াল খুব ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। ময়াল রাতে চলাফেরা করে—যদিও দিনেও খুব সজাগ থাকে। কোন কোন ময়াল একই স্থানে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়।

ময়াল সাপ

ময়াল স্তন্যপ, পাখি, গিরগিটি-আদি প্রাণী খেয়ে থাকে। তাপগ্রাহী অপেক্ষা তাপমোচী প্রাণী খেতেই ময়াল আগ্রহ প্রকাশ করে। ময়ালের ওষ্ঠে মুখাবয়ব বিবর আছে। সুতরাং অন্ধকারেও তাপমোচী প্রাণীর উপস্থিতি ময়াল সহজেই বুঝতে পারে। শিকারের গায়ের রঙও ময়ালকে প্রভাবিত করে ব'লে মনে হয়। কটা রঙের শিকারই যেন ময়াল পছন্দ করে; সাদা রঙের শিকারের দিকে তেমন ঝোঁক দেখা যায় না।

ভারতীয় ময়ালের চেয়ে চিত্র-ময়াল আকারে বড়। কিন্তু চিত্র-ময়ালের তুলনায় ভারতীয় ময়াল বড় বড় শিকার ধরতেই যেন পছন্দ করে। খরগোশ, ছাগল, হরিণ, শিয়াল, সজারু, বাঁদর—

এসব ময়ালের খাদ্য। একটি মাঝারি আকারের হরিণ বা ছাগল গিলে একটি ময়াল এক মাস বেশ কাটিয়ে দিতে পারে। ভূরি-ভোজের পর ময়াল কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে তা' হজম করে। কখনও কখনও যেখানে শিকার গিলেছে, সেখানেই কুণ্ডলী পাকিয়ে বিশ্রাম করে। ২০ কিলোগ্রাম ওজনের মধ্যে কোন শিকার ময়াল সহজেই গিলতে পারে। একটি ৬ মীটর দীর্ঘ বন্দী ময়ালকে ৩৬ কিলোগ্রাম ওজনের সদ্য-নিহত একটি শূকর-ছানা খেতে দেওয়া হয়েছিল। খুব কসরৎ ক'রে খুব কষ্ট ক'রে শূকরছানাটিকে সাপটা গিলেছিল।

সুন্দরবনের আবাদে একটি বাছুর ভেড়ি থেকে নেমে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল। যাদের বাছুর তারা অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঐ জঙ্গলে একটি ময়ালকে দেখতে পেল। ঐ সাপটাই বাছুরটাকে গিলে পেট মোটা ক'রে পড়েছিল।

আড়াই মীটর দীর্ঘ একটি ময়ালকে ১ মীটর ২৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ গোসাপ খেতে দেওয়া হয়। গোসাপটাকে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় দেওয়া হয়েছিল। গোসাপের নখর ময়ালের গায়ে লাগায় সঙ্গে সঙ্গে সাপটা তাকে দেহের পেঁচে জড়িয়ে ধরল। প্রায় ৪ ঘণ্টা জাপটিয়ে থাকার পর সাপটা গোসাপটাকে ১০ মিনিটে খেয়ে ফেলল। যে দড়ি দিয়ে গোসাপটা বাঁধা ছিল, সে দড়িটাও সে খেয়ে ফেলে। ময়ালটার পেট ৪৮ ঘণ্টা ফুলে ছিল। পরে সাপটা মল ত্যাগ করলে গোসাপের নখর, দাঁত ও দড়ির সীসা তাতে পাওয়া যায়।

ময়ালের দৈহিক শক্তিও খুব বেশী। সুবিধামত দেহের পেঁচ দিয়ে ধরতে পারলে বড় বাঘকেও সে ঘায়েল করতে পারে। লেজ ব্যতীত ১ মীটর ২৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ একটি চিতাকে সাড়ে পাঁচ মীটর দীর্ঘ একটি ময়াল গিলেছিল। সাপটা চিতাটার মুখের দিকেই ধরেছিল। চিতাটা ময়ালকে এমন কিছুই আহত করতে

পারে নি। থাবার আঘাতে মাঝে মাঝে কেটে গেছল মাত্র। কোন বনে রাতে আর এক চিতাকে একটি ময়াল কামড়ে ধরেছিল। চিতাটার মুখের দিক্ ধরতে পারে নি—পেছন দিক্ কামড়ে ধরেছিল। রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে চিতার সে ভয়াবহ আর্তনাদ আশপাশের গ্রামবাসীদের কাছে এসে পৌঁছেছিল। চিতা তার থাবা মাটিতে আঁকড়ে ধ'রে ময়ালের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ময়ালটা ধীরে ধীরে চিতাটাকে সম্পূর্ণভাবে গিলে ফেলে। শেষ মুহূর্তেও চিতাটার জ্ঞান ছিল।

শিংওলা ময়ালের গল্প শোনা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ময়ালের তো শিং থাকে না। ময়ালটা হয়তো কোন হরিণ বা ছাগল খেয়েছে। গেলার সময় শিং দুটো বেকাদায় থাকায় ময়ালের দেহ ফুঁড়ে বেরিয়েছে। তাতেই দূর থেকে মনে হয়েছে, ময়ালেরই বুঝি শিং গজিয়েছে। ময়াল জন্তু-জানোয়ারের শিং হজম করতে পারে। তবে সাধারণতঃ শিকার গেলার সময় শিং দুটো শিকারের দেহ থেকে খুলে বাইরে প'ড়ে যায়। সাড়ে পাঁচ মীটার দীর্ঘ একটি ময়ালের পেটে একটি কাকার পাওয়া গেছল। তার শিংয়ের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩০ সেন্টিমীটার। ময়ালটা শিং দুটোও গিলেছিল।

একটি ময়ালকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছল। তার দেহ ভেদ ক'রে সজারুর গায়ের কাঁটা বের হয়েছিল। সজারুটা গিলে সাপটা বোধ হয় বেশী নড়াচড়া করেছিল। তাতেই কাঁটাগুলো ফুটে বেরিয়ে এসেছিল।

বোম্বাইয়ের চিড়িয়াখানায় সাড়ে তিন মীটর দীর্ঘ পুরুষ ময়াল আড়াই মীটর দীর্ঘ স্ত্রী ময়ালকে গিলেছিল। হজম করতে অসুবিধা হওয়ায় ভক্ষিত মৃত ময়ালকে উগরে দেয়।

বন্দী একটি ময়ালকে প্রতি সপ্তাহে মুরগী খেতে দেওয়া হ'ত। নির্দিষ্ট দিনে খাঁচার ওপর ডালা খুলতেই সাপটা বুঝতে পারল,

তার খাবার আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাথাটা উঁচু ক'রে তুলল। ময়ালটার যাতে কোন চোট্ না লাগে, সেজন্যে মুরগীর পা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। লোহার সিকে আটকানো মুরগীটা মুখের কাছাকাছি ধরতেই ময়ালটা যেন ছোঁ মেরে কামড়ে ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে দেহের পেঁচ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। মুরগীটা গেলার পক্ষে দেহের পেঁচ দিয়ে তাকে মারার ময়ালের প্রয়োজন ছিল না ব'লে মনে হয়। তা' সত্ত্বেও ময়ালটা মুরগীটাকে দেহের পেঁচ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে এভাবে জড়িয়ে ধরত। আধ ঘন্টায় সাপটা মুরগীটাকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলল। মুরগীটা খাওয়ায় ময়ালটার দেহের একস্থান বেশ ফুলে উঠল। দু' ঘন্টা পরেও সে স্থান বেশ ফোলা ছিল—মুরগীটা সম্পূর্ণ তখনও হজম হয় নি। অপর একটি বন্দী ময়ালকে মুরগী খেতে দেওয়া হচ্ছিল। জলের চৌবাচ্চায় ময়ালটা মুখ ডুবিয়ে ছিল। খাঁচার ওপর ডালা থেকে মুরগীটা বেশ খানিকটা নামিয়ে দেওয়াতে চকিতে সে জল থেকে মুখ বের ক'রে মুরগীটাকে ধরল। জলের মধ্যে থেকেও মুরগীটাকে সে লক্ষ করেছিল।

ময়াল বড় জন্তু-জানোয়ার গিলতে পারে বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক আজগুবী গল্পেরও চলন আছে। ছাগল-হরিণ ময়াল সহজেই খায়। কিন্তু বড় গরু বা মোষকে তার পক্ষে গেলা সম্ভব নয়। অজ অর্থাৎ ছাগল খায় ব'লে ময়ালের একটা নাম অজগর।

বন্দী অবস্থায় ময়াল অনেক সময় খেতে চায় না। খাঁচায় আবদ্ধ একটি ময়াল কিছুই খেত না। পায়রা, হাঁস, ব্যাং খেতে দেওয়া হয়েছিল, খায় নি। জলও খেত না ব'লে মনে হয়। কিন্তু নিয়মিত খোলস ছাড়ত। এরকম আড়াই বছর কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত রোগা হয়ে যাওয়ায় তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। পারির 'চিড়িয়াখানায় কিছু না খেয়ে একটি ময়াল ৪ বছর বেঁচেছিল।

ময়াল ডিম পাড়ে। মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে ময়াল ডিম পাড়ে। সাপের ডিম প্রসঙ্গে বলেছি, একটি ময়াল ১০৭টি ডিম পেড়েছিল। অপর একটি ময়ালের ১৬টি ডিম পাড়তে ৭ ঘন্টা সময় লেগেছিল।

সাপ সাধারণতঃ তার ডিমে তা দেয় না। কিন্তু ময়ালকে ডিমে তা দিতে দেখা যায়। ডিম পাড়ার পর স্ত্রী ময়াল ডিমগুলিকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে যতক্ষণ না ঐসব ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। ডিমে তা দেওয়ার সময় ময়ালের দেহের তাপও বেড়ে যায়—২ ডিগ্রী থেকে ৪ ডিগ্রী। কোন স্ত্রী ময়ালকে এক-নাগাড়ে ১১ সপ্তাহ পর্যন্ত ডিমে তা দিতে দেখা যায়; একটুও সে জায়গা থেকে নড়ে নি। কোন কোন ময়াল অবশ্য পিপাসা নিবারণ করতে দূরে যায়—পুনরায় এসে ডিমে তা দেয়। ময়ালের বাচ্চাদের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ৭৫ সেন্টিমীটর।

বিশেষ ক'রে উত্তর-ভারতে ময়াল শীতঋতুর কয়েক মাস পাহাড়ের গুহায় গাছের কোটরে নদীর ধারে গর্তে কাটায়।

কলকাতা শহরের আশপাশে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে কখনও কখনও ময়ালের দর্শন পাওয়া যায়। খাস কলকাতাতেও কখনও কখনও ময়ালের আবির্ভাব ঘটে। বর্ষাঋতুতে গঙ্গার তীরবর্তী কাশী মিত্র শ্মশানঘাটে একটি বটগাছের ডালে সাড়ে তিন মীটর দীর্ঘ একটি ময়ালকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ময়ালটাকে গুলি ক'রে মারা হয়। গঙ্গার স্রোতে এসে ময়ালটা সেখানে উঠেছিল ব'লে মনে হয়।

৩ মীটর দীর্ঘ একটি ময়ালের বয়স সাধারণভাবে তিন-চার বছর বলা যেতে পারে। বন্দী অবস্থায় ময়ালকে ২৫ বছর বাঁচতে দেখা গেছে।

একটি বন্দী ময়ালকে জ্যান্ত ইঁদুর খেতে দেওয়া হয়েছিল। ময়ালটা তখনই তখনই ইঁদুরটা খায় নি। ইঁদুরটা কিন্তু ময়ালটার

গা কুরে কুরে খেতে লাগল। মাংস খেয়ে ফেলা সত্ত্বেও ময়ালটা তিলমাত্র নড়েচড়ে উঠল না। পাঁচ মিনিট পর ময়ালটা মাথা তুলে উদাসভাবে ইঁদুরটাকে তাড়িয়ে দিল। এ থেকে বোঝা যায়, ময়ালের বেদনা বোধ করার ক্ষমতা কম।

একটি ফুৎকারী সাপ একটি ময়ালকে দংশন করেছিল। ফুৎকারী সাপ মারাত্মক বিষধর হওয়া সত্ত্বেও ময়ালটা মরে নি।

ময়াল সাপের মাংস অনেকে খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে কোন কোন আদিম জাতি ময়ালের মাংস খায়। ময়ালের চামড়া দিয়ে অনেক শৌখিন জিনিস তৈরী হয়।

ময়ালের অনেক নাম। অজগর নামের কথা বলেছি। পাহাড়ের ওপর প'ড়ে থাকে ; তাই পাহাড়িয়া-বোড়া বা পাহাড়ে-চিতি। গায়ে গোল গোল বাহার, তাই নাম গোলবাহার (চব্বিশ-পরগনা)। বরা অর্থাৎ শূকর খায় ব'লে বরাচিতি (চব্বিশ-পরগনা)। মেঘডুম্বুর (বরিশাল, ময়মনসিংহ) নামেও এ সাপ পরিচিত। মেঘের গর্জনের মত শব্দ করে ব'লে এই নাম। মেঘজালের মত শাড়িকেও মেঘডুম্বুর বলে ; ময়ালের গায়ের রং কতকটা সেরকম বটে। ময়ালকে ওলোবুড়াও (শ্রীহট্ট) কেউ কেউ বলে। হরিণ খায় ব'লে হরিণবোড়া নাম।

শিকারের পদ্ধতি : হঠাৎ আক্রমণ আর দেহের পেঁচের চাপ —এই হ'ল ময়ালের শিকার ধরার বৈশিষ্ট্য। বড় জন্তু-জানোয়ারও আচম্বিতে ময়ালের কবলে প'ড়ে মারা যায়।

সাধারণতঃ নদী বা জলার ধারে কোন গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে ময়াল নীচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে নিস্পন্দভাবে থাকে। খুব মনোযোগের সঙ্গে না দেখলে মনে হবে গাছেরই বুঝি একটি ডাল ঝুলছে। অজানতে কোন জন্তু সেখানে জল খেতে এলে ময়াল চকিতে মাথাটা বেগে সমুখে এগিয়ে দিয়ে জোরে তাকে কামড়ে ধরে, আর সমস্ত দেহটা টেনে নিয়ে ধপ্ ক'রে তার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে। প্রয়োজন বোধ করলে অথবা শিকার বা শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে এক বা একাধিক দেহের পাক দিয়ে শিকারকে জাপটিয়ে ধরে। ছোট ছোট শিকারকে ময়াল কামড়ে ধ'রে গিলতে থাকে, দেহ দিয়ে আর পাকিয়ে ধরে না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ময়াল তার শিকারকে কামড়ে ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ দিয়ে পাকিয়ে ধরে। শিকারের মুখের দিকেই ময়াল কামড়ে ধরে। সব সময়ে যে সফলকাম হয়, তা' নয়। অবস্থা-বিপাকে কখনও কখনও শিকারের পেছন দিক্‌ও কামড়ে ধরতে বাধ্য হয়। শিকারকে জড়িয়ে ধ'রে ময়াল তাকে চলনশক্তিহীন ক'রে দেয়। শিকার যত ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, ময়াল ততই তাকে দেহের পাকে চেপে ধরে। শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায়—কদাচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ায়—শিকার মারা যায়। শিকার খুব বেশীরকম ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করলে ময়াল তার দেহের পাকের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রথম চোটে ময়াল তার শিকারের দেহ ঘিরে যে কটা পাক দেয়, তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় পাক দেয়। দেহের অধিকতর পেঁচের কবলে শিকারকে আনতে ময়াল তার পাকানো দেহকে শিকারের মাথার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে অথবা শিকারকে তার লেজের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অধিকতর সংখ্যায় পাক দেওয়ার উদ্দেশে জোর আনতে ময়ালকে সাধারণতঃ কোন খুঁটি বা অনুরূপ কোন জিনিসে লেজ জড়িয়ে ধরতে হয় না। মাথা ও দেহের সমুখ ভাগের পেঁচই সে জোর দেয়। তবে শিকার যদি এমন শক্তিশালী হয় যাতে সাধারণ চেষ্টাতেই ময়ালের পক্ষে তাকে চলন-শক্তিহীন করা সম্ভব না হয়, তা' হলে কোন গাছ, খুঁটি বা অনুরূপ কোনস্থানে লেজ বা দেহ জড়িয়ে নেওয়া ময়ালের প্রয়োজন হয়।

মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থাতেও ময়াল শিকার ধরে। নিশ্চল-ভাবে সে শুয়ে থাকে। তার দেহে যে প্রাণ আছে, তা' বোঝা যায় তার লকলকে জিব বের করা ও ঢোকান দেখে। কিছুদূরে

সে একটা শিকার দেখেছে। ধীরে ধীরে সে মাথাটা তুলতে থাকে। না—শিকারটা যেন চমকে উঠল। শিকারটা কি বুঝতে পেরেছে তার উপস্থিতি? মুহূর্তে মাথাটা সে নামিয়ে নেয়। কিন্তু শিকার স্থির থাকলে ময়াল ধীরে ধীরে—খুব ধীরে ধীরে এগতে থাকে এবং কাছে গিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে তার ওপর লাফিয়ে পড়ে।

কখনও কখনও ময়াল জলের মধ্যে সমস্ত দেহ ডুবিয়ে মাত্র চোখ ও নাসারন্ধ্র জলের ওপর রেখে ভেসে থাকে। তার উপস্থিতি বুঝতে না পেরে কোন প্রাণী সেদিকে জল খেতে আসতে দেখলে ময়াল সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাও জলের তলায় লুকিয়ে ফেলে। প্রাণীটি কাছে এলে তড়িৎ-গতিতে তাকে কামড়ে ধরে। জলচর পাখিও ময়াল এভাবে ধরে।

বড় বড় শিকারও কখনও কখনও ময়ালকে জ্যান্ত অবস্থাতেই গিলতে দেখা যায়। শিকারকে মেরে ফেলার পর কখনও কখনও ময়াল তার নাসাগ্র শিকারটার দেহের ওপর বুলতে থাকে—লকলকে জিব বের ক'রে শিকারের প্রকৃতি বোধ হয় বোঝার চেষ্টা করে। তারপর তার মুখের দিক্ থেকে গিলতে আরম্ভ করে।

শিকারকে কামড়ে ধরার সময় ময়াল তার মাথাটা সবেগে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। এ থেকে অনেকের ধারণা, ময়াল বুঝি তার বড় মাথা দিয়ে তার শিকার বা শত্রুকে খুব জোরে আঘাত করে—যেমন আততায়ী আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘুষি মেরে ঘায়েল ক'রে নেয়। একথা ঠিক নয়। সাপের নাসাগ্র খুবই দুর্বল। জোরে আঘাত পেলে তার নাসাগ্র আহত হতে বাধ্য। ময়াল জেনে-শুনে তা' করতে পারে না। বন্দী সাপকে প্রথম প্রথম মুখ দিয়ে খাঁচার কাঁচে আঘাত করতে দেখা যায়। সামনে যে খাঁচার আড়াল আছে, তা' সে খেয়াল করতে পারে না ব'লেই এরকম করে। খাঁচায় কিছুদিন থাকার পর আর সে এরকম করে না।

আমাদের অনেকেরই ধারণা, ময়াল বুঝি তার শিকারকে জাপটিয়ে ধ'রে হাড়গোড় ভেঙে তালগোল পাকিয়ে গেলে। কথাটা ঠিক নয়। শিকারের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এ সাপের দেহের পেঁচের চাপে। তাতেই মারা যায়। হাড়গোড় ভাঙে না, ভাঙলে কদাচিৎ ভাঙে। ময়ালের তা' অভিপ্রায় থাকে না—শিকার গেলার পক্ষে প্রয়োজনও ঘটে না; তালগোল পাকান তো দূরের কথা। মুখের তুলনায় নিতান্তই যদি শিকার খুব বড় হয়, তা' হলে শিকারের দেহকে কিছুটা প্রসারিত ক'রে লম্বাটে ধরনের ক'রে নিতে পারে সে।

ময়াল কোন শিকারকে জাপটিয়ে ধরলে ভয়ে পালাবার জন্যে সে ঝটপট করে, ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। যত সে ঝটপট করে, ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, তার দেহের অক্সিজেনের চাহিদা তত বেড়ে যায়। ময়াল তারই সুযোগ নেয়। শ্বাস নেওয়ার সময় শিকার বুক যেই সংকুচিত করে, ময়াল তার দেহের পেঁচ আরও চেপে বসায়। শিকার যতবার বুক সংকুচিত করে, তত দৃঢ়বন্ধনে ময়াল তাকে জাপটিয়ে ধরে। এভাবেই শিকারের শ্বাসরুদ্ধ হয়। শিকার দেহের পাকে প'ড়ে কাবু হয়—আত্মরক্ষায় কিছু করতে পারে না।

৪ মীটর দীর্ঘ একটি ময়াল তিন বছর বয়স্ক একটি কাকার খায়। সঙ্গে সঙ্গে তার পেট চিরে দেখা যায়, জন্তুটার মাত্র একটি পেছন পায়ের অস্থি ভেঙে গেছে, আর কোন অস্থি ভাঙে নি। পঞ্জরাস্থি ও সমুখ পায়ের অস্থিও অটুট আছে।

আড়াই মীটর দীর্ঘ একটি ময়াল ১ মীটর ২৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ একটি গোসাপকে জড়িয়ে ধরেছিল। গোসাপের অস্থি ময়ালের পাকে মড়মড় ক'রে যে ভাঙছিল, তা' বেশ শোনা যাচ্ছিল। ৭৫ মিনিট ধ'রে তাদের লড়াই চলে। গোসাপটা ম'রে যাওয়ার পরও ময়ালটা তাকে গিলতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। গোসাপের আকৃতি হিসাবে তার পঞ্জরাস্থি ভাঙা স্বাভাবিক ছিল।

সাপের দাঁত পেছন দিকে বাঁকানো থাকায় কোন শিকারকে কামড়ে ধরার পর ময়ালের পক্ষে নিজে থেকে সে শিকারকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। অসাধারণ ক্ষেত্রে—ময়াল কোন কারণে হঠাৎ ভীত হলে শিকার তার মুখ থেকে ছিটকে যেতে পারে। নতুবা শিকার যতই বড় বা অপ্রীতিকর হ'ক, ময়ালকে তা' গিলতেই হবে। বড় বড় শিকারকে সম্পূর্ণ গিলতে ময়ালের ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যায়। সেজন্যে ময়াল মাঝে মাঝে থেমে তার শ্বাসনালী মুখ-গহ্বরের দিকে ঠেলে দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে নেয়। বড় শিকার গিলতে গিলতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ময়াল কখনও কখনও মারা যায়। শিকার গেলার ব্যাপারে ময়ালের মুখের লালা তাকে সাহায্য করে। শিকার গেলার সময় ময়ালের মুখ থেকে প্রচুর লালা নির্গত হয় এবং তা' শিকারের গায়ে লেগে যায়।

অনেকের ধারণা, শিকার গেলার সময় ময়াল তাকে লালা দিয়ে ভিজিয়ে নেয়। ময়াল এরকম কিছুই করে না। এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি কেন হ'ল, তা' বোঝা সহজ। ময়ালের মুখ থেকে ছুটে-যাওয়া লালায়-ভেজা কোন শিকারকে দেখে এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছে।

দৈত্যাকার ময়াল সম্বন্ধে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প প্রচলিত আছে। ময়ালের চোখে আছে সম্মোহনী শক্তি। এই সম্মোহনী শক্তি দিয়ে ময়াল দূর থেকে জন্তু-জানোয়ারকে বশ করে, তারপর কাছে গিয়ে তাকে খায়। এ কথায় কোন সত্য নেই। অন্যান্য সাপের মত ময়ালেরও চোখ সর্বদা খোলা থাকে। পরন্তু শিকার ধরার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্বভাবতঃ অলসপ্রকৃতির ময়াল অতি ক্ষিপ্রগতিতে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ময়ালের পলকহীন দৃষ্টি এবং শিকার ধরার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ক্ষিপ্রগতি ময়ালের চোখের সম্মোহনী শক্তির কথা জন্ম দিয়েছে ব'লে মনে হয়। এমনও হতে পারে, দৈত্যাকার ময়ালকে দেখে কোন শিকার এত ভীত হয়েছে

যে জবুথবু হয়ে সে সেখানেই চলনশক্তিহীন হয়ে পড়েছে—ছুটে আর পালাতে পারে নি। এ থেকেও ময়ালের সম্মোহনী শক্তির গল্প সৃষ্টি হতে পারে।

ময়াল সম্বন্ধে আর একটি গল্প প্রচলিত আছে। ময়াল পাহাড়ের গায়ে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। আকাশ দিয়ে সে সময় কোন পাখি উড়ে গেলে ময়ালের নিশ্বাসের জোরে সে পাখি আকর্ষিত হয়ে তার মুখে গিয়ে ঢোকে। বলা বাহুল্য, একথা ঠিক নয়। ময়ালের অলস প্রকৃতি এবং খুব জোরে শ্বাস নেওয়ার ব্যাপার থেকে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে ব'লে মনে হয়। ময়াল যখন খুব জোরে শ্বাস নেয়, তখন বেশ দূর থেকে তার শ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনা যায়—সাধারণ লোকে বলে ঝড় বইছে।

লড়াইয়ে সব সময় ময়ালই যে জেতে, তা' নয়। কখনও কখনও ময়াল আহত—এমন কি নিহত হয়। শিকারকে মারতে গিয়ে কখনও কখনও শিকার ও শিকারী—দুই-ই মারা যায়। একবার কোন গভীর জঙ্গলে রাতে একটি বড় বাঘকে একটি ময়াল আক্রমণ করেছিল। ময়ালটি বাঘের দেহ ঘিরে জোর পাক দিতে সমর্থ হয়েছিল। একদিকে বাঘের গর্জন, অপরদিকে ময়ালের ফোঁসফোঁসানিতে সারা বন কম্পিত হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত বাঘটি মারা যায়, কিন্তু ময়ালটি এমন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল যে সেও পরে মারা যায়।

মানুষ ও ময়াল ঃ মানুষ ময়ালকে ভয় করে। আদিম মানুষ কি ভয়াবহ চোখে ময়ালকে দেখত, ময়াল নাম থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকাল শব্দ থেকে ময়াল এসেছে। কিন্তু বনে-জঙ্গলেও তেড়ে এসে ময়াল-আদি দৈত্যাকার সাপ মানুষকে আক্রমণ করেছে, এ ধরনের ঘটনা বড় শোনা যায় না। যাও শোনা যায় তাতে দেখা যায়, ঐ সাপ ভুল ক'রে মানুষটিকে আক্রমণ করেছিল। মানুষটিকে তার সহজলভ্য কোন শিকার মনে

করেছিল। বস্তুতঃ যত বড়ই দৈত্যাকার সাপ হ'ক, আক্রমণের উদ্দেশে সে কখনও মানুষকে তেড়ে আসে না এবং কদাচিৎ শিকার ভেবে তেড়ে আসে।

বনে-জঙ্গলে ময়ালের সমুখে কোন মানুষ গিয়ে পড়লে ঐ সাপ কদাচিৎ নড়াচড়া ক'রে ওঠে—সাধারণতঃ যেমন থাকে তেমনই প'ড়ে থাকে। কোন শিকারী আসামের বনে ঘুরতে ঘুরতে এক জলার ধারে পৌঁছে দেখেন, জলে একটা ময়াল মাত্র মাথাটা বের ক'রে ডুবে আছে; তাঁকে দেখামাত্রই মাথাটা ডুবিয়ে নেয়। অপর আর এক শিকারী আসামের জঙ্গলেই বেড়াতে বেড়াতে অজানতে প্রায় ৪ মীটর দীর্ঘ একটি ময়ালের মুখের মাত্র কয়েক সেন্টিমীটরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। ময়ালটা কিছুই বলে নি।

ময়াল-আদি দৈত্যাকার সাপের বড় বড় শিকার গেলার ক্ষমতায় সে যে মানুষ গিলতে পারবে, এ তো ভাবাই স্বাভাবিক। পশুর মত মানুষের দেহে লোম নেই, খুর নেই, শিংও নেই। সুতরাং খাদ্য হিসাবে মানুষ তো লোভনীয়। আত্মরক্ষার ক্ষমতাও তার তেমন নেই—পশুর মত তার চোয়ালে তেমন জোর নেই, হাতে-পায়ে তীক্ষ্ণ নখরও নেই। এ সত্ত্বেও ময়ালের মানুষ গেলার কাহিনী কদাচিৎ শোনা যায়।

মানুষের সম্পর্কে ময়ালের এই ঔদাসীন্যের কি কারণ থাকতে পারে? মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও তার দৈহিক আকৃতিই এর কারণ ব'লে মনে হয়। আত্মরক্ষায় মানুষ দুর্বল হলেও বনে-জঙ্গলে সে তো বিনা অস্ত্রে থাকে না; তা' ছাড়া সে থাকে সতর্ক। অধিকাংশ-ক্ষেত্রে সে-ই আক্রান্ত না হয়ে আক্রামক হয়ে দাঁড়ায়। এতে বোধ হয় ময়াল-আদি দৈত্যাকার সাপ মানুষকে এড়িয়ে যেতেই শিখেছে।

মানুষের দৈহিক আকৃতি যেমন, সাধারণ দৈর্ঘ্যের ময়াল-আদি সাপের পক্ষে মানুষ গেলা তাতে সহজ নয়। মানুষের অংসফলক তার মুখে আটকে যাবে ব'লে মনে হয়। মানুষের আকৃতি যত

বড়, তার চেয়ে অনেক বড় মনে হয় জামা-কাপড় পরা থাকায়। এসব কারণেই বোধ হয় দৈত্যাকার সাপ কর্তৃক মানুষকে আক্রমণ বা মানুষকে গেলার কাহিনী কদাচিৎ শোনা যায়।

সাড়ে তিন মীটর দৈর্ঘ্যের একটি ময়াল দেহের পেঁচ দিয়ে যদি ঠিকমত কোন মানুষের হাত ও ঘাড় জড়িয়ে ধরতে পারে, তা' হলে সে মানুষ—যতই সে শক্তিশালী হ'ক না কেন—এককহাতে সে পেঁচ থেকে নিজেকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। মানুষটি মারা যাবে।

সাড়ে চার মীটর দীর্ঘ একটি ময়াল কয়েক মুহূর্তে একটি মানুষকে কাবু ক'রে তার শ্বাসরোধ করার ক্ষমতা রাখে।

কোন মানুষকে একটি ময়াল দেহের পেঁচ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। তার দেহ থেকে ময়ালটার পেঁচ খোলার কার্যকর উপায় কি? লেজের দিক্ দিয়েই ময়ালটার পেঁচ খোলার চেষ্টা করা উচিত।

নিম্নে দৈত্যাকার সাপ কর্তৃক মানুষকে আক্রমণের এমন কয়েকটি কাহিনী দেওয়া হ'ল যাদের সত্যতা অবিশ্বাস করার কারণ নেই।

আফ্রিকার কোন পাহাড়ের গুহায় রাতে দুজন জুলু আশ্রয় নিতে ঢুকেছিল। একটি আফ্রিকীয় পাহাড়ী ময়াল তার দেহের পেঁচ দিয়ে একজনকে জাপটিয়ে ধরে। তার সঙ্গী অবশ্য ছুরিকাঘাতে ময়ালটির দেহ খণ্ডিত ক'রে দেয়।

স্বনামখ্যাত সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় একটি ময়াল সাপ কর্তৃক একটি বালককে আক্রমণের ঘটনা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন। যশোহরের বন-বাদাড়ে এক ময়াল সাপকে গাদা বন্দুকের গুলি দিয়ে তিনি আঘাত করেন। আহত ময়াল বেগে যে পথ দিয়ে পালাচ্ছিল, সেই পথে জ্বরাক্রান্ত নিদ্রিত ১৫।১৬ বছরের একটি ছেলে শুয়েছিল। ময়াল তাঁর উরু কামড়ে "যেমন ব্যাং মুখে ক'রে চ'লে যায় সেভাবে ছেলেটাকে মুখে

ক'রে শূন্যে উঠে চলতে আরম্ভ করল।" ছেলেটি যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে ওঠে, আর সাপটাকে দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

সাপটিকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলা সম্ভব হয়। ছেলেটিও বেঁচে ওঠে। আহত হয়ে এবং বহু লোকের দ্বারা তাড়িত হয়ে সাপটা নিশ্চয়ই খুব ক্রুদ্ধ ছিল। সেজন্যেই পথে শায়িত ছেলেটির উরু কামড়ে ধরা তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়েছিল। সাপটি লম্বায় ২০৷২৫ হাত ছিল ব'লে লেখক মহাশয় অনুমানে বলেছেন। কিন্তু ভারতীয় ময়াল অত বড় হয় না ব'লেই ধারণা। ভীত-চকিত চোখে সাপটা বোধ হয় অত বড় মনে হয়েছিল।

অ্যাফ্রিকার কোন হ্রদের একটি ছোট নির্জন দ্বীপে এক নদীর ধারে কোন ধোপানী কাপড় কাচছিল। স্থানটা নির্জন ছিল। কিছুক্ষণ বাদে সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে দেখে, এখানে-ওখানে কাপড় প'ড়ে আছে, কিন্তু কোন ধোপা বা ধোপানী নেই। আশপাশে খোঁজ করতে সে দেখতে পেল, একটি অ্যাফ্রিকীয় পাহাড়ী ময়াল। আর তার দেহের পেঁচে রয়েছে ধোপানীর মৃতদেহ। তার ডাকে অন্যান্য লোক এসে সাপটাকে মেরে ফেলে। অ্যাফ্রিকীয় পাহাড়ী ময়ালটা দৈর্ঘ্যে ছিল ৪ মীটার ৩০ সেন্টিমীটার; তার দেহের বেড় ছিল প্রায় ৪০ সেন্টিমীটার। সাপটি ধোপানীকে গেলার উদ্দেশে আক্রমণ করেছিল কিনা বোঝা যায় নি। সাপটা তাকে তার দেহের পেঁচে জড়িয়ে ধরার আগে ধোপানী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কিনা, তাও জানা যায় নি।

দক্ষিণ আমেরিকায় একটি লোক নদীর সামান্য জলে নেমে তার গরুকে জল খাওয়াচ্ছিল। লোকটা জলে যখন দাঁড়িয়েছিল, একটা অ্যানাকণ্ডা তার পা জড়িয়ে ধ'রে তাকে জলের তলায় ডুবিয়ে মারে।

পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জের কোন দ্বীপে একটি চোদ্দ বছরের ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। একদল লোক ছেলেটিকে খুঁজতে খুঁজতে একটি

চিত্র-ময়াল দেখতে পেল। সাপটির দেহের একস্থান খুব ফুলে থাকায় তারা সাপটিকে কেটে ফেলল এবং ছেলেটির মৃতদেহ দেখতে পেল। চিত্র-ময়ালটার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫ মীটার ২৫ সেন্টিমীটার।

ঐ দ্বীপপুঞ্জেই অপর একটি চিত্র-ময়াল একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোককে গিলে খেয়েছিল। সাপটার দৈর্ঘ্য ছিল ৯ মীটার ২৫ সেন্টিমীটার।

হংকং-এর নিকট কোন দ্বীপে কোন চীনা শিশুকে একটি ভারতীয় ময়াল গিলেছিল।

নদীয়া জেলায় ২৭।২৮ বছর আগের একটি ঘটনার কথা শুনেছিলাম কোন ভদ্রলোকের মুখে। ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ সত্য, তা' তিনি জোর দিয়েই বলেছিলেন—এবং তাঁকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। নদীর ধারেই ছিল একটি পাঠশালা। ঠিক পাড় ঘেঁষে পাঠশালার একটি ঘর ছিল। ঘরটি ব্যবহার করা হ'ত না, ভাঙা-চোরা জিনিসপত্র ফেলে রাখা হ'ত। পাঠশালার একটি পড়ুয়া বড় দুষ্টুমি করছিল। পাঠশালার মৌলভী শিক্ষক ছেলেটিকে ঐ অন্ধকার ঘরে রেখে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, ছেলেটিকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর ছেলেটির চিৎকার শোনা যেতে লাগল। মৌলভী ভাবলেন, ছেলেটি বদমায়েসি ক'রে চিৎকার দিচ্ছে। তিনি সেদিকে আর মন দিলেন না। কিন্তু ছেলেটির চিৎকার আর থামে না। শেষ পর্যন্ত মৌলভী দরজা খুললেন। অন্ধকারে ছেলেটি তখন চিৎকার ক'রে বলল, আমাকে কিসে কামড়ে ধরেছে! মৌলভী তখন ছুটে গিয়ে আলো নিয়ে এসে দেখেন, একটি ময়াল সাপ ছেলেটির দেহের নিম্নাংশ অনেকটা গিলে ফেলেছে। সাপটিকে মারা হয়, কিন্তু ছেলেটিকে আর বাঁচান যায় না।

ময়ালটা নিশ্চয়ই নদীর জলে ভেসে এসে ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

এক কাষ্ঠব্যবসায়ী গিয়েছিল কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে বাঁকুড়ার কোন জঙ্গলে। সঙ্গে তার দুটি ছেলে ছিল—একটির বয়স ছিল ১২ বছর, অপরটির বয়স ছিল ৯ বছর। ছেলে দুটিকে জঙ্গলের একস্থানে রেখে কোন কাজে তাকে একটু দূরে যেতে হয়েছিল। ছেলে দুটি শ্রান্ত থাকায় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাজ সেরে ফিরে এসে তাদের বাবা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। একটি ময়াল ১২ বছরের ছেলেটির কোমর পর্যন্ত গিলে ফেলেছে, আর অপর একটি ময়াল ৯ বছরের ছেলেটির কাঁধ পর্যন্ত গিলে ফেলেছে! লোকজন এসে সাপ দুটিকে মেরে ফেলে। ছেলে দুটি কিন্তু বাঁচে নি। বাঁকুড়ার অধিবাসী এক শিক্ষক আমাকে কাহিনীটি বলেছিলেন। নিহত সাপ দুটিকে তিনি দেখেছিলেন।

ময়ালের উপপ্রজাতি

ভারতীয় ময়ালের দুটি উপপ্রজাতি আছে: (ক) গাঢ়বর্ণ ময়াল (মহাকালম্ ভারতীয়ম্ গাঢ়বর্ণম্) ও (খ) লঘুবর্ণ ময়াল (মহাকালম্ ভারতীয়ম্ লঘুবর্ণম্)।

গাঢ়বর্ণ ময়ালের রং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও গাঢ়; ময়ালের মাথায় যে বর্শাকার চিহ্ন থাকে, তা' সম্পূর্ণ অঙ্কিত থাকে; আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ও মোটা হয়; প্রকৃতিতেও এ সাপ অপেক্ষাকৃত উগ্র; সহজে বশ মানে না; ভারতের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে (বাংলা সমেত) পাওয়া যায়; ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীনেও পাওয়া যায়।

লঘুবর্ণ ময়ালের রং অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল ও ম্লান; মাথার বর্শাকার চিহ্নের মাত্র পশ্চাৎ-অংশ—দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্কিত থাকে, অবশিষ্ট অংশ থাকে অস্পষ্ট; মাথায়—বিশেষ ক'রে মাথার তলায় গোলাপী আভা থাকে; আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়; প্রকৃতিতে এ সাপ অপেক্ষাকৃত নিরীহ, সহজেই বশ হয়। ভারতের পশ্চিম

ও দক্ষিণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। সাপুড়েরা ও সার্কাসওলারা সাধারণতঃ এ সাপ নিয়েই খেলা দেখায়।

১৮৭ পৃষ্ঠার চিত্রে দৃষ্ট ময়াল সাপটির পেছনে ছোট একটি কাহিনী আছে। সাপটি এক সর্প-ব্যবসায়ীর—দেশে-বিদেশে সে সাপ চালান দিত। দেশে-বিদেশে বিক্রি করতে হ'ত ব'লে সাপগুলিকে তাকে খুব সতেজ রাখতে হ'ত—সাধারণ সাপুড়ের সাপ নয়। প্রয়োজনমত এ লোকটির সাপ আনিয়ে নিতাম। তখন আমি হাতেনাতে সাপের আলোচনা সবে শুরু করেছি। গ্রন্থের ভূমিকায় জনৈক ইংরেজ লেখকের যে প্রবন্ধের উল্লেখ করেছি, সেই প্রবন্ধের সঙ্গে উক্ত ভদ্রলোকের একটি ফোটোও প্রকাশিত হয়েছিল। ফোটোটিতে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর গলায় একটি ময়াল সাপ ঝোলানো আছে। ফোটোটি দেখে আমারও একটি অনুরূপ ফোটো তোলার রোখ চেপে গেছল। কিন্তু ঐ ফোটো তোলার ব্যাপারে যে সতর্কতার দরকার, সে সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম না। সর্প-ব্যবসায়ীর ময়ালটা মাত্র কিছুদিন আগে ধরা পড়েছিল। বাঁধা অবস্থায় সাপটা যতক্ষণ আমাদের বাড়িতে ছিল, সব সময় দেহ ফুলিয়ে ফুলিয়ে ফোঁসফোঁস করছিল। সেই ফোঁসফোঁসানি বহু দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। ময়ালটা ছিল গাঢ়বর্ণ উপপ্রজাতির। পথে-ঘাটে যারা গলায় ময়াল ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এসব ময়াল লঘুবর্ণ উপপ্রজাতির। তা' ছাড়া তারা সাপটাকে "পোষ" মানিয়ে নেয়। বন্য সম্ভধৃত গাঢ়বর্ণ উপপ্রজাতির একটি ময়ালকে কোন সতর্কতা না নিয়ে আমি গলায় ঝোলাতে গেছলাম! গলায় রেখেছি—ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে যাব—মনে হ'ল আমার গলা কে যেন চেপে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমি সাপটাকে গলা থেকে নামিয়ে ফেলতে সমর্থ হই। সাপটা লম্বায় প্রায় ৩ মীটর ছিল। সাপটাকে গলায় ঝোলাব বলাতে সর্প-ব্যবসায়ী লোকটি বেশ দ্বিধা দেখিয়েছিল; তা' আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

তবে বেশী পয়সার লোভে সে আমার কথায় সায় দেয়। সে অবশ্য খুব সতর্ক হয়ে আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

বৃক্ষবাসী সাপ

[ক] **চাবুক-সাপ গণ:** চাবুক-সাপ (উন্নসম্) পশ্চাৎ-বিষদন্তী: দেহ লম্বাটে ছিপছিপে এবং দু' পাশ একটু চেপটা; মাথা লম্বাটে, ঘাড় থেকে পৃথক্; নাসাগ্র দীর্ঘ; চোখ বড়, লেজ বড়; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত। বৃক্ষবাসী সাপ প্রধানতঃ গাছে ও ঝোপ-ঝাড়ে থাকে—অনায়াসে এবং খুব দ্রুতগতিতে ঝোপ-ঝাড়ে চলাফেরা করতে পারে; খাদ্যের সন্ধানে কখনও কখনও মাটিতে নামে। ক্ষিপ্র সাপ; দিনে বিচরণ করে; রাতে কদাচিৎ বের হয়; সব প্রজাতিই বাচ্চা দেয়।

চাবুক-সাপ গণে ৮টি প্রজাতি রয়েছে; ভারতে রয়েছে ৬টি। তিনটি প্রজাতির নাম: লাউডগা, বাদামী চাবুক-সাপ ও বিচিত্র চাবুক-সাপ।

চাবুক-সাপ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত) পাওয়া যায়। লেজটা চাবুকের মত ব'লে চাবুক-সাপ নাম।

লাউডগা

লাউডাঁটার মত দেখতে; তাই লাউডগা (উন্নসম্ সামান্যম্) নাম। গল্প শোনা যায়, লোকে লাউডাঁটা কাটতে গিয়ে লাউ-ডাঁটার সঙ্গে অজানতে এ সাপকেও কেটে ফেলেছে। একাধিক লাউডগা কখনও কখনও গাছ থেকে এমনভাবে ঝুলে থাকে, মনে হয় যেন সজনে-ডাঁটা ঝুলছে!

লাউডগার পিঠের রং জ্বলজ্বলে সবুজ; আঁশের জোড়মুখ কাল

ও সাদা—তাতে আঁকাবাঁক রেখা তৈরী হয়েছে: পেটের রং ম্লান সবুজ; পেটের দু' পাশে একটি ক'রে দুটি সরু সাদা বা হলদে বা নীলাভ রেখা থাকে। দেহ সরু ও ছিপছিপে। নাসাগ্র দীর্ঘায়ত মাংসল উপাঙ্গে শেষ হয়েছে: লাউডগার এই বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চোখ অপেক্ষাকৃত বড়। তারা এড়োভাবে লম্বাকার; তারার চারপাশ সোনালী। লেজ বেশ বড়; কখনও কখনও সমগ্র দেহের এক-তৃতীয়াংশেরও ওপর হয়। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

কোন কোন লাউডগা বাদামী রঙেরও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ নীলাভ রঙের একটি লাউডগা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। দৈর্ঘ্যে লাউডগা ১ মীটর ৯৫ সেন্টিমীটর হয়।

লাউডগা সাধারণতঃ ঝোপে-ঝাড়ে থাকে। তাল-নারকেল গাছের মাথায়ও এ সাপ ওঠে। ঝোপে-ঝাড়ে যখন থাকে চট্ ক'রে এ সাপকে দেখতে পাওয়া যায় না—গাছের সবুজ ডালের সঙ্গে মিশে থাকে। এ কারণে লাউডগার পক্ষে শিকার ধরা সহজ হয়। শত্রুও সহজে তার খোঁজ পায় না। ঝোপ-ঝাড়ে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলাফেরা করে। লাউডগা দিনে বিচরণ করে।

লাউডগার প্রধান খাদ্য—গিরিগিটি, নেংটি ইঁদুর ও পাখির বাচ্চা। কখনও কখনও ভেক—এমন কি ছোট সাপও খায়। লাউডগা তার শিকারকে কামড়ে ধ'রে থাকে যতক্ষণ না তার প্রাণশক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়, তারপর তাকে গিলতে আরম্ভ করে।

লাউডগা পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। মানুষকে দংশন করলে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। দংশনে পশ্চাৎ-বিষদাঁত অংশ গ্রহণ করলে যন্ত্রণা হয়, ক্ষতস্থান সামান্য ফুলে উঠতে পারে; কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই সেই ফুলো সেরে যায়।

সাপুড়েরা লাউডগা সাপ দেখিয়ে বলে, এ সাপের এত বিষ যে সে বিষে গা সবুজ হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, একথা ঠিক নয়।

লাউডগা নির্ভীক প্রকৃতির সাপ। ধরলে কদাচিৎ পালাতে চেষ্টা করে। তবে দংশন করতে পারে। দংশন করার সময় এ সাপের দৃষ্টি সাধারণতঃ মানুষের চোখের দিকে থাকে। অনেক সময় চোখ লক্ষ ক'রে হাঁ ক'রে তেড়ে আসে। তেমন-তেমন ত্যক্ত হলে লাউডগার ভয় দেখানোর ধরন লক্ষণীয়। ফুসফুসে বাতাস টেনে নিয়ে দেহ ফুলিয়ে নিজের ভোল বদলিয়ে ফেলে। আঁশের জোড়মুখের সাদা ও কাল রং ফুটে ওঠে, আর সবুজ

লাউডগা

আঁশগুলো পরস্পর থেকে স'রে যাওয়াতে এক একটি আঁশ এক একটি পান্নার মত মনে হয়। আকস্মিক চেহারার এই ভোলেও শত্রু যদি ভীত না হয়, তখন লাউডগা বড় হাঁ করে। দেহের কাল রং গলার ভেতর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে—মনে হয় সমস্ত মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। এ সত্ত্বেও শত্রু

যদি তার দিকে এগিয়ে আসে, লাউডগা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। শত্রু কাছাকাছি এলে লাউডগা তার চোখ লক্ষ ক'রে ছুটে যায়।

লাউডগা তিনটে থেকে বাইশটা বাচ্চা দেয়। বন্দী একটি লাউডগা প্রায় ছ' মাস পরে ৯টি বাচ্চা দেয়। বাচ্চাগুলি বেশ সতেজ ছিল। এই ছ' মাসে কোন পুরুষ সাপের সঙ্গে তার মিলন ঘটে নি।

ভারতের প্রায় সর্বত্র লাউডগা পাওয়া যায়। ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে লাউডগা কম দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও থাইরাজ্যেও লাউডগা দেখা যায়। সমুদ্র-পৃষ্ঠের ২ কিলোমীটর উঁচু পাহাড়েও এ সাপ দেখা যায়।

টিয়ার ঠোঁটের মত উদ্গত অংশ আছে ব'লে লাউডগার অপর একটি নাম টিয়াঠুঁটি (খুলনা)।

এড়োভাবে লম্বাকার তারা, দীর্ঘায়ত নাসাগ্রের শেষে মাংসল উপাঙ্গ এবং পেটের ছ' পাশে রেখা দেখে লাউডগা সহজেই চেনা যায়।

বাদামী চাবুক-সাপ

বাদামী চাবুক-সাপ (উন্নসম্ পীতধূসরম্) লাউডগারই মত, তবে এর দেহের রং বাদামী—প্রধান রঙের ওপর কালচে এড়ো দাগ। মাথার ওপর গাঢ় বাদামী রঙের বিষমকোণী সমচতুর্ভুজাকার চিহ্ন এবং প্রতি চোখ বরাবর একটি ক'রে বাদামী রেখা থাকে। লাউডগার পেটের ছ' পাশে যে রেখা থাকে, এ সাপের তা' থাকে না। দৈর্ঘ্য ১ মীটর ৭৫ সেন্টিমীটর।

দক্ষিণ ভারতে এ সাপ পাওয়া যায়। সিংহলেও পাওয়া যায়।

বিচিত্র চাবুক-সাপ

বিচিত্র চাবুক-সাপের (উন্নসম্ আহরিতম্) নাসাগ্র ছুঁচলো বটে, তবে লাউডগার মত মাংসল উপাঙ্গে শেষ হয় নি।

পিঠের রং সবুজ, পাঁশুটে, হলদে বা হলদেটে। আঁশের জোড়মুখ কাল ও সাদা—তাতে আঁকাবাঁকা রেখা তৈরী হয়েছে; পেটের রং পিঠের রঙেরই মত, তবে ম্লান; কোনটায় কোনটায় পেটের দু' পাশে সাদা বা হলদে রঙের রেখা থাকে। দৈর্ঘ্য ১ মীটর ৫৫ সেন্টিমীটর। সিকিম ও পশ্চিম-বঙ্গে (জলপাইগুড়ি) পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও দেখা যায়।

খুব শান্ত প্রকৃতির সাপ। ধরলে পালায় না। লাউডগা কখনও কখনও জিবটা বের ক'রে নিশ্চলভাবে রেখে প'ড়ে থাকে; এভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকে। বিচিত্র চাবুক-সাপেরও এ স্বভাব আছে।

[খ] হেমাভ-সাপ গণঃ হেমাভ-সাপ (হেমাভম্) পশ্চাৎ-বিষদন্তী; দেহ লম্বাটে ছিপছিপে; মাথা ঘাড় থেকে পৃথক্; চোখ অপেক্ষাকৃত বড়, তারা গোল; লেজ বড়; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত। বৃক্ষবাসী সাপ।

হেমাভ-সাপ গণে ৫টি প্রজাতি আছে; ভারতে রয়েছে ২টি —কালনাগিনী ও অন্য-হেমাভ-সাপ।

হেমাভ-সাপ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত) পাওয়া যায়।

কমবেশী সোনালী চিত্র-বিচিত্র করা ব'লে হেমাভ-সাপ নাম।

কালনাগিনী

কালনাগিনী নাম শুনলেই আমরা আঁতকে উঠি। ভাবি বুঝি, কি মারাত্মক বিষধর সাপ! আসলে কিন্তু কালনাগিনী পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। কালনাগিনী বলতে অবশ্য কেউ কেউ কাল-

কেউটে বা কালাচ সাপ বুঝে থাকে। সেক্ষেত্রে আলাদা। কাল-কেউটে বা কালাচ মারাত্মক বিষধর সাপ।

কালনাগিনীর দেহের রং বড় সুন্দর, বিচিত্রও বটে। চিত্র-বিচিত্র রং দেখে সাপটাকে চেনা যায়। পিঠের রং সবজেটে-হলদে বা ম্লান সবুজ—তার ওপর কমবেশী স্পষ্ট কাল এড়ো রেখা। কোনটা কোনটার আঁশে কালোর ছিট থাকে। কোনটা কোনটায় আবার পিঠের মাঝ বরাবর এবং দুটি এড়ো রেখার মধ্যবর্তী স্থানে লাল বা নারঙ্গ রঙের চার পাপড়ির পুষ্পাকৃতি চিহ্ন থাকে; মাথা কাল—তার ওপর হলদে রঙের এড়ো রেখা

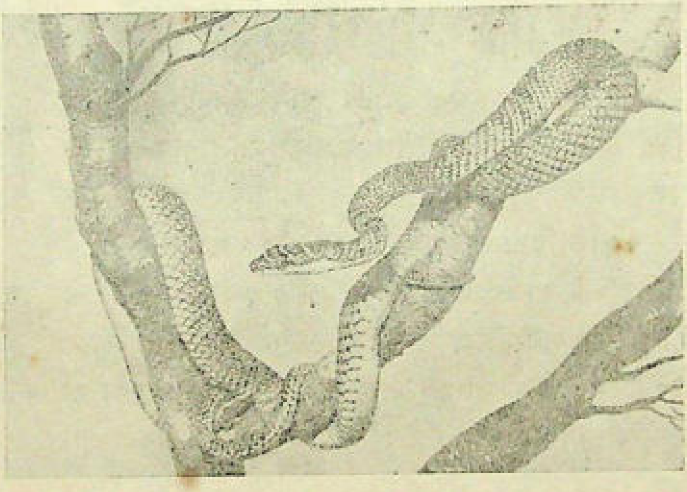

কালনাগিনী

ও ফুটকি; পেটের রং সবজেটে। দেহ লম্বা, ছিপছিপে। তত মোটা না হলেও বেশ বলিষ্ঠ সাপ। মাথা ঘাড় থেকে পৃথক্: চোখ বড়, তারা গোল। লেজ বড়; সমগ্র দেহের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ও পার্শ্বে শির-করা; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

শৈশবাবস্থায় কালনাগিনীর দেহের রঙে পার্থক্য দেখা যায়।

তখন তার পিঠের রং থাকে কাল—তার ওপর ম্লান সবজেটে-হলদে রঙের সরু এড়ো রেখা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ রঙের বিস্তৃতি ঘটে। দৈর্ঘ্যে কালনাগিনী দেড় মীটর পর্যন্ত হয়।

ঝোপে-ঝাড়ে থাকে; ঘাসের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখা যায়। অঙ্কতল-আঁশের দু' পাশ শির-করা থাকায় খাড়া গাছ বা দেয়াল বেয়ে কালনাগিনী সহজেই উঠতে পারে। বাড়ির কানিসে বা অনুরূপ কোনস্থানে ঘুরতে-ফিরতে দেখা যায়। কালনাগিনী সাধারণতঃ দিনে বিচরণ করে। গরমের দিনে প্রখর রৌদ্র-তাপেও এ সাপ স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। খুব ক্ষিপ্র সাপ। কালনাগিনী উড়ুক্কু সাপ। এক গাছ থেকে আর এক গাছে অথবা মাটিতে বাতাসে ভেসে যায়। এক গাছ থেকে দু' মীটর দূর অপর এক গাছে কালনাগিনী উড়ে যায়। কোন বাড়ির জানালা থেকে প্রায় আড়াই মীটর দূরে অবস্থিত গাছের ডালে একটি কালনাগিনী উড়ে গেছল। ঐ গাছে গিয়ে মুহূর্তেই সে বেশ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে থাকে।

গিরগিটি-আদি প্রাণী কালনাগিনীর প্রধান খাদ্য। এই খাদ্যের সন্ধানে কালনাগিনীকে বসতবাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়। কালনাগিনী সংপীড়ক সাপ—শিকারকে নিজের দেহ দিয়ে জড়িয়ে পিষে মারে। গিরগিটি-টিকটিকি ছাড়া কালনাগিনী পাখি, ছোট স্তন্যপ, ছোট সাপও খেয়ে থাকে। পোকা-মাকড়ও খায়।

কালনাগিনী নির্ভীক প্রকৃতির সাপ। ত্যক্ত হলে না পালিয়ে দংশন করার প্রবণতাই দেখা যায়। পশ্চাৎ-বিষদন্তী হওয়ায় কালনাগিনীর দংশনে লাউডগার মতই লক্ষণ দেখা যায়।

কালনাগিনী ছটা থেকে বারটা লম্বা ধরনের ডিম পাড়ে।

পশ্চিম-ঘাট পর্বতে, আসামে ও বাংলায় কালনাগিনী দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলেও পাওয়া যায়; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কালনাগিনী একটি সাধারণ সাপ।

বেহুলার স্বামী লখিন্দরকে লোহার তৈরী বাসর-ঘরে সাপে দংশন করেছিল। সাপুড়েরা বলে, এই কালনাগিনীই লখিন্দরকে দংশন করেছিল। তারা গল্প করে, বেহুলা শাঁখা-সিঁদুর-চিরুনি ছুঁড়ে মেরেছিলেন এ সাপকে। তার চিহ্ন আজও এর গায়ে রয়ে গেছে। শাঁখার রং সাদা (হলদে), সিঁদুরের রং লাল আর চিরুনির রং কাল—এ সব রংই কালনাগিনীর গায়ে দেখা যায়।

কালনাগিনী উদয়কাল নামেও পরিচিত। উদয়কাল অর্থাৎ যার কাল উদয় হয়েছে, মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। কালনাগিনী মারাত্মক বিষধর সাপ ব'লে মনে করায় বোধ হয় এই নাম। সূর্যোদয়ের সময় যেমন সুন্দর আভা দেখা যায়, এ সাপের গায়ের রং তেমনি সুন্দর। সেজন্যেও উদয়কাল নাম হতে পারে। রামধনু সাপ (চট্টগ্রাম) বলতে বোধ হয় কালনাগিনীকে বুঝয়। কাল ব'লে কোথাও কোথাও কালনাগিনী কালিন্দী নামেও পরিচিত।

অন্ধ-হেমাভ-সাপ

অন্ধ-হেমাভ-সাপের (হেমাভম্ অন্ধম্) পিঠের রং কাল—প্রত্যেক আঁশের মধ্যস্থলে গোলাকার বা ডিম্বাকার তীক্ষ্ণাগ্র সবজেটে-হলদে চিহ্ন থাকে ; কোনটায় কোনটায় কালনাগিনীর মত পিঠের মাঝ বরাবর এবং দুটি এড়ো রেখার মধ্যবর্তী স্থানে লাল বা নারঙ্গ রঙের চার পাপড়ির পুষ্পাকৃতি চিহ্ন থাকে। পেটের রং ম্লান সবজেটে-হলদে।

এ সাপ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। তা' ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও (পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ সমেত) পাওয়া যায়।

[গ] **বৈড়াল-সাপ গণ :** বৈড়াল-সাপ (বৈড়ালম্) পশ্চাৎ-বিষদন্তী ; দেহ কমবেশী দু' পাশে চেপটা ; মাথা চেপটা এবং কতকটা তেকোনা, ঘাড় থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক্—কতকটা বোড়ার মত। চোখ বড়, তারা খাড়া ; লেজ বড়, অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত। বৃক্ষবাসী

সাপ—ঝোপে-ঝাড়ে থাকতে ভালবাসে। চাবুক-সাপ, হেমাভ-সাপ ও ব্রঞ্জপৃষ্ঠ-সাপ গাছের ডালে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে—সাধারণতঃ সাপ যেমন থাকে ; কিন্তু বৈড়াল-সাপ বিশ্রামরত অবস্থায় গাছের ডালে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে ; প্রকৃতি উগ্র—ত্যক্ত হলে লেজ নাড়তে থাকে ; প্রধানতঃ রাতে চলাফেরা করে ; সংপীড়ক সাপ ; যতদূর জানা গেছে, সমস্ত প্রজাতি ডিম দেয়।

বৈড়াল গণে কমবেশী ২৫টি প্রজাতি আছে ; ভারতে পাওয়া যায় ১০টি। ছুটি প্রজাতির নাম—কাঁড় সাপ ও পূর্বাঞ্চলীয় বৈড়াল-সাপ।

দক্ষিণ এশিয়া, উষ্ণপ্রধান অ্যাফ্রিকা ও উষ্ণপ্রধান অস্ট্রেলিয়ায় বৈড়াল-সাপ পাওয়া যায়।

চোখের তারা বিড়ালের মত খাড়া ; তাই বৈড়াল-সাপ নাম।

কাঁড় সাপ

কাঁড় (বৈড়ালম্ সামান্যম্) উগ্র প্রকৃতির পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। সামান্য ত্যক্ত হলেই উগ্র মূর্তি ধারণ করে। এই উগ্র মূর্তি ধারণের বৈশিষ্ট্য আছে। দেহের অগ্রভাগ ৪-এর আকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথাটা তার মধ্যস্থলে নিয়ে ভূমি থেকে তুলে ধরে, লেজও নাড়তে থাকে ; আঘাত করার আগে দেহ ফোলাতে থাকে ; বড় হাঁ ক'রে জোরের সঙ্গে দংশন করে ; আঘাত ক'রে সাপটি তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে, পুনরায় আবার আঘাত করে, বারবার আঘাত করে। সামান্য ত্যক্ত হলেই কাঁড় তার শত্রুকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করে। গল্প প্রচলিত আছে, শত্রুর চিতার ধোঁয়া না দেখা পর্যন্ত কাঁড় সেখান থেকে নড়ে না।

কাঁড় সাপের পিঠের রং অল্প হলদে-বাদামী বা বালি রঙের—প্রধান রঙের ওপর কমবেশী স্পষ্টভাবে ৭-আকারের চিহ্ন থাকে—এই চিহ্ন লেজের দিকে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যায় ; চিহ্নটির ছুটি

বাহুর মধ্যবর্তী স্থান সাদাটে ; মাথাতে অল্প বাদামী বা হলদেটে চিহ্ন থাকে ; পেটের রং সাদাটে—কোনটা কোনটার ছ' প্রান্তে ছোট কাল ফুটকি থাকে ; দেহ শীর্ণ ও লম্বাটে—মাঝখানটা মোটা, লেজ বড় এবং ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। চোখ বড় ; তারা খাড়া, তারার চারপাশ সোনালী। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত। দৈর্ঘ্যে কাঁড় সাপ প্রায় ১ মীটর হয়।

কাঁড় বৃক্ষবাসী সাপ—ঝোপে-ঝাড়ে সাধারণতঃ থাকে। বড় বড় গাছে সহজেই উঠতে পারে। পুরোতন বাড়ির আশপাশেও দেখা যায়। কাঁড় যেমন উগ্র, তেমনি ক্ষিপ্র। সাধারণতঃ রাতে চলাফেরা করে। কাঁড় সাধারণতঃ গিরগিটি-আদি প্রাণী খায়—তবে ছোট পাখি ও স্তন্যপ বাদ যায় না। কাঁড় সংপীড়ক সাপ—শিকারকে দেহের পেঁচ দিয়ে জড়িয়ে হত্যা করে।

কাঁড় তিনটি থেকে এগারটি ডিম পাড়ে। ভারতের প্রায় সর্বত্র কাঁড় সাপ পাওয়া যায় ; পাকিস্তান ও সিংহলেও দেখা যায়।

ফুরসার সঙ্গে কাঁড় সাপের অনেক সময় গণ্ডগোল হয়। তবে কাঁড়ের মাথায় ঢাল থাকে, ফুরসার মাথায় ছোট আঁশ থাকে।

কাঁড় কাণ্ডেশ্বর (মেদিনীপুর) নামেও পরিচিত। ইটালচাঁপা বলতে বোধ হয় এ সাপকেই বুঝয়। বঙ্করাজ এ সাপেরই নাম ; বাঁকা মলকে বঙ্করাজ বলে। সুতলী বা সুতানলী (ঢাকা) এ সাপকেই বলে ব'লে মনে হয় ; সুতলী কথার অর্থ সরু দড়ি।

পুর্বাঞ্চলীয় বৈড়াল-সাপ

পুর্বাঞ্চলীয় বৈড়াল-সাপের (বৈড়ালম্ বিশেষম্) পিঠের রং হলদেটে-বাদামী—পিঠের মাঝ বরাবর একটি হালকা রেখা থাকে—ছ' পাশে Y বা T আকারের সারিবদ্ধ রেখা দেহ বরাবর থাকে ; মাথায় বাদামী রঙের তীর—একটি এড়োরেখা দিয়ে বিভক্ত ; পেটের রং সাদাটে—ছ' প্রান্তে থাকে বাদামী বা কাল ফুটকি।

প্রকৃতিতে কাঁড়ের মত। ভারতের পূর্বাংশে—বিশেষ ক'রে ডুয়ার অঞ্চলে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৫ সেন্টিমীটর।

[ঘ] ব্রঞ্জপৃষ্ঠ-সাপ গণ: ব্রঞ্জপৃষ্ঠ (ব্রঞ্জপৃষ্ঠম্) বিষহীন সাপ। মাথা ঘাড় থেকে পৃথক্; চোখ বড়, তারা গোল; লেজ লম্বা; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত; অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ও শির-করা।

বৃক্ষবাসী সাপ; ঝোপে ও গাছে বাস করে—মাত্র খাদ্যের সন্ধানে মাটিতে নামে; ঝোপে-ঝাড়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলাফেরা করে; দিনে শিকারে বেরয়। প্রধানতঃ ভেক ও গিরগিটি-আদি প্রাণী খায়—তবে মণ্ডূক ও পোকা-মাকড়ও খেয়ে থাকে। একবারে তিনটি থেকে পাঁচটি লম্বা ধরনের ডিম দেয়।

ব্রঞ্জপৃষ্ঠ গণে কমবেশী ৮টি প্রজাতি আছে; ৭টি রয়েছে ভারতে। দুটি প্রজাতির নাম—সোনালী-বেতআছড়া ও বেতআছড়া।

ব্রঞ্জপৃষ্ঠ-সাপ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়।

সোনালী-বেতআছড়া

সোনালী-বেতআছড়া (ব্রঞ্জপৃষ্ঠম্ ভারতীয়ম্) দেখতে মনোরম সাপ। পিঠ ব্রঞ্জ রঙের; পিঠের প্রত্যেকটি আঁশের ধার নীলাভ-কাল; মাথা থেকে লেজের গোড়ার কাছাকাছি পিঠ বরাবর সাধারণতঃ কাল একটা রেখা থাকে; কোনটা কোনটার পিঠের রং নীলাভ কাল—আর দু'পাশে একটি ক'রে দুটি অল্প হলদে রঙের রেখা থাকে; ওপর ঠোঁট হলদে; পেট হলদেটে বা সবজেটে। দেহ সরু ও ছিপছিপে; লেজ বড়—সমগ্র দেহের এক-তৃতীয়াংশ। নাসাগ্র লম্বা ও গোলাকার; পিঠের মাঝ বরাবর আঁশ বড়; অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ও শির-করা। দৈর্ঘ্য ১ মীটর ৩০ সেন্টিমীটর।

সোনালী-বেতআছড়া প্রধানতঃ ঝোপে ও গাছে বাস করে;

ধানক্ষেতের আশপাশে দেখা যায়; ডালপালা নেই এমন গাছেও এ সাপ দ্রুতগতিতে ওঠে। গাছে স্থির হয়ে যখন থাকে, মনে হয় যেন একটা ডাল। সোনালী-বেতআছড়া শুকনো ডালপালার ওপর সাধারণতঃ শুয়ে থাকে; সেজন্যে চট্ ক'রে চেনা যায় না। প্রধানতঃ দিনে চলাফেরা করে।

সোনালী-বেতআছড়ার প্রধান খাদ্য ভেক ও গিরগিটি-আদি প্রাণী। বিষহীন সাপ। ভীরু প্রকৃতিরও বটে—তবে কখনও কখনও দংশন করে। সোনালী-বেতআছড়া ডিম পাড়ে।

সোনালী-বেতআছড়া দক্ষিণ ভারত, আসাম ও বাংলাদেশে (দার্জিলিং) দেখা যায়। সিংহলেও এ সাপ পাওয়া যায়।

পিঠের মাঝ বরাবর আঁশ বড় এবং অঙ্কতল-আঁশ দু' পাশে শির-করা—সোনালী-বেতআছড়ার এ দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

বেতআছড়া

সরু ছিপছিপে দেহ নিয়ে বুঝি শত্রুর ওপর লাফিয়ে পড়ে; তাই বেতআছড়া (ব্রঞ্জপৃষ্ঠম্ বিশেষম্) নাম। এই লাফিয়ে পড়া কিন্তু আক্রমণাত্মক নয়। ভয়ে এদিক্-ওদিক্ পালাতে যায়, তাতেই গায়ে এসে পড়ে। ভীত অজ্ঞ লোকে ভাবে, সাপটা বুঝি দংশন করতেই লাফিয়ে এসেছে। বেতছড়ার মত দেখতে। তা' থেকেও বেতআছড়া নাম হতে পারে। বেকায়দায় পড়লে কখনও কখনও হাতে-পায়ে জড়িয়ে ধরে।

পিঠের রং ব্রঞ্জ-বাদামী······পিঙ্গল; প্রধান রঙের দু' পাশে মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত একটি কাল রেখা ও একটি হলদে রেখা থাকে; মুখের দু' পাশ হলদে; পেট হলদেটে বা সবুজ; দেহ ফুলালে পিঠের আঁশে নীল ও কাল রং ফুটে ওঠে। লেজ বড়—সমগ্র দেহের এক-তৃতীয়াংশ বা তারও ওপর। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ও শির-করা; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

বেতআছড়ার প্রকারভেদ আছে। দৈর্ঘ্য ১ মীটর ২৫ সেন্টিমীটর। সাধারণতঃ ভেক খায়। ভীরু প্রকৃতির বিষহীন সাপ। বেত-আছড়া উড্ডুক্কু সাপ—এক গাছ থেকে নিকটের আর এক গাছে উড়ে যায়। তাল-সুপারির আগা থেকে বেতআছড়া বাতাসে ভেসে একদম মাটিতে নেমে আসতে পারে।

বাংলা, পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল, দক্ষিণ ভারত ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়; ইন্দোচীন ও দক্ষিণ চীনে এ সাপ পাওয়া যায়।

লোকে বলে, বেতআছড়া গোল চাকার মত হয়ে মানুষের পেছু-পেছু ছোটে। একথা ঠিক নয়। বেতআছড়া গাছের ডালে চটপট চলতে পারলেও মাটিতে ভালভাবে চলতে পারে না। মাটিতে ভালভাবে চলতে পারে না ব'লেই এ গল্পের সৃষ্টি।

বেতআছড়া বেতেড়া (হাওড়া, হুগলী) নামেও পরিচিত; কেউ কেউ বলে, বেতিয়া বা বেতি। অপর নাম তেশিরাপোড়া (বরিশাল); দেহের ওপর তিন রঙের তিনটি রেখা থাকায় বোধ হয় তেশিরাপোড়া নাম। জিংলাপোড়াও (ময়মনসিংহ) নাম; জিংলা শব্দের অর্থ বাঁশের কঞ্চি। লাউডুগিও (ময়মনসিংহ) বলে। এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে চ'লে ব'লে ফড়িঙ্গেপোড়া (ঢাকা, বরিশাল) নাম। উড়িয়া-বুড়িয়া (ঢাকা) ও উড়কাবোড়াও (চট্টগ্রাম) বলে। কানসারা (মেদিনীপুর) বলতে বোধ হয় বেতআছড়াকে বুঝয়। তালগাছে থাকে, তাই তালছড়া নাম। কোথাও বলে আইড়ালবাঁকা।

জলবাসী সাপ

কর্দম-সাপ গণ: কর্দম-সাপ (কর্দম্) পশ্চাৎ-বিষদন্তী; দেহ বেলনাকার; মাথা কতকটা চেপটা, ঘাড় থেকে স্পষ্ট নয়; চোখ ছোট, তারা খাড়া; মাথার আঁশ বড়, অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

কর্দম-সাপ গণে কমবেশী ১৬টি প্রজাতি আছে। ভারতে রয়েছে ২টি—মেটেলি সাপ ও ইনী সাপ।

দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ চীন, তাইওয়ান ও অস্ট্রেলীয় দ্বীপপুঞ্জে কর্দম-সাপ পাওয়া যায়। জলে-কাদায় থাকে ব'লে কর্দম-সাপ নাম।

মেটেলি সাপ

পুকুরে স্নানার্থীদের পায়ে অনেক সময় জড়িয়ে ধরে। কখনও কখনও মুখটা বের ক'রে জলে ভেসে থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা, মেটেলি সাপ (কর্দম্ সামান্যম্) বিষহীন। আসলে কিন্তু পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। মানুষকে দংশন করলে তেমন ক্ষতি হয় না, মানুষকে দংশনও কদাচিৎ করে। হাঁস-মুরগীকে কামড়ালে ম'রে যায়। মেটেলি জলের সাপ ; কদাচিৎ জলাশয়ের পাড়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

মেটেলির পিঠের রং হলদেটে বা সবজেটে—প্রধান রঙের ওপর হলদেটে এড়ো রেখা ; দেহের তু' পাশে থাকে আঁকাবাঁকা রেখা ; পেটের রং সাদা—তার ওপর কাল চিত্র-বিচিত্র করা। দেহ বেলনাকার, বলিষ্ঠ ; দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মীটর। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়।

গায়ের রং মেটে মেটে ; সেজন্যে মেটে বা মেটেলি সাপ নাম। অন্যান্য নাম—গ্যাং-কেরালি (চব্বিশ-পরগনা), মেছেতো সাপ, ধূসরে সাপ (যশোহর), ক্রে (হাওড়া)। কোথাও বলে মাটি-শিঙি। কুঁচে সাপ বলতে বোধ হয় এ সাপকে বুঝয়।

ইনী সাপ

ইনী (কর্দম্ অপরম্) বাচ্চা দেয়—ছটি থেকে আঠারটি বাচ্চা দেয়। নাড়াচাড়া করার সময় ইনীর পেট থেকে বাচ্চা বের হয়ে

পড়েছে, তার নজির আছে। গাঁয়ের বালকেরা পূর্ণগর্ভা ইনী সাপ দেখলে কখনও কখনও তার ওপর গোবর চাপা দিয়ে দেয়। তাতেও পেট থেকে জীবন্ত বাচ্চা বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে বাচ্চাগুলি বেশ চলাফেরা করে। এরূপ ঘটনা থেকেই বোধ হয় এ সাপের নাম ইনী হয়েছে; ইনী কথাটি এসেছে কামিনী থেকে।

ইনী সাপের পিঠের রং জলপাই-সবুজ বা জলপাই-বাদামী—অনেক সময় দেহের দু' পাশে একটি ক'রে হলদেটে রেখা থাকে; পেটের রং কমলালেবু রঙের—দু' ধারে একটি ক'রে গাঢ় রেখা থাকে। দেহ বেলনাকার, বলিষ্ঠ; নাসারন্ধ্র এড়োভাবে চেরা এবং মাথার ওপর দিকে অবস্থিত; চোখ ছোট, তারা খাড়া উপবৃত্তাকার; তারার চারপাশ সোনালী হলদে; আঁশ মসৃণ। দৈর্ঘ্য ৮০ সেন্টিমীটর।

ইনী জলের সাপ। নদী-নালা খাল-বিলে এ সাপ দেখা যায়। জলাশয়ের পাড়েও কদাচিৎ ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ডাঙাতে ভালভাবে চলতে পারে না—নড়বড় ক'রে চলে।

পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ইনী সাপ দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ইনী সাপ পাওয়া যায়।

ইনী পশ্চাৎ-বিষদন্তী নিরীহ প্রকৃতির সাপ। মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে।

মেটিয়া সাপ, মেটেবোড়া, মেটেলি সাপ নামেও ইনী পরিচিত।

কুজপৃষ্ঠ সাপ

জলাসাপ গণ: জলাসাপ (নারব্যালম্) বিষহীন সাপ; দেহ কমবেশী লম্বাটে ও বেলনাকার; মাথা সাধারণতঃ ঘাড় থেকে পৃথক্; পিঠের আঁশ কমবেশী শির-করা; অবপুচ্ছ-আঁশ সাধারণতঃ বিভক্ত। কমবেশী জলবাসী সাপ।

জলাসাপ গণের কমবেশী ৮০টি প্রজাতি আছে ; ১২টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়। জলঢোঁড়া ও হেলে উল্লেখ্য।

এশিয়া, ইওরোপ, অ্যাফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় এ সাপ পাওয়া যায়। জলের আশপাশে থাকে ব'লে জলাসাপ নাম।

জলঢোঁড়া

জলঢোঁড়া (নারব্যালম্ মীনখাদকম্ মীনখাদকম্) ভারতের একটি সাধারণ সাপ ; বর্ষাঋতুতে প্রচুর দেখা যায়। জলঢোঁড়ার পিঠের রং-এ বৈচিত্র্য আছে—হলদে থেকে অতি গাঢ় জলপাই-বাদামী রঙের হয়ে থাকে—তার ওপর চারকোনা কাল দাগের সারি জালের মত ; মাথার রং জলপাই-বাদামী—মাথার তু' পাশে তুটি ক'রে আঁকাবাঁকা কাল রেখা—একটি রেখা চোখের পেছনে, অপরটি নীচের দিকে থাকে ; পেটের রং সাদাটে বা হলদেটে। শির-করা হওয়াতে কখনও কখনও পিঠের আঁশ এবড়ো-খেবড়ো হয়। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

জলঢোঁড়ার দেহ মোটা ; লেজ লম্বা—দেহের $\frac{1}{4}$ থেকে $\frac{1}{5}$ অংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে ; চোখের তারা গোল, তারার চারপাশ সবজেটে-সোনালী ; নাসারন্ধ্র মাথার ওপর দিকে থাকে ; দৈর্ঘ্য ১ মীটর ২০ সেন্টিমীটর।

পুকুর, নদী, ধানক্ষেতের আশপাশে জলঢোঁড়া দেখা যায়। সমতল ভূমিরই সাপ ; পার্বত্য অঞ্চলে কম উচ্চতাতেও দেখা যায়। জলঢোঁড়া দিনে চলাফেরা করে। খুব ক্ষিপ্র সাপ। জল থেকে এ সাপ বেশী দূর যায় না। সাঁতার কাটতে খুব ওস্তাদ। জলে নেমে মাছ ধরে। প্রধানতঃ ভেকই খায়। ব্যাংকে এ সাপ দেহ দিয়ে পাকিয়ে মারে না—কামড়ে ধ'রে সোজাসুজি গিলতে থাকে। ব্যাংও চিৎকার করতে থাকে।

জলঢোঁড়া অতি উগ্র প্রকৃতির সাপ। সাধারণতঃ খুব দ্রুত এবং জোরের সঙ্গে দংশন করে। কখনও কখনও পা বা হাতের আঙুল এমন জোরে কামড়ে ধরে যে ছাড়াতে বেশ অসুবিধা হয়। আঘাত করার সময় এ সাপ অনেক সময় চক্রধর সাপের মত কতকটা মাথা উঁচু করে। ক্রুদ্ধ জলঢোঁড়া কখনও কখনও মাটি থেকে লাফিয়েও দংশন করে। বন্দী অবস্থায় প্রথম প্রথম উগ্র থাকলেও ক্রমে ক্রমে নিরীহ হয়ে পড়ে।

জলঢোঁড়া বিষহীন সাপ। আমাদের দেশে মাঠে-ঘাটে জলঢোঁড়ার দংশন প্রায়ই ঘটে। দংশনের ধরন দেখে অনেকে একে চক্রধর সাপ ব'লে ভুল করে। সে হিসাবে দংশনে ভীতও হয়। অনেকের আবার ভুল ধারণা আছে, জলঢোঁড়া বুঝি বিষধর সাপ। জনশ্রুতি আছে, জলঢোঁড়া বিষহীন সাপ বটে, তবে এর দংশনের পর দষ্ট ব্যক্তি যদি গোবর মাড়ায়, তা' হলে ঐ ক্ষতে বিষ সঞ্চারিত হয়। এই জনশ্রুতি যে অলীক, তা' বলাই বাহুল্য। জলঢোঁড়ার দংশনে কেন, যে কোনও সাপের দংশনে—যে কোন জীবজন্তুর দংশনে ক্ষতস্থানে যদি গোবর বা অনুরূপ কোন ময়লা লাগে, তা' হলে ঐ ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে পড়তে পারে। গোবর বা অনুরূপ ময়লায় অপকারী জীবাণু থাকায় এরূপ হয়। তবে জলঢোঁড়া সম্বন্ধেই যে এরূপ জনশ্রুতির সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ জলঢোঁড়ার দংশন আমাদের দেশে প্রায়ই ঘটে থাকে এবং তার দংশনও হয়ে থাকে খুব জোরাল। দংশন জোরাল হয় ব'লে সেই ক্ষতস্থানে অপকারী জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

জলঢোঁড়ার দংশনের ব্যাপারে আর একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। জলঢোঁড়া অন্য সব বিষধর সাপের ছোট বোন। সেজন্যে কাউকে জলঢোঁড়ায় দংশন করলে গোখরো-কেউটে সাপ তাকে আর দংশন করে না। এটুকুই ছোট বোনের খাতির।

জলঢোঁড়া আটটি থেকে সাতাশিটা ডিম দেয়। ময়াল ও

চন্দ্রবোড়ার পর এ সাপই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী ডিম বা বাচ্চা দেয়।

ভারতের উত্তরাঞ্চলে জলঢোঁড়া শীতঋতুতে শীতনিদ্রায় যায় এবং দক্ষিণাঞ্চলে গ্রীষ্মঋতুর শেষের দিকে গ্রীষ্মনিদ্রায় যায়।

ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলঢোঁড়া দেখা যায়।

শত্রুর সমুখে মৃত্যুর ভান করা কোন কোন সাপের আত্মরক্ষার একটি উপায়। বেঁজিকে দেখলে জলঢোঁড়া মৃত্যুর ভান করে। কখনও কখনও সে দু-একবার মাথা তুলে বেঁজিকে আঘাত করতে উদ্যত হয়, কিন্তু পর মুহূর্তেই মাটিতে শুয়ে পড়ে। মাথায় যেন জোরে আঘাত লেগেছে এমনভাবে সে সারা গা কাঁপাতে কাঁপাতে দেহটা উলটে পিঠের ওপর সটান শুয়ে পড়ে। তখন তাকে দেখলে যে কেউ মৃত সাপ ছাড়া আর কিছু ভাববে না। এক্ষেত্রে বেঁজি অনেক সময় সাপটাকে আক্রমণ করে না। বেঁজি দূরে গেলেই জলঢোঁড়াটা আবার সহজ রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু বেঁজি ফিরে এলে সঙ্গে সঙ্গে সে আবার মৃত্যুর ভান করে।

জলঢোঁড়া আর বেঁজি নিয়ে এক সাপুড়েকে খেলা দেখাতে দেখেছিলাম। দড়ি-বাঁধা বেঁজিটাকে একটু আলগা দিতেই সে জলঢোঁড়ার মাথায় গিয়ে দংশন করছিল। দংশন করার সঙ্গে সঙ্গে সাপটা দেহ উলটে পিঠের ওপর সটান শুয়ে পড়ছিল। সাপুড়ে জলঢোঁড়াটার মাথায় সামান্য জল ছিটিয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে সাপটা দেহ সোজা ক'রে আবার ঘোরাফেরা করতে লাগল। এরকম খেলা সাপুড়েটা পুনঃপুনঃ দেখিয়েছিল!

জলঢোঁড়া মেছোওয়ালা সাপ নামেও পরিচিত। পানিবোড়াও বলে। অপর একটি নাম লাউয়াঢোঁড়া, লাউয়া শব্দের অর্থ মোটা।

হেলে (নারব্যালম্ বিচিত্রম্) একটি সাধারণ সাপ ; জলা জায়গার আশপাশে দেখা যায়। হেলে ছোট সরু লম্বাটে সুঠাম সাপ। দৈর্ঘ্য ৭০ সেন্টিমীটর। লেজ লম্বা—দেহের প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

পিঠের রং সবজেটে-বাদামী—দুটি হলদে বা হলদেটে সমান্তরাল রেখা পিঠ বরাবর ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ দুটি রেখা দ্বারা বিভক্ত পিঠের ওপর কাল কাল এড়ো রেখা থাকে—এই এড়ো রেখাগুলো দেহের পেছনের চেয়ে সামনের দিকে বেশী স্পষ্ট। লেজের দিকের রং অধিকতর গাঢ়—ঠোঁট হলদেটে। গলার তলায়ও হলদে আভা থাকে। পেট সাদা—কোনটা কোনটার পেটের দু' ধারে কাল ফুটকি থাকে। চোখ বড়, তারা গোল, তারার চারপাশ সোনালী। বিচিত্র রঙের জন্যে খোলস ছাড়ার পর এ সাপকে বড় সুন্দর দেখায়। শির-করা থাকায় পিঠের আঁশ এবড়ো-খেবড়ো। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

ত্যক্ত হলে হেলে সাপ দেহের সমুখ দিক্ মাটি থেকে তোলে এবং দেহ ফোলায়। তখন এ সাপের মাথার দিকের আঁশের ধারে ম্লান নীল রং ফুটে ওঠে। সাধারণ সহজ অবস্থায় এ রং দেখা যায় না। কোনটা কোনটায় আবার নীল রঙের পরিবর্তে টকটকে লাল রং ফুটে ওঠে। এই লাল রং কমবেশী অবশ্য সাধারণ অবস্থাতেও দেখা যায়। ক্রুদ্ধ অবস্থায় এ সাপ যখন মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন খুবই আকর্ষণীয় হয়।

গিরগিটি-আদি প্রাণী বহুরূপী গায়ের রং বদলাতে পারে। কোন কোন সাপও সীমাবদ্ধ পরিসরে যে গায়ের রং বদলাতে পারে, হেলে তার একটি উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত।

হেলে ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। ধানক্ষেত বা অনুরূপ স্থানে দেখা যায়। জলে থাকতে ভালবাসে। দেড় হাজার মীটর

থেকে দু' হাজার মীটর উচ্চেও হেলে সাপ পাওয়া যায়। হেলে দিনে চলাফেরা করে। প্রধানতঃ ব্যাং খায়। হেলে সাধারণতঃ পাঁচটি থেকে দশটি ডিম দেয়।

হেলে বিষহীন। নিরীহও বটে, কখনও দংশন করতে উদ্যত হয় না। ভারতের উত্তরাঞ্চলে হেলে শীতঋতুতে শীতনিদ্রায় যায় এবং দক্ষিণাঞ্চলে গ্রীষ্মঋতুর শেষে গ্রীষ্মনিদ্রায় যায়।

ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ চীনে হেলে পাওয়া যায়।

কখনও কখনও বহু সাপ পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে একত্র হয়ে বলের আকারে রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। দু' কারণে এরকম দেখা যায়। অনেক পুরুষ সাপ এক বা একাধিক স্ত্রী সাপের সংস্পর্শ লাভের চেষ্টায় এরকম ক'রে থাকে। বহু সাপ একত্রে জড়াজড়ি ক'রে শীতনিদ্রায় যায়। শীতঋতুতে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বা কোন গর্তে বহু সাপকে একত্রে থাকতে দেখা যায়।

যেখানে কোন সাপ ছিল না বৃষ্টির পর বিশ-পঁচিশটা হেলে সাপ একত্রে তাল পাকিয়ে কখনও কখনও রয়েছে দেখা যায়। সাধারণ লোকে বলে, বৃষ্টির সঙ্গে আকাশ থেকে সাপগুলি পড়েছে। আসলে মনে হয়, সাপগুলি মাটির তলায় গ্রীষ্মনিদ্রায় ছিল। বৃষ্টিপাতে সাপগুলি বেরিয়ে এসেছে।

হলকর্ষিত জমিতে থাকে ব'লে হেলে সাপ। বিষহীন তুচ্ছার্থেও হেলে নাম হতে পারে। কিলবিল ক'রে চলে ব'লে নাম হলহলিয়া বা হলহলে (বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া)। হরগুল্লা (বগুড়া), ভেমটা (পশ্চিম-দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি) ও ভ্যাপটা (মালদহ) নামেও এ সাপ পরিচিত।

ইঁদুরখেগো সাপ

দৃঢ়াঙ্গ গণ ঃ দৃঢ়াঙ্গ (দৃঢ়াঙ্গম্) বিষহীন সাপ। দেহ বলিষ্ঠ,

বেলনাকার ; মাথা লম্বাটে, ঘাড় থেকে পৃথক্‌, চোখ বড়, তারা গোল ; লেজ বড়। অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

দৃঢ়াঙ্গ গণে ২টি প্রজাতি আছে। ২টি প্রজাতিই ভারতে রয়েছে ; একটি অতি-পরিচিত ঢেমনা সাপ :

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র পাওয়া যায়।

ঢেমনা

ঢেমনা (দৃঢ়াঙ্গম্ মুখকাসি) ভারতের একটি সাধারণ সাপ। পল্লীতে বাস করে, অথচ এ সাপকে দেখে নি, এমন বোধ হয় হতেই পারে না। ঢেমনা বেশ বড় সাপ, বলিষ্ঠ দেহ। দৈর্ঘ্য ২ মীটর ২৫ সেন্টিমীটর ; বেড় প্রায় ১০ সেন্টিমীটর। একটি ঢেমনার দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে তিন মীটরের ওপর। মেরুদণ্ড খুব সুস্পষ্ট হওয়ায় মনে হয় এর দেহটা যেন শির-করা। লেজ বড়—দেহের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। মাথা লম্বাটে ; চোখ ও নাসাগ্র বড়। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

পিঠের রং সবজেটে বা সবজেটে-বাদামী বা সবজেটে-পাঁশুটে। দেহের পশ্চাৎ অর্ধাংশে প্রধান রঙের ওপর কাল এড়ো রেখা জালের আকারে থাকে। ঠোঁট ও গলা সাদাটে, কিন্তু আঁশের জোড়মুখ কাল—ঢেমনার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পেটের রং হলদেটে সাদা ; পশ্চাৎ দেহের অঙ্কতল-আঁশের ধার কাল হয়। কোন কোন ঢেমনার গায়ের রং ঘন বাদামী বা প্রায় কাল রঙের হওয়ায় তাদের দেহে জালের মত কাল রেখা ভাল বোঝা যায় না।

শৈশবাবস্থায় ঢেমনার গারের রং থাকে ম্লান জলপাই-সবুজ—তার ওপর দেহের সমুখ অর্ধাংশে কমবেশী স্পষ্ট হালকা কাল ধার সমন্বিত এড়ো রেখা থাকে।

ভাঙা বাড়িতে, পুরোতন দেয়ালের গর্তে, গাছে-ঝোপে ঢেমনা দেখা যায়।

ঢেমনা সমতল ভূমিতেই সাধারণতঃ চলাফেরা করে। সব পরিবেশেই এ সাপকে দেখা যায়। সম্পূর্ণ খোলা জায়গাতেও ঢেমনা ঘোরাফেরা করে। অনেক সময় মানুষের বাসগৃহেও এ সাপ ঢোকে। গাঁয়ের বাড়ির ঘরের মধ্যে কখনও কখনও ঢেমনা চলাফেরা করে। বাড়ির লোকেরা কিছু বলে না। ইঁদুরের খোঁজেই ঢুকে থাকে। দিনেই এ সাপের চলাফেরার সময়। তবে মানুষের বাসস্থানের কাছে থাকলে সাধারণতঃ দিনে বেরয় না। ঢেমনা খুব ক্ষিপ্র; এবড়ো-খেবড়ো জায়গা দিয়ে খুব জোরে ছুটতে পারে। গাছে উঠতে ঢেমনা খুব ওস্তাদ; বড় বড় গাছে উঠে পাখির ডিম আর বাচ্চা খায়। গাছে বহু পাখির কলরব শোনা গেলে ধ'রে নিতে পারা যায় একটা ঢেমনা সে গাছে উঠেছে। সাঁতার কাটতেও এ সাপ খুব পটু। ইঁদুরখেগো সাপের দলভুক্ত হলেও ব্যাং খেতেও ঢেমনা ভালবাসে। সেই উদ্দেশে অনেক সময় জলের ধারে ঘুরতে-ফিরতে দেখা যায়। গিরগিটি-আদি প্রাণীও এ সাপ খায়; কখনও কখনও অন্য সাপও বাদ পড়ে না। একটি ঢেমনার পেটে ছটি চামচিকে পাওয়া গেছল। বস্তুতঃ ঢেমনা সামনে যা' পায় তা' খায়।

ঢেমনা তার শিকারকে দেহ দিয়ে জড়িয়ে পাকিয়ে মারে না—কামড়ে ধরে; কখনও কখনও কামড়ে ধ'রে মাটিতে পিষে মারে। ঢেমনাকে পেটুক বলা যায়। একটা সাধারণ দৈর্ঘ্যের ঢেমনা মাঝারি আকারের ২০টি ব্যাং পর পর খেতে পারে। তারপর এক সপ্তাহ তার আর কোন খাবার দরকার হয় না। কোন কোন ব্যাংকে ঢেমনা জ্যান্ত অবস্থাতেই গিলে ফেলে। পেটের মধ্যে গিয়েও কখনও কখনও তারা বেঁচে থাকে এবং ক্যা-ক্যা ক'রে ডাকতে থাকে। সর্পবিশারদ ওয়াল সাহেব এরূপ অনেক ব্যাংকে ঢেমনার পেট থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ঢেমনার পেট থেকে বেরিয়ে ব্যাংগুলো কিছুক্ষণ নিশ্চল থেকে লাফাতে লাফাতে চ'লে যায়।

ঢেমনা বিষহীন সাপ। মানুষ দেখলে ঢেমনা সাধারণতঃ খুব দ্রুতগতিতে দূরে স'রে যায়। এ সাপের প্রকৃতি ভয়প্রবণ এবং সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অসুবিধায় পড়লে উগ্র মূর্তি ধারণ করে। দেহের সমুখ ভাগ তুলে শত্রুর মুখে আঘাত করতে এ সাপ সচেষ্ট হয়। সেই সময় ঢেমনা তার গলাও ফোলায়। কদাচিৎ অদ্ভুত একটা শব্দ করে। বিড়াল অসুবিধায় পড়লে যেরূপ শব্দ ক'রে বিরক্তি প্রকাশ করে, ওয়ালের মতে ঢেমনার এই ডাকও কতকটা সেরকম।

একবার কোন ভদ্রলোক একটি আড়াই মীটর দীর্ঘ ঢেমনাকে তাড়া করেছিলেন। ঢেমনাটা একটা গর্তের দিকে যাচ্ছে দেখে তিনি ঢেমনার আগে ছুটে গিয়ে গর্তের মুখে একটি পা দিয়ে দাঁড়ালেন। ঢেমনা রাগে কুণ্ডলীকৃত হয়ে তার মুখে লাফিয়ে ওঠে। ভদ্রলোক মুখটা সরিয়ে নেওয়াতে সাপটা তাঁর কাঁধে গিয়ে পড়ে। তাতে তাঁর সেখানকার চামড়া ছ'ড়ে যায়।

উঁচু স্থান থেকে ঢেমনা মাটিতে লাফিয়ে পড়তে পারে। তাড়া খেয়ে সাড়ে পাঁচ মীটর উঁচু গাছের ডাল থেকে একটি ঢেমনা মাটিতে লাফ দিয়েছিল। প্রায় ২ মীটর দীর্ঘ একটি ঢেমনা দেড় মীটর উঁচু একটি টুলে উঠেছিল; তাড়া দিতে সাপটি ১ মীটর দূরে লাফিয়ে পড়ে।

মে-জুন মাসে গরমের সময় স্ত্রী-পুরুষ ঢেমনার মিলন ঘটে; অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে স্ত্রী ঢেমনা ছটি থেকে চোদ্দটি ডিম পাড়ে; ডিমের দৈর্ঘ্যের বেশ তারতম্য দেখা যায়—৪ সেন্টিমীটর থেকে ৬ সেন্টিমীটর পর্যন্ত। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বেরয়। জন্মের সময় বাচ্চাদের দৈর্ঘ্য থাকে প্রায় ৩৮ সেন্টিমীটর।

গাঁয়ের এক বাড়িতে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় ৭৫ সেন্টিমীটর নীচে একটি ঢেমনার বাসা পাওয়া যায়। সাপটা ডিম পেড়েছিল।

ডিমগুলিকে ঘিরে সে পাহারা দিচ্ছিল। লোক দেখেও ঢেমনাটা নড়ে নি। তাকে মেরে ফেলা হয়।

অনেকের ধারণা, ঢেমনা সাপ মাত্রই পুরুষ ও চক্রধর সাপ মাত্রই স্ত্রী। ঢেমনা ও চক্রধরের মিলনে বাচ্চা হয়। একথা ঠিক নয়। ঢেমনা ও চক্রধর সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতের সাপ। বিভিন্ন জাতের সাপের মধ্যে মিলন ঘটে না। ঢেমনার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে, চক্রধরেরও মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। চক্রধরের গায়ের রঙের সঙ্গে ঢেমনার গায়ের রং অনেক সময় ভুল হয়। তাতেই এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

জুলাই মাসে দুটি বন্দী ঢেমনাকে যৌন মিলনে রত হতে দেখেছিলাম। পুরুষটি স্ত্রীটির চেয়ে বেশ বড় ছিল। দেহের শেষার্ধ পরস্পরে জড়াজড়ি ক'রে কখনও তারা লম্বালম্বি হয়ে থাকছিল··· কখনও বা গোল হয়ে অবস্থান করছিল···কখনও কখনও বা ৪০।৪৫ সেন্টিমীটর উঁচু মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল···বেশির ভাগ সময়ই লম্বালম্বি হয়ে শুয়েছিল···কদাচিৎ বা খুব অল্পক্ষণের জন্যে পরস্পরের জড়াজড়ি ছেড়ে দুজনে আলাদা হয়েও পড়ছিল। এভাবে ৩৫ মিনিটের ওপর কেটে গেল। পুরুষ সাপটা শুয়ে রইল; স্ত্রী সাপটা কিন্তু ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে পুরুষ সাপটা জল খেতে গেল।

সাপের—বিশেষ ক'রে ঢেমনা সাপের দুগ্ধ-প্রীতির গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুধের প্রতি সাপের বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। দুধ সাপের খাদ্যও নয়। তৃষ্ণায় জলাভাব ঘটলে সাপ দুধ খেয়ে তৃষ্ণা মেটাতে পারে। তবে সাপের দুধ খাওয়ার সংস্কার প্রচলিত হ'ল কেন? বন্দী সাপ অনেক সময় খাদ্য গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। দুধ তরল খাদ্য; তখন তাদের জোর ক'রে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখাই বোধ হয় সহজতম উপায়। এ থেকেই বোধ হয় সাপের দুগ্ধ-প্রীতির সংস্কার জন্মেছে।

উত্তরপ্রদেশে এক ভদ্রলোক তাঁর বাংলোর প্রাঙ্গণে বসেছিলেন। পাশের ঝোপ-ঝাড় থেকে সন্ধ্যার দিকে একটা বড় ঢেমনা সাপ এসে সেখানে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে থাকে। একবাটি দুধ এনে ভদ্রলোক তার কাছে রেখে দেন। সাপটা সে দুধ খায়। এর পর ভদ্রলোক নিয়মিতভাবে দুধ রেখে দিতেন। ঢেমনা সাপটা নিয়মিতভাবে সন্ধ্যার দিকে এসে সে দুধ খেত। বন্য ঢেমনার এরকম নিয়মিত দুধ খেয়ে যাওয়ার কাহিনী আরও কারও কারও মুখে শুনেছি।

পল্লীর পথে এক গোয়ালা দুধের কেঁড়ে মাথায় নিয়ে যাচ্ছিল। শুকনো পাতার সড়সড় শব্দে পেছনে ফিরে সে দেখে, একটা বড় ঢেমনা তার পিছু-পিছু আসছে। সে বুঝতে পারে, দুধের লোভেই ঢেমনাটা তার পিছু নিয়েছে। তখন সে দুধের কেঁড়ে নামিয়ে সাপটাকে একটু দুধ খেতে দেয়। দুধ খেয়ে সাপটা চ'লে যায়।

ঢেমনাকে দুধ খেতে দিলে সে তা' খেতে পারে। তা' ব'লে দুধের লোভে সে গোয়ালার পিছু-পিছু যায় নি। ঢেমনা সাহসী কৌতূহলী সাপ। সমুখে কিছু যেতে দেখলে "কৌতূহলে"র বশে তাকে তার পিছু-পিছু যেতে দেখা যায়।

ঢেমনা গরুর বাঁট থেকে দুধ চুরি করে। ভোরে দুধ দুইতে এসে দেখা যায় বাঁটে একফোঁটা দুধ নেই। এ গল্পটি খুব প্রচলিত। তা' সত্ত্বেও এতে কোন সত্য নেই। গরুর বাঁট থেকে দুধ টেনে নিতে ফুসফুসের যে জোর দরকার, ঢেমনার ফুসফুসে সে জোর নেই। সাপের গাল ব'লে কিছু নেই। বাছুরের মত তার জিব চওড়াও নয়—চেরা। দাঁতও সূচলো। সুতরাং বাঁটে মুখ দিয়ে তার পক্ষে দুধ টানা কখনই সম্ভব নয়। আর এক দিক্ দিয়েও একথার মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র কয়েক চামচ দুধই ঢেমনার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং তার পক্ষে কোন গরুর বাঁটের সমস্ত দুধ একেবারে খেয়ে ফেলা খুবই অস্বাভাবিক—অসম্ভবও বলা চলে। অপরপক্ষে গরুর বাঁটের দুধ শুকিয়ে যাওয়ার বহু কারণ

থাকতে পারে। এঁয়ো রোগে গরুর বাঁটের দুধ শুকিয়ে যায়। দুষ্ট লোকে লুকিয়ে গরুর বাঁটের দুধ চুরি ক'রে ঢেমনা সাপের নামে দোষ দিতে পারে। কখনও কখনও বলা হয়, গরুর বাঁটে ঢেমনার দংশনের দাগ পর্যন্ত দেখা যায়। এঁয়ো রোগেও তো বাঁটে ফোলা ফোলা ঘা-ঘা দেখা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, ঢেমনা সাপ সম্বন্ধে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? লম্বা কিছু সামনে পড়লে তা' দেহ দিয়ে পাকিয়ে ধরার ঢেমনার প্রবণতা আছে। ইঁদুরের খোঁজে ঢেমনা গোয়ালঘরে ঢোকে। সেখানে চলাফেরার সময় গরুর পা দুটিকে শিকার বা শত্রু ভেবে সে জড়িয়ে ধরতে পারে। এ দৃশ্য দেখে নিরক্ষর কল্পনাপ্রবণ মানুষের মনে হতে পারে, ঢেমনা সাপ বুঝি ছাঁদন-দড়ির মত গরুর পা দুটি জড়িয়ে ধ'রে দুধ খেতে চেষ্টা করছে। এর ওপর ঢেমনা সাপটা যদি কৌতূহলের বশে গরুর বাঁটে দু-একবার মুখ দিয়ে ঠোকর দেয়, তা' হলে তো কথাই নেই।

কেবল গরুর বাঁট থেকে নয়—মানবীর স্তন থেকেও ঢেমনা দুধ শোষণ ক'রে নেয় ব'লে গল্প শোনা যায়। বলা বাহুল্য, এর মধ্যেও কোন সত্য নেই। কি গরুর বাঁট, কি মানবীর স্তন থেকে দুধ শোষণ ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা ঢেমনার নেই। মানবীর স্তন থেকে দুধ শোষণের গল্প সাধারণতঃ আদিবাসী নারীদের সম্বন্ধেই শোনা যায়। অজ্ঞতা তাদের প্রচুর। কোন কারণে স্তনে দুধ ক'মে গেছে অথবা শুকিয়ে গেছে। পাশ দিয়ে অথবা গায়ের ওপর দিয়েই একটা ঢেমনা চ'লে গেল। তারা ভেবে নিতে পারে, ঐ ঢেমনাই বুঝি দুধ শুষে নিয়েছে।

লম্বা কিছু সামনে পড়লে তা' জড়িয়ে ধরার প্রবণতায় ঢেমনা সম্পর্কে আর একটি গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষেতে চলাফেরার সময় আকাশে হাড়গিলা পাখি দেখলে ঢেমনা চাষীদের পা জড়িয়ে ধরে। আত্মরক্ষার্থে ঢেমনা এরকম করে ব'লে মনে করা হয়।

আসলে কিন্তু হাড়গিলা পাখি আকাশে থাকার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। তার স্বভাব অনুযায়ীই লম্বাকৃতি মানুষের পা সে জড়িয়ে ধরে।

সাপের পা দেখা গিয়েছে, এ ধরনের কথা প্রায় শোনা যায়। ঢেমনা সাপ সম্বন্ধেই সাধারণতঃ একথা শোনা যায়। সাপের পা নেই, সুতরাং সাপের পা কেমন ক'রে দেখা যায়, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সাপের দেহের অঙ্গ-সংস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবই এই ধারণার জন্ম দেয়।

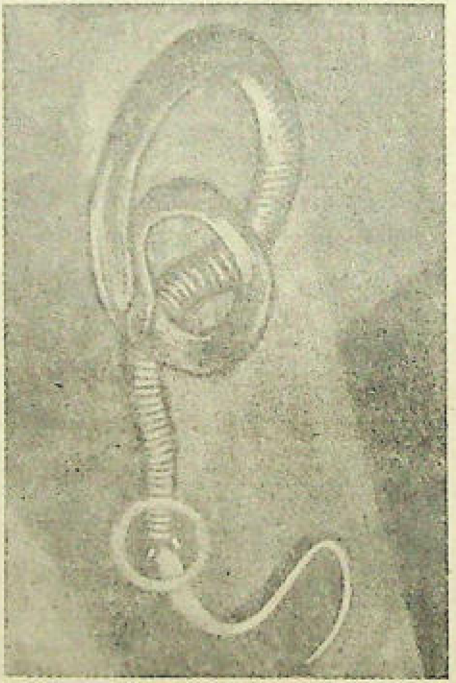

ঢেমনার পা!

সাপের জননেন্দ্রিয়ের কথা বলতে গিয়ে পূর্বে বলেছি, পুরুষ সাপের জননেন্দ্রিয় দ্বিধা-বিভক্ত। এই পুং-জননেন্দ্রিয় লুকনো থাকে অবসারণী-ছিদ্রের মধ্যে; প্রয়োজনের সময় বের হয়। লেজের সন্ধিস্থলে অবসারণী-ছিদ্রের দু' পাশ থেকে এ দুটি অঙ্গ বেরিয়ে পড়ে। সাপ অত্যধিক যন্ত্রণা পেলে—যেমন পুড়িয়ে মারার সময় অথবা পুনঃপুনঃ আঘাত করার সময়—তার জননেন্দ্রিয় বেরিয়ে পড়ে। এই বেরিয়ে-পড়া দ্বিধা-বিভক্ত ইন্দ্রিয়কেই অনেক সময় সাপের দুটি ক্ষুদ্র পা ব'লে ভুল করা হয়। সাধারণ

সাপগুলির মধ্যে ঢেমনা সাপই বড়। সেজন্যে এর ইন্দ্রিয়ই সাধারণতঃ চোখে পড়ে।

ঢেমনা শব্দের অর্থ জারজ। ঢেমনা চক্রধর সাপের সঙ্গে মিলিত হয় এই ভ্রান্ত ধারণায় বোধ হয় এই নাম। ঢেমনাকে ধামনও বলা হয়। ধামন্ শব্দেব অর্থ বাড়ি। ঢেমনা বাড়ির মধ্যেও ঘোরাফেরা করে; সেজন্যে বোধ হয় ধামন নাম। দণ্ডাকার ব'লে অথবা দণ্ডের মত সবেগে মানুষকে আঘাত করে ব'লে দাঁড়াশ (দণ্ডাস) নাম। কাল অর্থাৎ বিষ নেই ব'লে আর একটি নাম কালাই। ঘোড়ানাগ (মেদিনীপুর) বলতে বোধ হয় ঢেমনাকেই বুঝয়।

অনেক আদিম জাতি ঢেমনার মাংস খায়। মালাবার অঞ্চলে যারা ঢেমনার মাংস খায়, ঢেমনাকে মারাও তাদের একটি কৌশল —নিষ্ঠুর কৌশল আছে। একটি নারকেল-খোলে মাপমত গর্ত ক'রে তারা তার মধ্যে দিয়ে প্রথমে ঢেমনার লেজ ঢুকিয়ে টানতে থাকে। এতে ঢেমনা কেবল ম'রে যায় না, তার দেহের আঁশগুলোও দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। তখন মাথাটা কেটে বাদ দিয়ে বাকী অংশ রেঁধে তারা খায়।

ঢেমনা ও চক্রধর সাপের রঙে অনেক সময় গণ্ডগোল হয়ে যায়। চক্রধরের চেয়ে ঢেমনা দ্রুতগতিতে চলে। চক্রধরের আঁশের বৈশিষ্ট্য তো যথাস্থানে বলেছি।

[ঘ] **উরগ গণ:** উরগ (উরগম্) বিষহীন সাপ। দেহ লম্বা ধরনের, বেলনাকার বা দু' পাশ অল্প চাপা; মাথা ঘাড় থেকে পৃথক্, লেজ বড়; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

উরগ গণের ১০টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়। একটির নাম রক্তবংশী।

এশিয়া, ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকায় উরগ পাওয়া যায়।

রক্তবংশী (উরগম্ দণ্ডরেখম্) দেখতে সুন্দর সাপ। রং ও চিহ্নাদির বৈশিষ্ট্যে সাপটিকে চেনা সহজ।

পিঠের রং পাঁশুটে-বাদামী বা অল্প বাদামী—দেহের সমুখ ভাগে প্রধান রঙের ওপর লম্বালম্বি কাল রেখা থাকে—পেছন অংশে এই রেখা দেখা যায় না—দু' ধারে চোখ থেকে তিনটি ক'রে ছোট কাল রেখা বের হয়—মাথার রং তামাটে অথবা ম্লান কমলা রঙের—মাথার পেছনে এড়োভাবে একটি কাল রেখা থাকে; পেটের রং সাদাটে বা ম্লান হলদে—লেজের তলার অংশে পাঁশুটে ছোপ থাকে। চোখ মাঝারি আকারের, তারা গোল, তারার চারপাশ সোনালী-বাদামী; লেজ দেহের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ। অন্ততল-আঁশ চওড়া; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত। দৈর্ঘ্যে ২ মীটরেরও ওপর হয়। মাথা তামাটে ব'লে রক্তবংশী নাম।

রক্তবংশী দিনে চলাফেরা করে। জঙ্গলের আশপাশে খোলা জায়গায় রক্তবংশীকে দেখতে পাওয়া যায়। ছোট স্তন্যপ এর প্রধান খাদ্য। ইঁদুরের খোঁজে কখনও কখনও বসতবাড়িতেও ঢোকে।

বিষহীন সাপ, তবে খুব সাহসী। হঠাৎ কাছে গিয়ে পড়লে অথবা অসুবিধায় পড়লে হাঁ ক'রে জোরে আঘাত করতে আসে। মাথা উঁচু ক'রে লম্বালম্বি বেশ গলা ফোলায়। রক্তবংশী একবারে পাঁচটি থেকে বারটি ডিম পাড়ে।

বাংলা, ওড়িশা, আসাম, পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলে রক্তবংশী পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ চীনেও এ সাপ দেখা যায়।

বৃকদন্তী সাপ

বৃকদন্তী গণের সাপ (বৃকদন্তি) বিষহীন। ওপর ও নীচের চোয়ালের সমুখ দাঁতগুলি নেকড়ে বাঘের দাঁতের মত সুঁচলো ও ধারাল হওয়ায় বৃকদন্তী নাম। দেহ লম্বাটে; চোখের তারা খাড়া উপবৃত্তাকার—চোখ সম্পূর্ণ কাল রঙের হওয়ায় তারা সহজে বোঝা যায় না; অপর-বৃকদন্তী সাপ (বৃকদন্তি অপরম্) ব্যতীত সব বৃকদন্তী সাপের অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

বৃকদন্তী রাতে চলাফেরা করে। খুব সক্রিয় ও চটপটে; প্রকৃতিতেও বেশ উগ্র। ত্যক্ত হলে সহজেই দংশন করে। গিরিগিটি-আদি প্রাণী প্রধান খাদ্য। সব প্রজাতিই ডিম দেয়। ডিমের আকৃতি লম্বাটে ধরনের—দৈর্ঘ্য প্রস্থের দু-তিন গুণ হয়।

বৃকদন্তী গণে প্রায় ২০টি প্রজাতি আছে। ৭টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়। একটি প্রজাতি ঘরচিতি ভারতের একটি সাধারণ সাপ।

বৃকদন্তী দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়।

ঘরচিতি

বাড়ির আনাচে-কানাচে যেসব সাপ দেখা যায়, তাদের অর্ধেকই ঘরচিতি (বৃকদন্তি সামান্যম্ সামান্যম্)। ঘরচিতির দেহ সরু; কতকটা চেপটা মত। দৈর্ঘ্য ৭৫ সেন্টিমীটর। ৮৫ সেন্টিমীটর দীর্ঘ একটি ঘরচিতি পাওয়া গেছল—তাই সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্য।

পিঠের রং বাদামী বা পাঁশুটে-বাদামী—প্রধান রঙের ওপর সাদাটে এড়োরেখা—এড়োরেখাগুলি সোজা এড়োভাবে থাকতে

পারে অথবা দ্বিমুখী হয়ে ত্রিকোণাকার মত হতে পারে—এড়োরেখাগুলি সম্পূর্ণ সাদাটে হতে পারে অথবা তার ওপর বাদামী ছোপ থাকতে পারে—এড়োরেখাগুলি কখনও কখনও পিঠ বরাবর ছোট ছোট সাদা দাগে পরিণত হয়; পিঠ বরাবর সর্বত্র এড়োরেখাগুলি থাকতে পারে—সাধারণতঃ দেহের সমুখ অংশে এড়োরেখাগুলি স্পষ্ট থাকে, শেষের দিকে অস্পষ্ট হয়ে যায়; পেটের রং সাদাটে; ঘাড় ঘিরে সাদাটে রঙের একটি রেখা সাধারণতঃ থাকে: ওপর ঠোঁট সাদা অথবা বাদামী ছোপ সমন্বিত। ঘরচিতির প্রধান রং কদাচিৎ কাল হয়। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া এবং দু' পাশে সামান্য শির-করা; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

ঘরচিতি রাত্রিচর। কলকাতার মত শহরে পাকা বাড়িতেও ঘরচিতি পাওয়া যায়। বাজার বা অনুরূপ কোন জনবহুল স্থানেও ঘরচিতি ঘোরাফেরা করে। ইট-পাটকেলের তলায় পাঁচিলের সামান্য গর্তে—যে কোনও সুবিধাজনক অন্ধকার স্থানে যেখানে সে লুকিয়ে থাকতে পারে দিনের বেলায় ঘরচিতি থাকে; সন্ধ্যে নেমে এলে নেংটে-ইঁদুর ও গিরগিটি-আদি প্রাণীর খোঁজে বের হয়। এসব প্রাণীর খোঁজেই ঘরচিতি মানুষের বাড়িতে ঢোকে। ঘরচিতি ভেকও খায়।

ঘরচিতি বিষহীন সাপ। একজনের মুখে কামড়েছিল: মুখ ফুলে ওঠে; আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়। চটপটে ও উগ্র প্রকৃতির সাপ। মানুষ দেখলে সাধারণতঃ পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাধা পেলে অথবা ধরতে গেলে এ সাপ জোরে দংশন করে। খোলা জায়গায় সাধারণতঃ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। ত্যক্ত হলে সে অবস্থা থেকেই হঠাৎ জোরে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

সামান্য খসখসে হলেই ঘরচিতি সে খাড়া জায়গা বেয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে। কলকাতায় পাকাবাড়ির দোতলায় একাধিক ঘরচিতি আমার দৃষ্টিপথে পড়েছে। লক্ষ করার ব্যাপার, সব সাপ

কটিই দেখেছিলাম শীতের প্রাক্কালে বা শীতের সময়। শীতনিদ্রার উদ্দেশে তারা বোধ হয় কোন ভাল স্থান খুঁজে নিচ্ছিল।

ঘরচিতি তিনটি থেকে এগারটি ডিম দেয়। বাচ্চা লম্বায় হয় চোদ্দ থেকে আঠার সেন্টিমীটর। পুরুষ ও স্ত্রী ঘরচিতিকে কখনও কখনও একত্রে থাকতে দেখা যায়।

ঘরচিতি ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। একটি সাধারণ সাপ। নেপাল, সিংহল ও ব্রহ্মদেশেও ঘরচিতি পাওয়া যায়।

ঘরের আনাচে-কানাচে দেখা যায় ব'লে ঘরচিতি নাম। একই কারণে অন্য নাম: ঘরমণি, ঘরমোহিনী, ঘরঘুরনী, চালবাউনী, কেঁথোচিতি। কেঁথো শব্দের অর্থ দেয়াল। ঘেন্টি (ঢাকা, কুচবিহার), ঘানি ও ঘাউনি নামেও পরিচিত। ঘেনি শব্দের অর্থ ছোট; ঘেনি থেকে ঘানি এসেছে কি? চাকলাপোড়াও (ময়মনসিংহ) বলে। চেরা কাঠকে চাকলা বলে। শুধু চিতি (চিত্র) নামেও এ সাপ পরিচিত। ধুলোমুটি ও ধুলই (বাঁকুড়া) বলতে ঘরচিতিকেই বুঝায়। গায়ের রং কতকটা ধুলোর মত। গরুর গাড়ি চ'লে গেলে ধুলো উঁচু হয়ে জ'মে থাকে; কখনও কখনও ঘরচিতিকে তারও মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়।

ঘরচিতি বিষহীন সাপ। কিন্তু অনেকের ধারণা আছে, শনি-মঙ্গলবারে ঘরচিতির মুখে বিষ হয়। কথাটায় কোন সত্য নেই। এ সাপ সব বারেই বিষহীন। কালাচ ও ঘরচিতির মধ্যে অনেক সময় গণ্ডগোল হয়ে যায়। তা' থেকেই বোধ হয় এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি। ঘরচিতি ও কালাচ চেনার কথা কালাচ সাপ প্রসঙ্গে বলেছি।

কুকরি-সাপ

কুকরি গণের সাপ (অপদস্তি) বিষহীন। কুকরি-সাপের মুখে দাঁতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ওপর চোয়ালের পেছনের

কয়েকটি দাঁত চেপটা হয়ে তবে সুঁচলো হয়েছে। এই দাঁত কতকটা গোর্খাদের কুকরির মত ব'লে এসব সাপকে কুকরি-সাপ বলা হয়। দেহ বেলনাকার ; মাথা ছোট, ঘাড় থেকে পৃথক্ নয় ; চোখ মাঝারি আকারের, তারা গোল ; অঙ্কতল-আঁশ চওড়া, অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

কুকরি সাধারণতঃ দিনে ঘোরাফেরা করে। ক্ষিপ্র সাপ, ভীরু নয়। ডিম পাড়ে।

কুকরি গণে পঞ্চাশটি থেকে ষাটটি প্রজাতি আছে। ভারতে পাওয়া যায় ১৬টি। ডোরাবদ্ধ-কুকরিই সচরাচর দেখা যায়।

দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং আশপাশের দ্বীপে পাওয়া যায়।

ডোরাবদ্ধ-কুকরি

ডোরাবদ্ধ-কুকরির (অপদন্তিনম্ সামান্তম্) পিঠের রং গাঢ় বাদামী বা অল্প বাদামী—প্রধান রঙের ওপর থাকে সুস্পষ্ট কাল এড়োরেখা অথবা এড়োভাবে সজ্জিত পর পর কাল দাগ—এই এড়োরেখা বা দাগ দেহের দু' পাশে সরু হয়ে গেছে এবং কোনটা কোনটায় বা ভেঙে যায়—কোনটা কোনটায় এই এড়ো রেখা বা দাগের দু' ধার বরাবর সাদা হয় ; মাথায় তিনটি < এই ধরনের রেখা থাকে ; পেটের রং সাদাটে—কোনটা কোনটায় তার ওপর কাল বা বাদামী ছোপ থাকে। ছোট সাপ ; দৈর্ঘ্য ৬৫ সেন্টিমীটর। অঙ্কতল-আঁশ চওড়া ; অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

ডোরাবদ্ধ-কুকরি সাধারণতঃ সমতলভূমিতে বাস করে। তবে পাহাড়ে জায়গায়ও পাওয়া যায়। প্রধানতঃ দিনে ঘোরাফেরা করে। ভাঙা ইট-পাটকেলের তলায় অথবা অনুরূপ কোনস্থানে বাসা বাঁধে। বসতবাড়ির আশপাশেও বাসা বাঁধে। বৃষ্টিপাতের সময় কখনও কখনও চোখে পড়ে। অনায়াসে গাছে উঠতে পারে।

খুবই ক্ষিপ্র সাপ ; সহজেই ভয় পায় এবং লুকিয়ে পড়ে। রাগলে এ সাপ নিজের দেহ খুব বেশী রকম ফুলিয়ে থাকে। অসুবিধা-জনক অবস্থায় পড়লে দংশন করতে পারে ; কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় না। বিষহীন সাপ। ডিম পাড়ে।

ডোরাবন্ধ-কুকরি ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। বিহারের একটি সাধারণ সাপ। নেপাল, পশ্চিম-পাকিস্তান ও সিংহলেও পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা সাপ

বালু-সাপ গণঃ বালু-সাপ (সিকতিলম্) বিষহীন সাপ। দেহ বেলনাকার, মোটা ; লেজ খুব ছোট ; মাথা ঘাড় থেকে পৃথক্ নয় ; চোখ ছোট, তারা খাড়া উপবৃত্তাকার ; অবপুচ্ছ-আঁশ সাধারণতঃ অখণ্ড ; অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ।

বালু-সাপ গণে ৭টি প্রজাতি রয়েছে। ভারতে আছে ২টি—(ক) বেলেসাপ ও (খ) শঙ্কুপুচ্ছ-বেলেসাপ।

বালু-সাপ ভারত, পশ্চিম চীন, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব ইওরোপ এবং আফ্রিকায় পাওয়া যায়।

মাটির তলায় সিঁধিয়ে থাকার অভ্যাস এবং সংপীড়ক হওয়ায় এই গণের সাপদের ভূনিম্নবাসী ও দৈত্যাকার সংপীড়ক সাপদের সংযোগ-সূত্র ব'লে মনে করা হয়।

বেলেসাপ

সাপুড়েরা বেলেসাপ (সিকতিলম্ ভুগ্নপুচ্ছম্ ভুগ্নপুচ্ছম্) বলে না ; বলে, দুমুখো সাপ ; এ সাপের দেহের দু' দিকে একটি ক'রে দুটি মুখ থাকে ; এক মুখ দিয়ে সাপ ছ' মাস খায় ; অপর এক মুখ দিয়ে আর ছ' মাস খায়। এক মুখ মামা, অপর মুখ

ভাগ্নে। এমনি মামা-ভাগ্নেতে ঝগড়া। কিন্তু কোনদিন যদি দু' মুখ একত্র হয়ে কাউকে কামড়ায়, তার নির্ঘাত মৃত্যু!

দেহ মোটা ও ঠাসা। উদ্গত ওপর চোয়ালের তলায় মুখ থাকে। মাথা ঘাড় থেকে পৃথক্ নয়। চোখ ছোট, তারা খাড়া উপবৃত্তাকার, তারার চারপাশ হলদে। মনোযোগের সঙ্গে না দেখলে চোখ ধরা পড়ে না। লেজ ছোট ও ভোঁতা—ক্রমশঃ সরু হয়ে যায় নি। মাথা ও লেজের এই গড়নের জন্যে মুখ ও লেজ একইরকম মনে হয়। কোন্‌টা মুখ ও কোন্‌টা লেজ সব সময় ঠাহর করা যায় না। অবসারণী-ছিদ্রকেও মুখ ব'লে ভুল হয়। এ থেকেই সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে, বেলে-সাপের বুঝি দুটি মুখ। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকার সময় বেলেসাপ মুখটা দেহের মধ্যে লুকিয়ে লেজের দিক্‌টা বাইরে রাখে। এতেও লেজের দিক্‌টা মুখ ব'লে ভুল হয়। আসলে অন্যান্য সাপের মত বেলেসাপেরও একটি মুখ।

বেলেসাপ, দুটি মুখ নেই

বেলেসাপের পিঠের রং গাঢ় বাদামী অথবা কালচে—কোন কোনটার পিঠের রং হলদেটে হয়, আর আঁশের ধারগুলো হয় গাঢ় বাদামী; কোনটা কোনটায় প্রধান রঙের ওপর গাঢ় রঙের এড়ো ডোরা থাকে—ডোরাগুলি লেজের দিকেই বেশী স্পষ্ট হয়; পেটের রং গাঢ় বাদামী দাগ সমন্বিত সাদাটে অথবা প্রায় সম্পূর্ণ বাদামী। পিঠের আঁশ খুব ছোট, চিক্কণ। পিঠের মাঝ বরাবর খাঁজ মত

থাকে। অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ—মাত্র পেটের মধ্যস্থানের অংশ জুড়ে থাকে। দৈর্ঘ্যে ১ মীটরের ওপর হয়।

বেলেসাপ অলস প্রকৃতির—বড় নড়াচড়া করে না। নড়বড় ক'রে চলে। মাটির তলায় সেঁধিয়ে থাকে। উদ্গত ওপর চোয়াল মাটি খোঁড়ার ব্যাপারে সাহায্য করে। সমতলভূমি ও পাহাড়ে জায়গায়—হু' স্থানেই এ সাপ দেখা যায়। ইঁদুর, কাঠবিড়াল, পাখি এ সাপের খাদ্য। বেলেসাপ সংপীড়ক—শিকারকে দেহের পেঁচ দিয়ে জড়িয়ে মারে। শিকার ম'রে গেলে তাকে গিলতে শুরু করে। বন্দী একটি বেলেসাপকে জ্যান্ত চড়ুই পাখি খেতে দেওয়া হয়েছিল। বেলেসাপ এমনি তো খুব নির্জীব। কিন্তু চড়ুই পাখি খাঁচায় দেওয়া মাত্র সাপটা মুহূর্তে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে কামড়ে দেহের পাক দিয়ে জাপটিয়ে ধরেছিল।

বেলেসাপ বিষহীন। নিরীহ প্রকৃতিরও বটে। বাচ্চা দেয়।

ভারতে উত্তর ও পশ্চিম অংশে বেলেসাপের প্রধান বাসস্থান। বাংলাদেশে খুব কম দেখা যায়।

বেলেসাপের একটি নাম রাজকুমার। অলস প্রকৃতির জন্যে অথবা সর্পরাজ ময়ালের বাচ্চার মত মনে হওয়ায় বোধ হয় এই নাম।

শঙ্কুপুচ্ছ-বেলেসাপ

শঙ্কুপুচ্ছ-বেলেসাপের (সিকতিলম্ শঙ্কুপুচ্ছম্) পিঠের রং পাঁশুটে, হলদেটে বা অল্প বাদামী—প্রধান রঙের ওপর কাল রেখা—রেখাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আঁকাবাঁকা শিকলের মত মনে হয়; পেটের রং হলদেটে বা সাদাটে—পেটে ধারের আঁশ-গুলিতে ছোট ছোট বাদামী দাগ থাকে।

দেহ বেশ মোটা ও ঠাসা। উদ্গত ওপর চোয়ালের তলায় মুখ থাকে। মাথা ছোট, ঘাড় থেকে পৃথক্ নয়; চোখ ছোট, তারা

খাড়া উপবৃত্তাকার। তারার চারপাশ হলদে। লেজ খুব ছোট—মাত্র তিন সেন্টিমীটর থেকে পাঁচ সেন্টিমীটর। লেজ খুব সূচলোও বটে—যে কারণে শঙ্কুপুচ্ছ-বেলেসাপ নাম। পিঠের আঁশ ছোট ও এবড়ো-খেবড়ো। অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ। দেখতে বিসদৃশ সাপ। দৈর্ঘ্য ৯৫ সেন্টিমীটর।

উদ্গত ওপর চোয়াল দিয়ে আলগা মাটিতে অগভীর গর্ত ক'রে তার মধ্যে থাকে। মাটির নীচে একনাগাড়ে প্রায় ১ ঘণ্টা থাকতে পারে। বালুময় জায়গায় বাস করতে ভালবাসে; তবে অন্য জায়গায়ও দেখা যায়। সমতল ও পাহাড়ে—দু' জায়গাতেই দেখা যায়। খুব অলস প্রকৃতির সাপ। দেহের তলায় মাথা লুকনোর অভ্যাস আছে। সাধারণতঃ সাপ যেমন পুনঃপুনঃ জিব বের করে, এ সাপ তেমন করে না—নিতান্ত ত্যক্ত হলে এরকম করে।

ইঁদুর, কাঠবিড়াল, পাখি ইত্যাদি খায়। সংপীড়ক সাপ। এ সাপের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার। সামনে অন্য খাদ্যবস্তু থাকলেও একটি খাদ্যবস্তু নিয়ে দুটি সাপ টানাটানি করে—রেষারেষি করে। ছটি থেকে আটটি বাচ্চা দেয়।

ভারতের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। পাকিস্তান ও সিংহলেও পাওয়া যায়।

বিষহীন সাপ। অলস প্রকৃতির হলেও কখনও কখনও জোরে আঘাত ও দংশন করে। একটি মেয়েকে দংশন করেছিল, তার কিছুই হয় নি।

শঙ্কুপুচ্ছ-বেলেসাপের সঙ্গে চন্দ্রবোড়ার অনেক সময় গণ্ডগোল হয়। কিন্তু চন্দ্রবোড়ার অঙ্কতল-আঁশ চওড়া; শঙ্কুপুচ্ছ-বেলেসাপের অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ।

ভূনিম্নবাসী সাপ

অন্ধক গণ: অন্ধক গণের (অন্ধকম) সাপ বিষহীন। আকারে খুবই ছোট হয়। মাটির তলায় সিঁধিয়ে থাকে—ভূনিম্নবাসী।

অন্ধক গোত্রের সাপ যে যে স্থানে পাওয়া যায়, অন্ধক গণেরও সাপ সে সে স্থানে পাওয়া যায়।

অন্ধক গণে প্রায় ১৭০টি প্রজাতি আছে ; ভারতে আছে ১৪টি। সচরাচর-দৃষ্ট প্রজাতিটির নাম—পুঁয়ে সাপ।

পুঁয়ে সাপ

লোকে বলে, পুঁয়ের (অন্ধকম্ সামান্যম্) ভীষণ বিষ। এ সাপে কামড়ালে বিষ নামাতে সাড়ে সাত মণ সরষের তেল দরকার। আসলে কিন্তু পুঁয়ে বিষহীন সাপ। আমাদের দেশের অজ্ঞ মানুষ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে তেল খাওয়ায়। তেল খাওয়ালে বমি হবে, আর তার সঙ্গে দেহ থেকে সাপের বিষ বেরিয়ে আসবে! এই সূত্রেই সাড়ে সাত মণ তেলের কথা বলা হয়েছে।

অনেকের আবার ধারণা, পুঁয়ের বিষ নেই বটে ; কিন্তু ঐ সাপে চাটলে বা তা কে ডিঙলে ছোট ছেলে-মেয়েদের পুঁয়ে রোগে ধরে। এ কথায়ও কোন সত্য নেই।

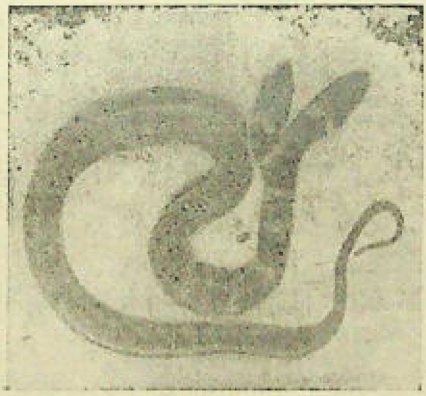

সাপটি দুমুখো ঘরচিতি
[চব্বিশ-পরগনার কোন স্থানে পাওয়া যায়]

পুঁয়ে সাপকে কেউ কেউ দুমুখো সাপ বলে। আসলে এর একটাই মুখ। মুখ ছোট, নিম্ন চোয়ালে দাঁত নেই ; চোখ খুব ছোট ; লেজ খুব সূচলো। এসব কারণে কোন্ দিকে মুখ হঠাৎ ঠাওর করা যায় না। সেজন্যে ভুল হয় দুমুখো সাপ।

কোন সাপেরই সামনে ও পেছনে—দু'দিকে দুটি মুখ থাকে না,

থাকতে পারে না। কিন্তু একদিকে দুটি মুখ নিয়ে সাপ জন্মাতে পারে—অন্য প্রাণী যেমন জন্মায়।

পুঁয়ের পিঠের রং বাদামী বা কালচে ; নাসাগ্র, অবসারণী-ছিদ্রের আশপাশ ও লেজের শেষ অংশ সাধারণতঃ সাদাটে হয় ; পেটের রং পিঠের রঙেরই মত—তবে ম্লান। পিঠ ও পেটের আঁশ ছোট ও চিক্কণ। দৈর্ঘ্য ১৭ সেন্টিমীটর ; বেড় ৪ মিলিমীটরেরও কম।

ভূনিম্নবাসী সাপ, তবে বেশ সক্রিয়। আঁশ তেলা হওয়ায় মাটির ভেতর দ্রুত চলাফেরার সুবিধা হয়। মাটির ওপর তেমন ভালভাবে চলতে পারে না ; ত্যক্ত হলে অনেক সময় লাফ দেয়। ছোট ছোট পোকা-মাকড় আর তাদের ডিম পুঁয়ের খাদ্য। এই খাদ্যের খোঁজেই পাকাবাড়ির স্যাঁতসেঁতে জায়গায়, ভাঙা পচা কাঠের তলাতে পুঁয়ে আশ্রয় নেয়। বইয়ের স্তূপে কখনও কখনও পুঁয়ে দেখা যায় ; উইয়ের খোঁজে থাকে ব'লে মনে হয়। পুঁয়ে ডিম পাড়ে। পাকা-বাড়ির ওপরতলায় ছাদে কখনও কখনও পুঁয়ে পাওয়া যায়। চড়ুই বা ঐ ধরনের কোন পাখির মুখে পুঁয়ে ঐ সব স্থানে যায় ব'লে মনে হয়। ফেলে-দেওয়া আমের আঁঠির মধ্যেও কখনও কখনও পুঁয়ে সাপ দেখা যায়।

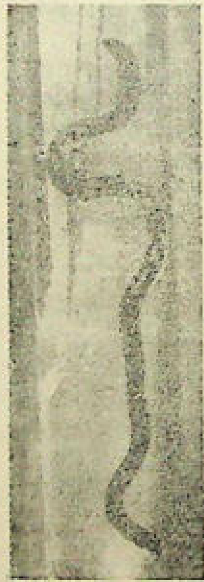

পুঁয়ে সাপ

[কলকাতায় কলের জলের সঙ্গে বেরিয়েছিল]

কলকাতা শহরে কলের জলে অনেক সময় পুঁয়ে সাপ বেরতে দেখা যায়। জলাধারের মধ্যে বোধ হয় এ সাপের জন্ম হয়। দেহের বেড় যেমন সংকীর্ণ তাতে এ সাপ অতি সামান্য ছিদ্রাল জলের নলের ভেতর ঢুকতে পারে—এবং জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে।

পুঁয়ে ভারতের (আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমেত) সর্বত্র পাওয়া যায়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইরান, আরব, অ্যাফ্রিকা ও মেক্সিকোতেও পাওয়া যায়।

বনপুঁয়ের ডাঁটার মত দেখতে; তাই পুঁয়ে নাম। পুঁয়েকে তেলাঙ্গ (বাঁকুড়া) বলে; তেলিয়াও বলে। আঁশ তেলাটে ব'লে এই নাম।

অন্য একটি সাপ

অণ্ডখাদক সাপ: ভারতীয় অণ্ডখাদক বা সংক্ষেপে অণ্ডখাদক সাপ (কুটরম্ ভারতীয়ম্) পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ। অণ্ডখাদক ডিম খেতে পছন্দ করে—এবং ডিম খাওয়ার ব্যাপারে তার বৈশিষ্ট্যও আছে।

সাপের পাচক রস ডিমের খোলা হজম করতে সমর্থ। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মুরগীর ডিমের খোলা হজম করতে চক্রধর সাপের ৪৮ ঘণ্টা লাগে। অণ্ডখাদক সাপের দেহে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাতে এ সাপের ডিমের খোলা হজম করার প্রয়োজনও ঘটে না। প্রকৃত দাঁত তো আছে। তা' ছাড়া এ সাপের ঘাড়ের কশেরুকা উদগত সূচলো হয়ে গ্রাসনালী ভেদ ক'রে দাঁতের মত হয়েছে। ডিম গ্রাসনালীতে ঢুকলে সাপ এই "দাঁত" দিয়ে ডিমের খোলা ভেঙে ফেলে। তারপর দেহের পরিপুষ্ট পেশীর সাহায্যে ডিমের কুসুম পাকস্থলীতে চালিয়ে দেয়, আর ভাঙা ডিমের খোলা উগরে বাইরে ফেলে দেয়।

অণ্ডখাদকের পিঠের রং গাঢ় জলপাই-বাদামী থেকে কালচে—পিঠ বরাবর আঁশগুলি হলদেটে সাদা—তাতে মনে হয় দেহের পিঠ বরাবর একটা হালকা রেখা চ'লে গেছে; পেটের রং সাদা। মাথা ঘাড় থেকে কমবেশী স্পষ্ট; চোখ বড়, তারা খাড়া উপবৃত্তাকার; লেজ ছোট; অঙ্কতল-আঁশ চওড়া, অবপুচ্ছ-আঁশ বিভক্ত।

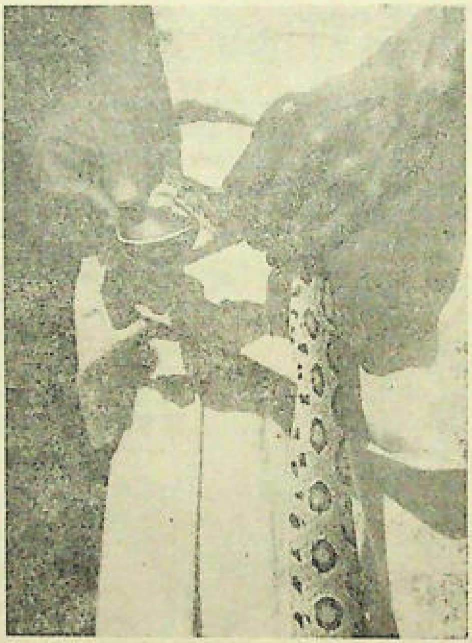

সাপুড়ে কর্তৃক চন্দ্রবোড়ার বিষ দোহন

ওঝা ঃ সাপুড়ে ঃ চিকিৎসা

ওঝা ও বুজরুকি

আমাদের দেশে—বিশেষ ক'রে গাঁয়ে ওঝার দাপট খুব বেশী। ওঝাকে সকলে শ্রদ্ধা করে—আবার ভয়ও করে! আপদে-বিপদে—বিশেষ ক'রে কোন রোগে পল্লীবাসীরা ওঝার আশ্রয় নেয়। নইলে সচরাচর তাকে তারা এড়িয়েই চলে। ওঝাকে তারা কোন এক রহস্যময় শক্তির অধিকারী ব'লে মনে করে। অজানতেও কেউ যদি ওঝা মশায়ের বিরক্তির কারণ হয়, তা' হলে তার আর বিপদের সীমা নেই! ওঝা নিজে কিছু করবে না। ওঝার রহস্যময় শক্তিই তাকে এক বিপদ থেকে আর এক বিপদে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে!

যে ওঝাকে নিরক্ষর লোকেরা—এমন কি শিক্ষিত লোকেরাও এত শ্রদ্ধা করে, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কি শিক্ষাগুণে কি চরিত্রগুণে—কোন দিক্ দিয়েই তাকে সমাজ-জীবনে বাঞ্ছনীয় মানুষ মনে করা যায় না। নিরক্ষর তো সে হয়েই থাকে—নৈতিক অনেক দোষও তার থাকে। গাঁজা বা মদ তার নিত্য সহচর। অকারণে শ্রদ্ধা পায় ব'লে খুব দাম্ভিকও হয়ে ওঠে। প্রকারান্তরে এই দাম্ভিকতাও নিরক্ষর লোকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার ক'রে আরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ওঝাগিরি সব ওঝারই প্রধান পেশা নয়। পেশাতে কেউ ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান, কেউ বা বাড়ির দরোয়ান, কেউ বা রাজমিস্ত্রী।

ওঝা হ'ল আদিম চিকিৎসক—যখন একই ব্যক্তি ছিল পুরোহিত ও চিকিৎসক। চিকিৎসাবিদ্যার সৃষ্টি যখন হয় নি, রোগের তাড়নায় মানুষ অসহায় হয়ে যখন ছুটোছুটি করত, তখন এগিয়ে আসত ওঝা—তার তন্ত্রমন্ত্র আর জড়িবুটি নিয়ে। সে ছিল কোন্ সুদূর অতীতে—যখন ঘটনাবলীর কার্য-কারণ সম্পর্ক মানুষের কাছে স্পষ্ট ছিল না।

বিষধর সাপের সামনে আদিম মানুষ ছিল নিতান্ত অসহায়। সামান্য একটা ছোবলে জল-জ্যান্ত একটি মানুষকে যমের সদনে পাঠায়। সাপ মানুষ খায় না। কিন্তু কাউকে সাপে দংশন করলে গাঁয়ের লোকে বলে—"সাপে খেয়েছে"। "সাপে খেয়েছে" —এই কথাটায় সর্প-দংশনের ক্ষেত্রে আদিম মানুষের চরম অসহায়তা আজও যেন স্পষ্ট ফুটে ওঠে। যা' হ'ক, আদিম মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুযায়ী সর্প-দংশনের চিকিৎসা করত। তাদের পক্ষে বোধ হয় ঐরূপ চিকিৎসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু আজকের মানুষও যে সেসব চিকিৎসাকে সর্প-দংশনের নিশ্চিত চিকিৎসা ভেবে আঁকড়ে ধ'রে থাকবে, তার চেয়ে আর আশ্চর্যের কি হতে পারে! ওঝার দাপটও আমরা সহ্য ক'রে চলেছি!

সর্প-দংশনের চিকিৎসার ব্যাপারে ওঝাদের চিকিৎসা-প্রণালীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) মন্ত্র (খ) প্রক্রিয়া ও (গ) দ্রব্যগুণ। অবশ্য এই তিন শ্রেণীর চিকিৎসার মধ্যে কোন বাঁধাধরা প্রাচীর নেই। কখনও একটির সাহায্য নেওয়া হয়, কখনও বা দুটির সাহায্য নেওয়া হয়, কখনও বা তিনটিরই সাহায্য নেওয়া হয়।

তিনটির মধ্যে মন্ত্রই সকলের উচ্চে অধিষ্ঠিত। মন্ত্র সর্বশক্তিক্ষম। উচ্চারণমাত্রই সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ থেকে বিষ পালাতে পথ পায় না! কিন্তু এই মন্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কি দেখতে পাই? বেশির ভাগ কথাই হ'ল অর্থহীন আগড়ম-বাগড়ম। আর যেসব কথা থাকে তাতে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ বিষ চ'লে যাক, এরকম জোর একটা ইচ্ছা প্রকাশ; দ্বিতীয়তঃ সাপের কয়েকটি শত্রুর নাম করা।

ইচ্ছা ও কাজে যে ব্যবধান, আদিম মানুষ তা' ঠিক বুঝত না। সরল কল্পনাপ্রবণ তার মনে ইচ্ছাই ছিল কাজ। কোন কিছু ইচ্ছা করলেই তা' যেন স্বতঃই কাজে পরিণত হয়। মনের চিন্তা ও বাস্তব

ঘটনাকে সে এক ক'রে দেখত। মন্ত্রের মূলে এই চিন্তাধারাই কাজ করেছে। সাপের বিষ চ'লে যাক, এই জোর ইচ্ছা প্রকাশই সাপের বিষ যেন নষ্ট ক'রে দেয়। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—'নেই বললেই সাপের বিষ থাকে না'। এর মধ্যেও ঐ একই আদিম চিন্তাধারা কাজ করছে। কোন কোন মন্ত্রে এই জোর ইচ্ছা প্রকাশকে আরও দৃঢ় করা হয়েছে "বিষহরির আজ্ঞে" বা "মা মনসা দেবীর আজ্ঞে" ব'লে।

বেঁজি, ময়ূর ইত্যাদি সাপের বিরোধী পক্ষ আছে। এরা সাপকে—বিষধর সাপকেও মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে। কেউ কেউ আবার সাপ খেয়েও থাকে। অসহায় আদিম মানুষ শত্রুকে বড় ভয় করত। সেজন্যে সে মনে করেছিল, সাপের শত্রুর নাম করলে সাপ কেন—সাপের বিষও পালাতে বাধ্য! সাপের মন্ত্রে তাই আমরা দেখি, সাপের কোন কোন শত্রুর নামোল্লেখ। সাপের বিষ নামানোর একটি মন্ত্র এখানে দেওয়া হ'ল :

বেঁজি বলে অহিনী তোরে আমি কাটি।
কালোয়ার কালকূট বিষ মোরে দেয় বাটি ॥
মনসার মন্ত্রেতে তোমায় ফুঁয়ে করলাম জল।
দেখি তুই এইবারেতে কোথা পাস্ স্থল ॥
মনসার মন্ত্রের তেজে বিষ জল হয়ে যায়।
গরুড় স্মরণে বিষ কিছু নাহি রয় ॥
কার আজ্ঞে ?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে ॥

মনসা-মঙ্গল গ্রন্থে থেকে সাপের বিষ নামানোর একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হ'ল :

কি কর শিমুলডালে ধুকরিয়া কঙ্ক।
মোর পুত্র হৈয়াছে সাপিনীর ডঙ্ক ॥

সাপিনী ধরিয়া খাও বিষহরি বলে।
কঙ্ক স্মরণে বিষ ধিকি ধিকি উলে॥
হাড় মাংস রক্তো বিষ হাড়ে কর বাসা।
খেদাড়িয়া দেহ বিষ বলেন মনসা॥
বিষের বিষম ডাক দিল মত্ত শিখী।
মউর-স্মরণে বিষ উলে ধিকি ধিকি॥
বেঁজি বলে অহীনীল তোরে আমি কাটি।
কালিনীর কালকুটি মোরে দেহ বাটি॥
পাতিয়া যুগল কর মাগেন গরল।
মনসার মন্ত্রে বিষ ফুঁয়ে হৈল জল॥

পল্লী-অঞ্চলে ওঝারা সাপের বিষ নামাতে যে সমস্ত মন্ত্র পড়ে, সেগুলি ওপরে লিখিত মন্ত্র ছুটিরই রকমফের। কোন কোন মন্ত্রে সাপকে উদ্দেশ্য ক'রে গালিগালাজও থাকে। ওঝারা ভাবে, গালিগালাজ করলে অন্ততঃ লজ্জাতেও সাপের বিষ দূরে পালাবে। এই গালিগালাজ করতে ওঝাকে যে সর্পদষ্ট ব্যক্তির কাছে যেতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। সর্প-দংশনের কোন সংবাদ পেলে কখনও কখনও ওঝা নিজের বাড়ির ছাদে গিয়ে ওঠে—আর সেখান থেকেই চিৎকার ক'রে গালিগালাজ আরম্ভ করে! কোন কোন ওঝা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গালিগালাজ করে।

এই তো গেল মন্ত্রের কথা। এখন প্রক্রিয়ার কথা বলি। সাপের বিষ নামানোর উদ্দেশে অসংখ্য রকমের প্রক্রিয়ার আশ্রয় ওঝারা নেয়; তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করছি।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির পিঠে চাপড় মেরে ওঝা কখনও কখনও বিষ নামায়। তারা দাবি করে, পিঠে মাত্র চাপড় মারলেই সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ থেকে বিষ উবে যায়! আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, এই চাপড় সর্পদষ্ট ব্যক্তির পিঠে না মেরে অন্য কোন ব্যক্তির পিঠেও মারা যায়, তাতেও কাজ হয়। যে ব্যক্তি সর্প-দংশনের

সংবাদ ওঝাকে জানায়, কখনও কখনও তারই গালে ওঝা এই চাপড় বসিয়ে দেয়! বলা বাহুল্য, ওঝা এই চাপড় খুব জোরেই মারে—এবং এক চাপড়েই সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ থেকে বিষ নেমে যায়! সংবাদদাতারও একটা কর্তব্য আছে। ওঝার কাছে "সাপে-কাটা"র কথা না ব'লে "কাটা-ঘা"র কথা যেন বলে। নইলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ থেকে বিষ আর নামবে না। কাটা-ঘা বললেই ওঝা বুঝে নেবে, সাপে কেটেছে।

এই চাপড় মারা প্রক্রিয়া একটি লাক্ষণিক কাজ। বিষাক্ত রক্ত দষ্টস্থান থেকে বের ক'রে দেওয়ার উদ্দেশে অনেক সময় তার চারধার হাত দিয়ে চাপ দেওয়া হয়। তা' থেকেই এই লাক্ষণিক কাজ চাপড় মারার সৃষ্টি।

হাত-চালা ব'লে আর একটি প্রক্রিয়া আছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি থেকে কিছু দূরে ওঝা বা ওঝার মনোনীত কোন ব্যক্তি মাটিতে হাত রেখে ব'সে থাকে। তারপর সে খুব ধীরে ধীরে তার হাত সর্পদষ্ট ব্যক্তির দিকে নিয়ে যায়। কিছুদূর হাতটি নিয়ে যাওয়ার পর হাতটাকে সে আবার টেনে নিয়ে এসে পূর্বস্থানে রাখে। পুনঃপুনঃ এরকম করে। এরকম করলে সাপের বিষ নেমে আসে ব'লে ওঝা দাবি করে। এই প্রক্রিয়াও একটি লাক্ষণিক কাজ মাত্র—এবং আদিম চিন্তাধারা প্রসূত। হাতটাকে টেনে নিয়ে এসে পূর্বস্থানে রাখা হচ্ছে; সুতরাং সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ থেকেও বিষ নেমে বেরিয়ে আসছে। ওঝাদের কেমন একটা ধারণা থাকে, সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহের ওপর অংশে বিষ আছে; সে বিষ তাকে নামাতে হবে।

কড়ি-চালা আর একটি প্রক্রিয়া। তিনটি কড়ি মন্ত্রপূত ক'রে এদিক্-ওদিক্ ছড়িয়ে দেয় ওঝা। যে সাপ কোন ব্যক্তিকে দংশন করেছে, এই তিনটির একটি কড়ি সেই সাপের মাথায় চেপে ব'সে তাকে বাধ্য ক'রে নিয়ে আসে। তখন সেই সর্পদষ্ট ব্যক্তির

ক্ষতস্থান থেকে মুখ দিয়ে নিজের বিষ তুলে নিয়ে দুধে-ভরা একটি পাত্রে ঢেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুধ নীল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, গোটা ব্যাপারটাই ওঝার কারসাজি মাত্র। একটি সাপের মাথায় সিরিশ আঠা দিয়ে বা অন্যভাবে একটি কড়ি আটকে সাপটাকে সঙ্গে ক'রে সে লুকিয়ে নিয়ে আসে। ছড়ানো তিনটি কড়ির একটি সকলের অলক্ষ্যে তুলে নিয়ে সে সাপটাকে ছেড়ে দেয়। দুধ যে নীল হয়ে যায়, তাতে লুকিয়ে নীলবড়ি ফেলে দেয় ব'লে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত, দুধে সাপের বিষ মিশলে তা' নীল হয়ে যায় না। কখনও ওঝা দশ দিকে দশটি কড়ি ছেড়ে দেয়। দশটি কড়ির প্রত্যেকটি এক একটি সাপের মাথায় ব'সে দশটি সাপ নিয়ে আসে। যে সাপটি দংশন করেছে, মাত্র সেই সাপটিই কিন্তু দষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে বিষ তোলে!

ছড়িয়ে দেওয়ার পর কোন কোন ওঝার কড়ি আপনা থেকে চলতে থাকে। তাতে লোকে বেশী আশ্চর্য হয়। কিন্তু এতেও থাকে কারসাজি। গুবরে পোকার পিঠে কড়ি আটকে দেওয়া হয়। গুবরে পোকা চলতে থাকে, কড়িও চলতে থাকে। ওঝার প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধায় সাধারণ লোক তাকে সন্দেহ করে না।

ওঝারা কখনও কখনও ক্ষতস্থানে মুরগীর ছানা বসিয়ে বিষ নামানোর দাবি করে। মুরগীর মলদ্বার সামান্য ছুলে ওঝা ক্ষতস্থানে তা' লাগিয়ে দেয়। মুরগীর ছানাটা ম'রে যায়। ওঝা বলে, মুরগীর মলদ্বারের পেশী ক্ষতস্থান থেকে বিষ টেনে নেয়, আর তাতেই মুরগীটা ম'রে যায়। এরকম একটার পর একটা মুরগী ক্ষতস্থানে ওঝা বসাতে থাকে। যখন আর মুরগী মরে না, ওঝা বলে বিষ নেমে গেছে।

এ প্রক্রিয়ায় কারসাজি তত না থাকলেও অজ্ঞতা আছে। মুরগীর মলদ্বারের পেশী ক্ষতস্থান থেকে বিষ শোষণ ক'রে নিতে পারে না। বড় জোর ক্ষতস্থানের রক্ত মুরগীর দেহের রক্তের

সঙ্গে মিশলে মুরগীটা মারা যেতে পারে, আর তাতে বোঝা যায় ক্ষতস্থানে বিষ আছে। চিকিৎসকরা কখনও কখনও সর্পদষ্ট স্থান থেকে রক্ত নিয়ে পিচকারির সাহায্যে মুরগীর দেহে ঢুকিয়ে দেন। মুরগীটা ম'রে গেলে বুঝতে পারেন, ক্ষতস্থানে বিষ আছে।

আর আছে দ্রব্যগুণ। কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, মন্ত্রের কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু দ্রব্যগুণ? দ্রব্যগুণ তো অস্বীকার করার উপায় নেই। সত্যি এমন কোন মূর্খ নেই যে দ্রব্যগুণের কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু দ্রব্যের অন্তর্নিহিত গুণ এক কথা; আর দ্রব্যের রহস্যময় অলৌকিক গুণ আর এক কথা। অজ্ঞ সাধারণ লোকে শেষোক্ত অর্থেই দ্রব্যগুণ শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকে। নানা গাছ-গাছড়ার নানা ধরনের রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোন গাছ-গাছড়ার সন্ধান পাওয়া যায় নি যা' সাপের বিষ নষ্ট করতে পারে। ঈশের মূল থেকে আরম্ভ ক'রে শত শত গাছ-গাছড়া সাপের বিষ নষ্ট করতে পারে ব'লে সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এইসব গাছ-গাছড়ার প্রত্যেকটি নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে কোনটারই সাপের বিষ নষ্ট করার ক্ষমতা নেই। সাধারণতঃ দেখা যায়, যেসব গাছ বা গাছের শিকড় চলিষ্ণু সাপের চেহারার মত আঁকাবাঁকা, তাদের সাপের বিষ নষ্ট করার ক্ষমতা আছে ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আদিম মানুষের চিন্তাধারা কাজ করেছে। কোন দুটি জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য দেখলে সে ধ'রে নিত, সে দুটি জিনিসের মধ্যে গুণের দিক্ দিয়েও কোন সম্বন্ধ আছে। গাছ বা শিকড়গুলি সাপের মত দেখতে। সুতরাং তাদের সাপের বিষ নষ্ট করার ক্ষমতা আছে।

ঝোপে-ঝাড়ে চক্রধর সাপের সঙ্গে বেঁজির লড়াই বাধে। ক্ষিপ্রতার জন্যে অধিকাংশক্ষেত্রে বেঁজিরই জিত হয়। অনেকের ধারণা, বেঁজি লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে গাছবিশেষের শিকড় খেয়ে

আসে। তাতেই সাপে দংশন করলেও বেঁজির কিছু হয় না। এ কথা ঠিক নয়। লড়াইয়ে সাপ ঠিকমত দংশন করতে পারায় বেঁজিও মারা যায়, তার নজির আছে।

সাপে বেঁজিতে লড়াই

ওঝা অনেক সময় ক্ষতস্থানে বিষ-পাথর বসিয়ে সাপের বিষ টেনে নেওয়ার দাবি করে। এই পাথর সাপের বিষ শুষে নিতে পারে ব'লে সাধারণ্যেও মনে করা হয়। কিন্তু এ কথায় কোন

সত্য নেই। বেশির ভাগ বিষ-পাথর হ'ল ঝামা-জাতীয় পাথর। এই জাতীয় পাথর সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকলে খানিকটা জল শুষে নিতে পারে। তাই থেকেই বিষ-পাথরের বিষ শুষে নেওয়ার কথার চলন হয়েছে। ক্ষতস্থানে বিষ-পাথর লাগিয়ে ওঝা বলে, বিষ-পাথরটা প'ড়ে গেলে বুঝতে হবে ক্ষতস্থানে আর বিষ নেই। আসলে প্রথম প্রথম ক্ষতস্থানে রক্ত থাকে; সে রক্তে ভিজে বিষ-পাথর আটকে থাকে। রক্ত শুকিয়ে গেলে বিষ-পাথর প'ড়ে যায়। কখনও কখনও ওঝা কোন পাত্রে-রাখা দুধে বিষ-পাথর ডুবিয়ে ক্ষতস্থানে বসায়। দুধে-ভেজা বিষ-পাথর ক্ষতস্থানে আটকে যায়। শুকিয়ে গেলে প'ড়ে যায়। বিষ-পাথরটা বারবার দুধে ডুবিয়ে ক্ষতস্থানে বসাতে বসাতে দুধটা নীল হয়ে যায়। ওঝা বলে, বিষ-পাথর দষ্ট ব্যক্তির দেহ থেকে যে বিষ টেনে নিয়েছে, তাই মেশাতে দুধ নীল হয়ে গেছে। আসলে এ হ'ল ওঝার কারসাজি; দুধের সঙ্গে নীলবড়ি মিশিয়ে দেয়।

কেঁচো খেলে সাপের বিষ নষ্ট হয়ে যায় ব'লে অনেকের বিশ্বাস। সেজন্যে ওঝা কখনও কখনও পাকা কলার মধ্যে কেঁচোর টুকরো পুরে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খেতে দেয়। বলা বাহুল্য, এও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এ ধারণার মূলে কি আছে, নিশ্চিত ক'রে বলা শক্ত। তবে বেঁজিতে কেঁচো খায়। আর সাপের বিষে বেঁজির কিছু হয় না, ভুল ক'রে মনে করা হয়। এ থেকেই কেঁচো খেলে সাপের বিষ নষ্ট হয়ে যায় ব'লে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে ব'লে মনে হয়।

সাপের মাথায় বা গায়ে এঁটুলি জাতীয় একপ্রকার কীট দেখা যায়। সাপের দেহের রক্ত খেয়েই এরা জীবনধারণ করে। এই এঁটুলি সাপের বিষ নষ্ট করতে পারে ব'লে মনে করা হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী গ্রন্থে আমরা পাই—"সাপের এঁটুলি আনে খুঁজি বেশ্যাঘরে।" ওঝারা তথা সাপুড়েরা বলে, সর্পদষ্ট ব্যক্তির গায়ে এই এঁটুলি বেঁধে দিলে বিষ নষ্ট হয়ে যায়। কারও গায়ে বেঁধে

রাখলে সাপে দংশনও করে না। এই এঁটুলি তারা অনেক চড়া দামে বিক্রি করে। ২০।২৫ বছর আগের কথা বলছি, উত্তরবঙ্গের কোন ধনী ভদ্রলোক ২০০ টাকা নগদ দিয়ে এক সাপুড়ের কাছ থেকে সাপের একটি এঁটুলি কিনেছিলেন। সাপুড়ে লোকটি এসেছিল অতিথিহিসাবে একবেলা তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্যে। আহার করার সময় কথায় কথায় সে গল্প করে, সাপ ধরার উদ্দেশে সে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘন্টাখানেক এধার-ওধার ঘুরে সে ছুটে আবার আসে ভদ্রলোকের কাছে এবং অপরে যাতে শুনতে না পায় এমন নিম্নস্বরে বলে—এক অমূল্য জিনিস পেয়েছি। আপনাকেই দেব ব'লে ছুটে এসেছি। আর কাউকে বলি নি। আপনাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে যে জঙ্গলটা আছে, সেখান থেকে এক কাল কেউটে ধরেছি। তার মাথায় ছিল এঁটুলি। এঁটুলিটা আমি এনেছি। আমায় একটু নেকড়া ও সুতো দিন। আমি এঁটুলিটা ভাল ক'রে বেঁধে দিই। সোনার একটা মাদুলি তৈরি ক'রে তাতে এঁটুলিটা পুরে হাতে বেঁধে রাখবেন। এ এঁটুলি হাতে থাকলে সাপে তো কামড়ায়ই না, অন্য কোন বিপদ-আপদ ঘটে না। মামলা-মকদ্দমায় নিশ্চিত জিত। একমুহূর্ত থেমে আরও নিম্নস্বরে সে বলে, আপনার কাছ থেকে আর কি নেব কর্তা মশায়। দু' শ' টাকা ফেলে দেবেন। লোকটির বাক্‌চাতুর্যে ভুলে ভদ্রলোক সত্যি সত্যি সেদিন দু' শ' টাকা ফেলে দিয়েছিলেন!

সাপের এঁটুলি যে সাপের বিষ নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে, এ ভ্রান্ত ধারণার মূল কোথায়? অনেকেরই এই ভুল ধারণা আছে, সাপের বিষ বুঝি সাপের দেহে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। বিষ যখন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে, তখন যে জীব সে দেহের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে, সে জীব নিশ্চয়ই বিষ-নিবারক ক্ষমতা রাখে। এভাবেই এঁটুলির সাপের বিষ নষ্ট করার ক্ষমতার ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ওঝারা দাবি করে, কোন কোন ব্যাঙের দেহের রস সাপের বিষ

নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। কোন কোন ব্যাঙের দেহে নাকি পাথর জন্মায়; সে পাথরও সাপের বিষ নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। এ ধারণা যে ভুল, তা' বলাই বাহুল্য। সাপে ব্যাং খায়; ব্যাংও সাপ খায়। কোন কোন বড় জাতের ব্যাং বিষহীন কেন—বিষধর সাপও খেয়ে থাকে। কোলা ব্যাং সাপ খায়। বিষধর সাপ খেয়ে

ব্যাং সাপ খাচ্ছে

হজম করে; সুতরাং ঐ ব্যাঙের দেহে নিশ্চয়ই বিষ-প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। অজ্ঞ লোকের এই চিন্তাধারায় এই সংস্কারের সৃষ্টি।

সাধারণে প্রচলিত সর্প-দংশন চিকিৎসার বুজরুকি সম্বন্ধে এত কথা বলার পরেও কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়ে যায়। সর্পদষ্ট অনেক ব্যক্তিকে ওঝারা তো বাঁচিয়ে তোলে। তাদের চিকিৎসায় কোন সত্য না থাকলে এ কি ক'রে সম্ভব হয়? এর উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করি, তারা কি ধরনের সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলে?

বিষধর সাপ—এমন কি মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করলেই মানুষ মরতে বাধ্য নয়। মারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করেছে, কিন্তু ঠিকমত দংশন করতে পারে নি। ঠিকমত দংশন করতে না পারায় ঠিকমত বিষ—মৃত্যুকর মাত্রায় বিষ ঢালতেও পারে নি। এমনও হতে পারে, সে সময় বিষগ্রন্থিতে মৃত্যুকর পরিমাণ বিষই ছিল না। নানা কারণে তা' ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে উপরে-উপরে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটি নিজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির জোরে—কখনও কখনও বা সামান্য সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠে। অপরপক্ষে এমন ঘটনাও দেখা যায়, বিষহীন সাপে কাউকে কামড়েছে—হয়তো তাকে কামড়াতেও পারে নি, কিন্তু সাপে কামড়েছে এই ভয়েই লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেছে। নিছক ভয়ে যে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে—এমন কি লোকে মারাও যেতে পারে, সাধারণভাবে তা' আমরা বুঝি না। এসব ক্ষেত্রেও সর্পদষ্ট ব্যক্তি অথবা সর্পদষ্ট হয়েছে ব'লে ভুলক্রমে গণ্য ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত নিজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির জোরে অথবা সামান্য সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে উঠতে পারে।

ওঝারা যে মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচায়, এসব সর্পদষ্ট ব্যক্তিকেই বাঁচায়। কিন্তু সাধারণ অজ্ঞ লোক ঠিক বুঝতে না পেরে ওঝার জয়গান করে।

সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তিকে দাহ না ক'রে অথবা কবর না দিয়ে তাকে কলা গাছের ভেলায় অথবা অন্য কোনভাবে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি আছে। এ রীতি ভাল। তবে এর উদ্দেশ্যের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তা' ঠিক নয়।

আমরা বলি, লোকটা মারা গেছে। এই মারা যাওয়া দু' ধরনের হতে পারে—সাধারণ মৃত্যু ও প্রকৃত মৃত্যু। কোন লোকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হলে সাধারণভাবে আমরা তাকে মৃত বলি। কিন্তু এ তার প্রকৃত মৃত্যু নয়। মানুষের দেহ বহু

ছোট ছোট কোষ দিয়ে তৈরী। এই কোষগুলির প্রত্যেকটি এককভাবে জীবিত। এই কোষগুলির সবগুলির—অন্ততঃ অধিকাংশেরই মৃত্যু হলে তবেই মানুষের প্রকৃত মৃত্যু ঘটে। সাধারণ মৃত্যুর পর প্রকৃত মৃত্যু সাধারণতঃ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের কোষগুলি মারা যেতে থাকে। কিন্তু কেউ কোন আকস্মিক কারণে মারা গেলে সাধারণ মৃত্যুর পর প্রকৃত মৃত্যু নাও ঘটতে পারে অর্থাৎ "মৃত" ব্যক্তি বেঁচে উঠতে পারে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছল। আপনা থেকেই তারা আবার চলতে শুরু করেছে। কোষগুলি বেঁচেই ছিল ; সমগ্রভাবে মানুষটি বেঁচে উঠেছে।

সর্প-দংশনে মৃত ব'লে গণ্য ব্যক্তিও এভাবে—কখনও কখনও সামান্য সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠে। লোকে বলে, কোন ওঝা কৃপাপরবশ হয়ে তার "মহাজ্ঞান" শক্তিবলে লোকটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। মনসা মঙ্গল গ্রন্থে আছে : 'ওঝা ধন্বন্তরি বেটা মহাজ্ঞান জানে'।

সর্পদষ্ট ব্যক্তি বেঁচে না উঠলে ওঝারা নানা অজুহাত দেখায়। একটি অজুহাত যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। কোন ওঝা সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ থেকে বিষ নামাতে চেষ্টা করছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক ওঝা তার অপ্রত্যক্ষে মন্ত্রবলে গণ্ডি দিয়ে বিষ নামাতে দিচ্ছে না—বিষ ভেরে দিচ্ছে! প্রথম ওঝাকে অপদস্থ করাই এই কাজের উদ্দেশ্য। তাতে সর্পদষ্ট লোকটি মারা গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বী ওঝার বিবেকে বাধে না।

সাপুড়ের কারসাজি

সাপকে আমরা ভয় করি। সে কারণে সাপুড়েকেও আমরা ভয় করি। ভয় করি, সমীহও করি। বিষধর সাপ নিয়ে কেমন অবলীলায় খেলা দেখায় তারা। নিশ্চয়ই তারা রহস্যময় অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কিন্তু বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখানোর বিস্ময়ের কিছু নেই। এতে না আছে মন্ত্রের দাপট, না আছে শিকড়-বাকড়ের মাহাত্ম্য। আছে নিছক কারসাজি।

গেলুড়ে সাপুড়ের কেউটে সাপ, আর তার বাচ্চা

বিষধর সাপ নিয়ে সাপুড়ে খেলা দেখায়। কিন্তু সেসব সাপের বিষদাঁত আগে থেকে ভেঙে দেওয়া হয়—বিষগ্রন্থিও উপড়ে নেওয়া হয়। বিষদাঁত ভাঙা থাকায় তারা বিষহীন সাপের মতই হয়ে পড়ে।

সক্রিয় বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সক্রিয় বিষদাঁতের পেছনে অঙ্কুরাবস্থায় যে বিষদাঁত থাকে, তা' ভাঙা হয় নি। বিষগ্রন্থিও উপড়ে ফেলা হয় নি। অঙ্কুরাবস্থায় যে বিষদাঁত ছিল, তা' বড় হয়ে উঠেছে—সপ্তাহ তিনেক লাগে সক্রিয় বিষদাঁতে পরিণত হতে, সাপুড়ে খেয়াল

করে নি। সে সাপ নিয়ে খেলা দেখাতে দেখাতে সাপুড়ে

সচরাচর-দৃষ্ট সাপুড়ে

ছোবল খেয়েছে, আর মারা গেছে, তার বহু নজির আছে।

মেয়ে সাপুড়ে

ওড়িশার সাপুড়ের হাতে শঙ্খচূড়

মন্ত্রতন্ত্রে অভিজ্ঞ যে সাপুড়ে কত সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রাণ বাঁচিয়েছে

ব'লে দাবি করে, সে নিজেরই প্রাণ বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে নি। তার শাগরেদরাও তাকে কোন সাহায্য করতে পারে নি।

সাপুড়ের প্রধান খেলা—বাঁশি বাজিয়ে গোখরো-কেউটে সাপ নাচান। সাপুড়ে পেট-মোটা তুবড়ি বাঁশি বাজায়, আর তার তালে চক্রধর সাপ মাথা উঁচু ক'রে ফণা ধ'রে নাচতে থাকে। "ফুঁসিস না, ফুঁসিস না, নাচ নাচ হেলে-দুলে"—সাপুড়ের এই খেলা যতই আকর্ষণীয় হ'ক, বাঁশির সুর শুনে সাপ যে মাথা দোলায় না, বিশদভাবে তা' আগে আলোচনা করেছি।

আমেরিকার সাপুড়ের মুখে জ্যান্ত ঝুমঝুমি সাপ

কোন চক্রধর সাপকে ধরার পর সাপুড়ে তাকে হাঁড়িতে অথবা অনুরূপ কোন বন্ধ জায়গায় সপ্তাহখানেক আটকে রাখে। কিছু খেতে দেয় না—জলও দেয় না। বন্ধ জায়গায় কিছুদিন থাকায় সাপটা নির্জীব হয়ে পড়ে। সাপের প্রকৃতিও এ নির্জীবতা আনায় সাহায্য করে। তখন তাকে বের ক'রে সাপুড়ে তার বিষদাঁত ভেঙে দেয়। সাধারণতঃ সাপটার ঘাড় বাঁ হাতে চেপে ধ'রে ডান হাতে গরম একটা সাঁড়াশি নিয়ে সাপুড়ে সাপের মুখের কাছে ধরে। তাপের যন্ত্রণায় সাপ হাঁ করলে সে সাঁড়াশি সাপুড়ে সাপের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়—আর বিষদাঁত টেনে তুলে আনে, বিষগ্রন্থিও উপড়ে নেয়। সাপুড়েদের ভাষায় বিষদাঁত তোলাকে "কামান" বা "পাট করা" বলে। বিষদাঁত-তোলা সাপকে "কামানো সাপ" বলে। যেসব সাপের বিষদাঁত তোলা হয় নি, তাদের তারা বলে "আস্তা সাপ"।

কামানোর পর সাপুড়ে কয়েকদিন কিছু সময়ের জন্যে সাপটার লেজ ধ'রে ঝুলিয়ে দেয়। সাপটা দেহ বেঁকিয়ে যেই মুখ ওপরে ওঠাতে যায়, জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে সাপুড়ে সাপটাকে আবার সোজা ক'রে দেয়। এতে সাপের শিরদাঁড়া আলগা হয়ে যায় —এবং সে আর জোরে চলাফেরা করতে পারে না। তারপর হাত নাড়িয়ে বা বাঁশি এপাশ-ওপাশ ক'রে সাপুড়ে সাপকে প্রসারিত ফণা নিয়ে দাঁড়াতে—নাচাতে শেখায়। এই নাচ শেখানোকে সাপুড়েরা বলে "দণ্ড ধরান।"

সাপুড়েরা আর একটি খেলা দেখায়। যেখান থেকে খুশী সে সাপ বের ক'রে দেবে। সাপুড়ে তার তুবড়ি বাঁশি বাজায়। হাত নাড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী ক'রে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়তে থাকে। তারপর যেখান থেকে সাপ বের করতে হবে, সেখানে হঠাৎ ঝুঁকে প'ড়ে বলে—ঐ সাপ বেরিয়েছে! ঐ সাপ বেরিয়েছে! সত্যি সত্যি দেখা যায় সেখানে একটা সাপ চলাফেরা করছে। সাধারণতঃ ঢেমনা সাপই সাপুড়েরা বের ক'রে থাকে। এ সাপ অবশ্য কোন বন্য সাপ নয়। সাপুড়ের লম্বা ঢিলা পোশাকের তলায় একটি থলির মধ্যে এ সাপ লুকনো থাকে। সুবিধামত কায়দামাফিক সাপটাকে সে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে—ঐ সাপ বেরিয়েছে।

সাপুড়ের থলির মধ্যে ঢেমনা সাপ

সাধারণতঃ ইঁটের পাঁজা, ঝোপ-জঙ্গল, পাঁচিলের গর্ত বা

অনুরূপ কোন স্থান থেকে সাপুড়ে সাপ বের করে। কারণ ঐসব জায়গায় সাপ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন সাপুড়ে তাদের কেরামতির গর্বে এমন জায়গা থেকেও সাপ বের করে যেখানে কোনক্রমেই সাপ থাকতে পারে না। আমি তখন পাঠশালার পড়ুয়া। দু' হাত দিয়ে একটি বই ধরেছিলাম। একটি সাপুড়ে সেই বইয়ের মধ্যে থেকেই সাপ বের করেছিল। বইয়ের মধ্যে বড় একটা সাপ কেমন ক'রে থাকবে, এ প্রশ্ন তখন আমার মনে উদয় হয় নি; সাপুড়ের কেরামতিতে তখন আমার মন ছিল আবিষ্ট। কিন্তু আজ বুঝতে পারি, সাপুড়েটা বাস্তবতা-জ্ঞান-বর্জিত ছিল। একটা বইয়ের মধ্যে ঢেমনা সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে না, এ বুদ্ধি তার থাকা উচিত ছিল।

মানুষে বানরের খেলা দেখে, ভালুকের খেলা দেখে, যমের দূত সাপের খেলা তাকে যে আকর্ষণ করবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু দু' পয়সা বেশী উপার্জনের লোভে সাপুড়ে কেবল খেলা দেখায় না, শিকড়-বাকড় বিক্রির উদ্দেশে নানা কারসাজিরও আশ্রয় নেয়।

গাছবিশেষের শিকড়ের উগ্রতা সাপের বিষ যে নষ্ট করতে পারে, তা' প্রমাণের উদ্দেশে সাপুড়েরা যেসব কারসাজির আশ্রয় নেয়, তাদের কয়েকটি বলি। কোন গাছের শিকড় নিয়ে সাপুড়ে একটি সাপের মুখের কাছে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এতে কিন্তু ঐ শিকড়ের গুণের কোন ব্যাপার নেই। যে সাপটার সামনে শিকড় ধরা হয়, আগে থেকেই তার মুখে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে ঘা ক'রে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শিকড় কেন—যে কোন জিনিস ঐ সাপের সামনে নিয়ে যাওয়া হ'ক না কেন, আহত হওয়ার ভয়ে সাপ তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

কখনও কখনও সাপুড়ে তাদের নিজেদের পায়ে বা হাতে আঁচড় কেটে তাতে ঐ শিকড় লাগিয়ে বলে—দেখুন, সাপের

বিষে কিছুই হ'ল না। সাধারণ লোকে তাই দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যে সাপের বিষদাঁত দিয়ে আঁচড় দেওয়া হয়, সে সাপের বিষদাঁত থাকলেও ঘাড়ের কাছে ছেঁদা ক'রে বিষগ্রন্থি কেটে নেওয়া হয়েছে; ক্ষত পরে শুকিয়ে গেছে। ফলে বিষদাঁত দিয়ে আঁচড় কাটলেও বিষের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। সেজন্যে কোন ক্ষতিও হয় না।

বিষ্ণুপুরে সাপের ঝাঁপান

কোন কোন সাপুড়ে আবার নিজের হাতের কোন আঙুলে বা অন্য কোন অংশে ক্ষত করে। সে ঘা শুকিয়ে আসে। সাপ-খেলা দেখাতে দেখাতে সকলের অলক্ষ্যে সে ক্ষতের শুকনো ছালটা তুলে ফেলে আর বলে, তার অসতর্কতায় সাপে তাকে দংশন করেছে! সকলে ভয় চকিত হয়ে দেখে, সত্যিই তো ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পর্যন্ত বেরুচ্ছে! সাপুড়ে তখন তার শিকড়-বাকড়ের সাহায্যে ক্ষতস্থান থেকে বিষ নামায়!

বিষ্ণুপুরে সাপের ঝাঁপান

আমাদের দেশে বিভিন্ন দেব-দেবীকে ঘিরে নানা পরব প্রচলিত

আছে। সর্প-অধিষ্ঠাত্রী মা মনসা সর্প-সংকুল বাংলার একজন সর্বজনপূজ্যা দেবী। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে (কোন কোন স্থানে ভাদ্র সংক্রান্তিতে) বাংলার বহুস্থানে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এই দেবীর পূজা হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে চাঁদ সদাগর-লখিন্দর-বেহুলাকে নিয়ে লিখিত মনসা-মঙ্গলের কাহিনী মধুর কণ্ঠে গীত হয়। বাংলার স্থানে স্থানে সাপের ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়।

ঝাঁপান আসলে ওঝা তথা গুনিনদের সাপ নিয়ে নানা কসরৎ প্রদর্শন। এই উদ্দেশে বিভিন্ন জায়গা থেকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সাপের গুনিনদের সমাবেশ ঘটে।

সাপ ধরার কৌশল

কখন প্রয়োজনের খাতিরে—কখনও বা শখের খাতিরে মানুষ বন্য জন্তু-জানোয়ার ধরে। সাধারণতঃ দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক এক এক ধরনের বন্য জন্তু ধরতে অভ্যস্ত। এই সব লোকে বংশ-পরম্পরায় ছোটবেলা থেকেই ঐ বন্য জন্তু ধরার কৌশল শেখে।

ভারতে কয়েকটি সম্প্রদায় আছে যাদের বংশগত পেশাই হ'ল সাপ-ধরা। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও সাধারণ-ভাবে তারা সাপুড়ে ব'লে অভিহিত। সচরাচর যারা সাপ-খেলা দেখায়—যাদের আমরা খেলুড়ে সাপুড়ে বলতে পারি—তাদের থেকে এদের পার্থক্য এই যে, এরা সাধারণতঃ সাপ নিয়ে খেলা দেখায় না। দেশ-বিদেশে সাপ ও সাপের বিষ বিক্রি করাই এদের প্রধান কাজ। খেলুড়ে সাপুড়েরা তাদের বিষদাঁত-ভাঙা সাপ সাধারণতঃ এদের কাছ থেকেই কিনে থাকে। এসব সাপুড়ে যে সাপ—বিষধর সাপ ধরে, তার মধ্যে মন্ত্র বা জড়িবুটির কোন

মাহাত্ম্য নেই। সাপদের ধরন-ধারণের অভিজ্ঞতা, হাতের কৌশল ও অভ্যাস বিষধর সাপ ধরার মূলে রয়েছে।

কোন গর্তে সাপ বাসা বেঁধেছে বা ঢুকেছে। সাপুড়ে এসে প্রথমে দূর থেকে গর্তের ভেতর উঁকি মেরে দেখে, সাপের মুখটা গর্তের ভেতর দিকে আছে, না বাইরের দিকে আছে। সাধারণতঃ সাপের মুখ গর্তের ভেতর দিকেই থাকে। মুখ গর্তের ভেতর দিকে থাকলে সাপুড়ে ধীরে ধীরে তার ডান হাতটা ঢুকিয়ে দেয় গর্তের ভেতর সাপের লেজটা ধরার উদ্দেশে। লেজটা ধ'রেই এক নিমেষে সে সাপটাকে সড়াৎ ক'রে টেনে বের ক'রে নিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর তাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরে ফেলে। সাপের লেজ ধ'রে ওঠার পর কখনও কখনও সাপুড়ে সাপটাকে কয়েকবার জোরে ঝাঁকুনি দেয়। তাতে সাপ সাময়িকভাবে নির্জীব হয়ে পড়ে। তখন তাকে ঝাঁপিতে পোরা সহজ হয়। কখনও কখনও সাপুড়ে গর্তের মধ্যে তার বাঁ হাত ঢুকিয়ে সাপের লেজ ধ'রে ধীরে ধীরে তাকে টানতে থাকে। টানতে টানতে যখন সাপের ঘাড়টা বেরয়, তখন সাপুড়ে খপ্‌ ক'রে ডান হাত দিয়ে সাপটার ঘাড় জোরে চেপে ধরে। তারপর তাকে ঝাঁপিতে পোরে। বলা বোধ হয় বাহুল্য, সাপুড়ে যখন লেজটা ধীরে ধীরে টানতে থাকে, তখন সাধারণতঃ সাপ ভয়ে গর্তের মধ্যে আরও ঢোকার চেষ্টা করে।

চক্রধর সাপ দূরে ফণা তুলে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়ে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তা' হলে সাপুড়ে আর এক কৌশল অবলম্বন করে। সাধারণতঃ সে কোন সরা বা কুলো অথবা ঐ জাতীয় কোন জিনিস বাঁ হাতে ধ'রে সাপের সামনে ধ'রে নাড়তে থাকে। সামনে কোন জিনিস নড়তে দেখলে সাপের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়—এবং সাপ তাতে ছোবল মারতে উদ্যত হয়। সাপ ছোবল মারতে এলেই সাপুড়ে ঐ জিনিসটাকে তড়িৎ-গতিতে সরিয়ে নেয়। ফলে সাপ টাল সামলাতে না পেরে মাটির ওপরই ছোবল মেরে

বসে। এভাবে সাপ বারবার ব্যর্থ ছোবল মেরে অবসন্ন হয়ে পড়ে—তখন সাপুড়ে সুযোগ বুঝে ডান হাত দিয়ে সাপের ঘাড় চেপে ধরে। কোন সাপের ঘাড় যদি ঠিকমত ধরা যায়, সে সাপ আর মুখ ফেরাতে পারে না—দংশনও করতে পারে না। সরা-জাতীয় কোন জিনিস হাতে রাখার কারণ এই যে, অসাবধানতাবশতঃ সাপ ঠিক ছোবল দিলেও দংশনের সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য হাতের কাছে কোন জিনিস না পেয়ে নিজের হাঁটু বা বাঁ হাত নাড়িয়েও সাপুড়েকে সাপ কাবু করতে দেখা যায়। কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের সাপুড়েরা চক্রধর সাপ ধরে, তা' দেখলে বিস্মিত হতে হয়। কোন চক্রধর সাপ সুড়সুড় ক'রে যাচ্ছে—দূর থেকে তা' লক্ষ ক'রে সাপুড়ে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে তার লেজে মারে এক লাথি। বলা বাহুল্য, যমের দূত সাপটা তখনই ফোঁস ক'রে ফণা ধ'রে দাঁড়িয়ে ওঠে। কিন্তু এক নিমেষ মাত্র। চোখের পলকে সাপুড়ে তার ঘাড় চেপে ধরে। ঘাড় চেপে ধরার সময় সে মুখে চিৎকার ক'রে ওঠে—"খবরদার!" এই চিৎকার অবশ্য সাপুড়ে নিজেকে সতর্ক করার এবং সাহস দেওয়ার উদ্দেশেই ক'রে থাকে।

কোন কোন সাপুড়ে হাতে একটি লাঠি রাখে। কোন সাপকে মাটির ওপর দিয়ে সুড়সুড় ক'রে যেতে দেখলে ঐ লাঠি দিয়ে সাপুড়ে তার ঘাড় মাটির সঙ্গে চেপে ধরে। তারপর ধীরে ধীরে তার ঘাড় ধ'রে ওপরে তুলে ধরে। সাপের ঘাড় মাটির সঙ্গে যাতে ঠিকমত চেপে ধরা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশে অনেকের লাঠির আগার দিকে খাঁজ কাটা থাকে। কেউ কেউ এই উদ্দেশে তেকাঠা লাঠি—দুমুখওলা লাঠিও ব্যবহার করে। এক ধরনের সাঁড়াশিও তাদের কাছে দেখতে পাওয়া যায়। যে গর্তে সাপ থাকে, হাত ঢোকার পক্ষে সেই গর্তের মুখ ছোট হলে ঐ সাঁড়াশি দিয়ে গর্তের মুখ বড় ক'রে নেয়।

কোথায় সাপ থাকতে পারে, সাপুড়ে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করে। মাটি যদি নরম বা আলগা হয় এবং সেখান দিয়ে যদি কোন সাপ চ'লে যায়, তা' হলে সেখানে সাপের গায়ের একটা দাগ দেখা যেতে পারে। সাপ বেরিয়েছিল —কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আশপাশে কোন গর্ত আছে কিনা সাপুড়ে তার খোঁজ নেয়। সাপুড়ে তার ছোট লাঠি নিয়ে আশপাশের চৌকাঠ বা অনুরূপ সব স্থানে আঘাত করতে থাকে। ড্যাবড্যাবে শব্দ বেরলে সাপুড়ে বুঝতে পারে, মুখ দেখা না গেলেও মাটির তলায় কোথাও গর্ত আছে। তখন সে গর্তের মুখটা খুঁজে বের করে। লাঠির আঘাতে যে মৃদু ভূ-কম্পন হয়, গর্তের ভেতর থেকে অনেক সময় সাপ তা' পেট দিয়ে অনুভব করে—এবং ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশে ফোঁসফোঁস করতে থাকে। ফোঁসফোঁসানিতে সাপুড়ে বুঝতে পারে সাপ সেখানেই কোথাও আছে। রাত্রির অন্ধকারে সাপুড়ে সাধারণতঃ সাপ ধরে না। রাতে কোথাও সাপ বেরলে তারা বলে, কাল সকালে এসে ধরব। দিনের আলোতে সাপকে কাবু করা সহজ, এটা তারা ভাল ক'রেই জানে।

সবচেয়ে শক্ত শঙ্খচূড় সাপ ধরা। শঙ্খচূড় সাপ ধরতে একাধিক লোকের দরকার হয়। সাধারণতঃ শীতকালে শঙ্খচূড় সাপের খোঁজে সাপুড়েদের সুন্দরবন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। শীতকালে সাপ অনেকটা নির্জীব থাকে, ধরা সহজ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দূর থেকে দড়ির ফাঁস ছুড়ে দিয়ে শঙ্খচূড় সাপ ধরা হয়। এভাবে ধরায় সাপের ঘাড় অবশ্য কখনও কখনও ভেঙে যায়।

কোন বড় জানোয়ার গিলে পেট মোটা ক'রে ময়াল সাপ প'ড়ে থাকার সময় তাকে ধরা সহজ। সাধারণ অবস্থায় কোথাও ময়াল শুয়ে আছে। কম্বল বা ঐ ধরনের কোন মোটা কাপড় নিয়ে সাপুড়ে তার সামনে এগিয়ে যায়। কিছুদূর থেকে ঐ জিনিসটা

দোলাতে থাকে। দু-একবার এরকম করলেই ময়াল রেগে গিয়ে তাতে ছোবল দেয়। ফলে কম্বলে তার দাঁত যায় আটকে। সঙ্গে সঙ্গে সাপুড়ে কম্বল দিয়ে ময়ালের মুখ ঢাকা দিয়ে চেপে ধরে। তার একজন সঙ্গী থাকে। সে ছুটে গিয়ে ময়ালের লেজ চেপে ধরে। ময়াল তেমন-তেমন বড় হলে তিনজন লোকের দরকার হয়। একজন মুখ চেপে ধরে, একজন লেজ ধরে, অপরজন মাঝখানটা ধরে। ছোট ময়াল হলে একজন লোকই তাকে কাবু করতে পারে।

মারাত্মক বিষধর সাপ চেনার উপায়

বিষধর হলেই যে সে সাপের দংশনে মানুষ মারা যাবে, একথা বলা চলে না। ঐ সাপের যে পরিমাণ বিষে মানুষের মত বড় প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে—যাকে আমরা মৃত্যুকর মাত্রা বলি, এক ছোবলে ঐ সাপ সে পরিমাণ বিষ মানুষের দেহে ঢালতে সমর্থ না হতে পারে। এমনও হতে পারে, তার বিষের শক্তি এত মৃদু যে এক সময়ে তার বিষগ্রন্থিতে যে পরিমাণ বিষ সঞ্চিত থাকে, তার সমস্তটাও যদি সে কোন মানুষের দেহে ঢালতে পারে, তা' হলেও সে মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না। যেসব সাপের দংশনে মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে, তাদের আমরা বলি মারাত্মক বিষধর সাপ। আমাদের দেশে স্থলচর সম্মুখ-বিষদন্তী তথা মারাত্মক বিষধর সাপ চারটি দলে বিভক্ত: নাগ, করেত, বোড়া ও প্রবাল। এই থেকে প্রবাল-সাপ দলকে বাদ দিতে পারি। প্রবাল-সাপের দংশন কদাচিৎ ঘটে এবং তার দংশনে মানুষের মৃত্যুও কদাচিৎ হয়।

নাগ, করেত ও বোড়া—এই তিনটি দলের সচরাচর-দৃষ্ট সাপ হ'ল সাতটি: চক্রধর, শঙ্খচূড়, কালাচ, শাঁখামুটি, চন্দ্রবোড়া, ফুরসা ও গেছোবোড়া। সুতরাং মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করেছে কিনা জানতে হলে এই সাতটি সাপের কোন সাপ দংশন

করেছে কিনা কার্যতঃ জানলেই হ'ল। এই সাতটি সাপের বিবরণ যথাস্থানে দিয়েছি।

এখানে সাধারণভাবে মারাত্মক বিষধর সাপ চেনা কিভাবে যায়, তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল :

ভারতীয় সাপ

- লেজ দু' পাশে অনেকটা চেপটা
  - সামুদ্র-সাপ (মারাত্মক বিষধর)
- লেজ বেলনাকার, চেপটা নয়
  - স্থলচর সাপ
    - অঙ্কতল-আঁশ ছোট (বিষহীন ; যথা : পুঁয়ে)
    - অঙ্কতল-আঁশ সংকীর্ণ (বিষহীন ; যথা : ময়াল, বেলেসাপ)
    - অঙ্কতল-আঁশ চওড়া (বিষহীন ও বিষধর ; যথা : ঢেমনা, লাউডগা, চক্রধর)
      - মাথায় ছোট আঁশ
        - বিবরহীন বোড়া (মারাত্মক বিষধর ; যথা : চন্দ্রবোড়া, ফুরসা)
      - মাথায় ছোট বা বড় আঁশ ও মুখাবয়ব বিবর
        - সবিবর বোড়া (মারাত্মক বিষধর ; যথা : গেছোবোড়া)
      - মাথায় বড় আঁশ
        - (ক) ওপর ঠোঁটের তৃতীয় আঁশটি চোখ থেকে নাসা-পাত পর্যন্ত বিস্তৃত
          - নাগ ও প্রবাল (মারাত্মক বিষধর)
            - নাগ: ফণার চিহ্ন (চক্রধর ও শঙ্খচূড়)
            - প্রবাল: পেটের রং ম্লান লাল
        - (খ) পৃষ্ঠ্য-আঁশ বড় ও অবপুচ্ছ-আঁশ অখণ্ড
          - করেত (মারাত্মক বিষধর ; যথা : কালাচ, শাঁখামুটি)
        - (গ) পূর্বোক্ত (ক) বা (খ)-এ বর্ণিত কোন বৈশিষ্ট্য নেই (মারাত্মক বিষধর নয়)

সর্প-দংশনের প্রতিবিষ ওষুধ

১৯৫৪ সালে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার উদ্যোগে প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে বছরে সাপের দংশনে কত লোক মারা যায়, তার একটা হিসাব লওয়া হয়। সেই হিসাবে দেখা যায়, সারা পৃথিবীতে এক বছরে অন্ততঃ ৪০ হাজার লোক সাপের কামড়ে মারা যায়। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক লোকই সাপের দংশনে মারা যায়। কারণ বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার উদ্যোগে যে হিসাব নেওয়া হয়েছে, তা' সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বহু দেশেই সাপের দংশনের সব সংবাদ সরকারের গোচরীভূত হয় না। উপরন্তু ৪০ হাজারের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, চীনা ভূখণ্ড ও পূর্ব ইওরোপের কয়েকটি দেশে সাপের দংশনে মৃত্যুর সংখ্যা ধরা হয় নি।

যা' হ'ক, উপরি-উক্ত হিসাব অনুযায়ী বছরে বিভিন্ন মহাদেশে সাপের দংশনের মৃত্যুসংখ্যা নিম্নরূপ :

এশিয়া—৩৫ হাজার, দক্ষিণ আমেরিকা—৩-৪ হাজার, অ্যাফ্রিকা—আনুমানিক ১ হাজার; উত্তর আমেরিকা—৩-৫ শত, ইওরোপ—৫০ এবং ওসিনিয়া—১০।

দেশ হিসাবে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক লোক সাপের দংশনে মারা যায়। ভারতে বছরে ১৫ হাজার লোক সাপের দংশনে মারা যায়। ভারতের আশপাশের দেশগুলিতে সাপের দংশনে মৃত্যু-সংখ্যা এ সঙ্গে লক্ষণীয়। পাকিস্তানে বছরে প্রায় ১১ হাজার লোক সাপের দংশনে মারা যায়। ব্রহ্মদেশে প্রতি বছর সাপের দংশনে মৃত্যু-সংখ্যা প্রায় ২ হাজার এবং সিংহলে প্রায় ৩ শত।

ভারত গ্রামকেন্দ্রিক দেশ এবং অধিকাংশ সাপের দংশনে মৃত্যুর

ঘটনা ঘটে সুদূর পল্লীতে। সেজন্যে সাপের দংশনে মৃত্যুর বহু সংবাদ আমাদের অজানা রয়ে যায়। যা' হ'ক, হিসাব করলে দেখা যায়, ভারতে প্রতিদিন গড়পড়তা ৫০ জন সর্প-দংশনে মারা যায়। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, বছরের শীতঋতুর কয়েক মাস সর্প-দংশন কদাচিৎ ঘটে। সুতরাং কার্যতঃ সর্প-দংশনের দৈনন্দিন মৃত্যু-সংখ্যা ৫০ এর অনেক বেশী।

ভারতের তথা পৃথিবীর মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গ অঞ্চলেই সর্প-দংশনের মৃত্যু-সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বছরে দেড় হাজারেরও বেশী লোক সর্প-দংশনে মারা যায়। পশ্চিম-দিনাজপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমান—এই জেলাগুলিতে সর্প-দংশনে মৃত্যু-সংখ্যা খুব বেশী।

বর্তমানে সর্প-দংশনের প্রধান কার্যকর ওষুধ হ'ল—প্রতিবিষ মস্তু। এই প্রতিবিষ ওষুধ সর্বপ্রথম ফরাসী চিকিৎসক কালমেত (১৮৬৩—১৯৩৩) তৈরি করেন। সাপের বিষ থেকেই সর্প-দংশনের প্রতিবিষ মস্তু তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে বোম্বাইয়ের হপকিন ইনস্টিটিউটে এই প্রতিবিষ ওষুধ তৈরির ব্যবস্থা আছে। কাঁচড়াপাড়াতে প্রতিবিষ ওষুধ তৈরির একটি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একটি সুস্থ সবল ঘোড়া নেওয়া হয়। তার দেহে দিনের পর দিন সইয়ে সইয়ে অল্প পরিমাণ সাপের বিষ ইনজেকশন দেওয়া হতে থাকে। মৃত্যুকর মাত্রার চেয়ে অনেক কম হওয়ায় ঘোড়াটি মারা যায় না—তার কোন ক্ষতিও হয় না। বিষক্রিয়ার মাত্র কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। বিষের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়ান হতে থাকে। এরকম প্রায় ছ' মাস কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ঘোড়াটির পক্ষে মৃত্যুকর মাত্রার বিষও তার দেহে ইনজেকশন করলে ঘোড়াটির মৃত্যু হচ্ছে না। এর কারণ অবশ্য বোঝা সহজ। পুনঃপুনঃ পরিমিতভাবে সাপের বিষ ইনজেকশন

করার ফলে ঘোড়াটির রক্তে এমন পদার্থ জন্মেছে যা' সর্পবিষকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। তার রক্তে সর্পবিষ প্রতিরোধক ক্ষমতা জন্মেছে। তাতেই মৃত্যুকর মাত্রায় বিষ ইনজেকশন করলেও ঘোড়াটি মরে না। এরূপ অনাক্রম্য ঘোড়ার দেহের শিরা ছেদন ক'রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রক্ত বের ক'রে নেওয়া হয়। রক্তের যে অংশ জমাট বাঁধে, ঐ রক্ত থেকে তা' বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট অংশ—রক্তমস্তু যা' প'ড়ে থাকে তাই প্রতিবিষ ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। সর্প-বিষের পক্ষে অনাক্রম্য রক্তমস্তুই সর্প-দংশনের প্রতিবিষ ওষুধ।

সাপের বিষের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছি, মোটামুটিভাবে প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন সাপের বিষ দুই ধরনের (ক) যার ক্রিয়া প্রধানতঃ নার্ভের ওপর এবং (খ) যার ক্রিয়া প্রধানতঃ রক্তের ওপর। চক্রধর, শঙ্খচূড়, কালাচ ও শাঁখামুটি সাপের বিষ প্রধানতঃ নার্ভের ওপর ক্রিয়া করে এবং চন্দ্রবোড়া, ফুরসা ও গেছোবোড়ার বিষ প্রধানতঃ রক্তের ওপর ক্রিয়া করে। দুটি পৃথক্ ঘোড়ায় দু' ধরনের বিষ ইনজেকশন ক'রে দু' ধরনের প্রতিবিষ ওষুধ তৈরি করা হয়। যে ধরনের সাপ কামড়ায়, সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে সেই ধরনের প্রতিবিষ ওষুধ ইনজেকশন দেওয়া হয়। তাতেই ঠিকমত ফল হয়; সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে। কি ধরনের সাপ দংশন করেছে জানতে পারলে তবেই সেই ধরনের প্রতিবিষ ওষুধ ইনজেকশন করা সম্ভব। কিন্তু এমন তো হতে পারে, ঠিক কি ধরনের সাপ দংশন করেছে, আদৌ জানা সম্ভব হয় নি। তখন কি করা যাবে? এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশে একই ঘোড়ায় দু' ধরনের সাপের বিষ ইনজেকশন দিয়ে তাকে দু' ধরনের বিষের পক্ষেই অনাক্রম্য ক'রে তোলা হয়। এই ঘোড়ার রক্ত থেকে যে প্রতিবিষ ওষুধ তৈরি করা হয়, তা' দু' ধরনের সাপের দংশনে কার্যকর। একই ধরনের সাপের বিষ

ইনজেকশন ক'রে যে প্রতিবিষ ওষুধ তৈরি করা হয়, সেই ওষুধ সেই ধরনের সাপের দংশনে স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত বেশী কার্যকর, তা' বলাই বাহুল্য। কোন্ ধরনের সাপ দংশন করেছে জানতে পারলে সেই ধরনের সাপের বিষ থেকে তৈরী ওষুধ সেজন্যে ব্যবহার করা হয়। সেই প্রতিবিষ ওষুধ হাতের কাছে না থাকলে অথবা ঠিক কোন্ ধরনের সাপ দংশন করেছে জানতে না পারলে একত্রে দু' ধরনের বিষ থেকে তৈরী প্রতিবিষ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

তরল প্রতিবিষ মস্তুর কার্যকারিতা বেশী দিন থাকে না। সেজন্যে পল্লী-অঞ্চলে প্রতিবিষ ওষুধ সংগ্রহ করা বিশেষ অসুবিধা-জনক ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রতিবিষ মস্তু শুষ্ক ও চূর্ণ অবস্থায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে এর কার্যকারিতাও বহুদিন অটুট রাখা যায়। ইনজেকশন দেওয়ার সময় শুষ্কীকৃত মস্তু পরিস্রুত জলে মিশিয়ে নিতে হয়।

সর্বতোভাবে ভাল ফল পেতে হলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির শিরার মধ্যে প্রতিবিষ ওষুধ ইনজেকশন দেওয়া দরকার। শিরার মধ্যে ইনজেকশন দেওয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া নিরাপদ নয়। প্রতিবিষ ওষুধ আছে, আশপাশে কোন চিকিৎসক নেই; এক্ষেত্রে কি করা যাবে? ত্বকের নীচেই প্রতিবিষ ওষুধ ইনজেকশন করা যেতে পারে। প্রয়োজন ঘটলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের দেহে ত্বকের নীচে প্রতিবিষ ওষুধ যাতে সহজে ইনজেকশন ক'রে দিতে পারে, এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনজেকশন আজকাল তৈরি করা হয়। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনজেকশন কাছে থাকলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি অনায়াসে তা' নিজের দেহে ফুটিয়ে দিতে পারে। সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়লে অবশ্য আলাদা কথা।

শিরার মধ্যে প্রতিবিষ ওষুধ ইনজেকশনের ফলে কখনও কখনও জোরাল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সর্প-দংশনের ফলে নয়—শিরার মধ্যে প্রতিবিষ ওষুধ ইনজেকশন দেওয়া জনিত প্রতিক্রিয়ার ফলে

কখনও কখনও সর্পদষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। সুতরাং প্রতিবিষ ওষুধ ইনজেকশন দেওয়ার সময় চিকিৎসকেরও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে ইনজেকশন দেওয়ার আগে তাঁকে ভাল ক'রে জেনে নিতে হবে, রোগীর দেহে আদৌ বিষ প্রবেশ করেছে কিনা। বিষ নিশ্চিত ভাবে ঢুকে থাকলে তবেই ইনজেকশন দেওয়ার ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে।

প্রতিবিষ ওষুধ খুবই কার্যকর হওয়া সত্বেও আমাদের দেশে এ ওষুধের সাহায্য তেমন নেওয়া সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ জনমত। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর অজ্ঞ। তারা চিরাচরিত পথ ধ'রেই চলে—ওঝার সাহায্য নেয়। সর্প-দংশনের চিকিৎসার বিজ্ঞান-সম্মত উপায় গ্রহণে তারা নারাজ। দ্বিতীয়তঃ পল্লী-অঞ্চলে প্রতিবিষ ওষুধের এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব। বর্তমানে অবশ্য একদিকে যেমন সর্প-দংশনের বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা গ্রহণে জনমত গ'ড়ে উঠছে, তেমনি পল্লী-অঞ্চলের হাসপাতালে প্রতিবিষ ওষুধ পাওয়ার ব্যাপারে সরকারী তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোক সর্প-দংশনের বিজ্ঞান-সম্মত উপায় গ্রহণ করতে কিরূপ অসম্মত হয়, ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে জড়িত ছোট একটি ঘটনার কথা বলি। কোন ছাত্রের কথা; শহরতলীতে বাস করত, আর কলকাতার কোন কলেজে এসে পড়ত। ছেলেটিকে আমি কোনদিন দেখি নি; তবে সাপ সম্পর্কীয় আমার লেখার সে বড় অনুরাগী ছিল, তা'আমি জানতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন তাকেই সাপে দংশন করল। সর্পদষ্ট হয়ে ছেলেটি বারবার বলতে থাকে, তাকে যেন তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেটি জাতে ছিল তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর। ছেলেটি শিক্ষিত হলেও তার বাবা ছিলেন নিরক্ষর। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বারবার বলা সত্বেও ছেলেটির বাবা আর তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে ওঝা

ডাকলেন এবং ঝাড়ফুঁক করাতে লাগলেন। ছেলেটি কিন্তু মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়তে পড়তে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে পুনঃপুনঃ বলেছিল। ঝাড়ফুঁকে কিছু হয় না। ছেলেটির যখন শেষ অবস্থা তখন তার বাবা তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। ছেলেটি মারা যায়।

সর্প-দংশনের অল্পক্ষণের মধ্যে কেউ মারা গেলে বুঝতে হবে, সে ভয়ে মারা গেছে অথবা বিষধর সাপ ঠিক তার কোন শিরার ওপর দংশন করেছে। সেক্ষেত্রে বিষ-লক্ষণ প্রকট নাও হতে পারে।

আধ ঘণ্টা—এমন কি এক ঘণ্টার মধ্যে সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে প্রতিবিষ ওষুধ যদি ঠিকমত ইনজেকশন দেওয়া যায়, তা' হলে সে ব্যক্তির বেঁচে ওঠা খুবই সম্ভাবনা। এক ঘণ্টার পরেও ইনজেকশন দেওয়ায় সর্পদষ্ট ব্যক্তি বেঁচে উঠেছে, তার বহু নজির আছে। সুতরাং যেমন অযথা দেরি করা উচিত নয়, তেমনি অনেক দেরি হয়ে গেছে এই ধারণায় রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়া অযৌক্তিক।

বিষ দোহন: সাপের বিষ থেকে সর্প-দংশনের প্রতিবিষ ওষুধ তৈরি করা হয়। সুতরাং সাপের বিষ সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাধারণ সাপুড়েরা অনেক সময় বিষধর সাপের বিষদাঁত ভেঙে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ সংগ্রহ করে। কিন্তু এতে সাপটা যেমন আহত হয়, তেমনি একটি সাপ থেকে মাত্র একবারই সাপের বিষ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সেজন্যে বীক্ষনাগারে অন্যভাবে সাপের বিষ সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতি বিষ দোহন নামে পরিচিত।

তেকাঠা লাঠি দিয়ে প্রথমে বিষধর সাপের মাথাটা মাটিতে চেপে ধরা হয়। তারপর ধীরে ধীরে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সাপের ঘাড়টা ধ'রে তাকে তুলে ধরেন। কোন কাচপাত্রের মুখে আটকানো পার্চমেন্ট কাগজে সাপটার মুখ লাগিয়ে তিনি তাকে তাতে দংশন

করান। ক্রুদ্ধ সাপটা খুব জোরে দংশন করে। পার্চমেন্ট কাগজ বিষদাঁতের আঘাতে ফুটো হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিষগ্রন্থিতে চাপ পড়ায় বিষদাঁত বেয়ে পার্চমেন্ট কাগজের ফুটো দিয়ে বিষ গড়িয়ে কাচপাত্রের মধ্যে পড়ে। এভাবে বিষ সংগ্রহ করলে একই সাপ থেকে পুনঃপুনঃ বিষ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কোন কোন বীক্ষণাগারে কাচপাত্র ও পার্চমেন্ট কাগজের পরিবর্তে একটি কাচনল ও তার মুখে আটকানো রবার-গোলক ব্যবহার করা হয়। রবার-গোলকটির ওপর সাপটিকে দংশন করান হয়।

কোন কোন অভিজ্ঞ সাপুড়ে বীক্ষণাগারের সাজ-সরঞ্জামের সাহায্য না নিয়েই অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সাপের বিষ দোহন করে। সাপের ঘাড় হাতে ধ'রে একটা বড় ঝিনুক বা অনুরূপ কোন পাত্র সাপের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ে তারা আঙুলের চাপ দিতে থাকে, তাতে বিষদাঁত বেয়ে বিষ ঝিনুকে জমা হয় (২৪৪ পৃষ্ঠায় চিত্র)।

সর্প-দংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা

আমাদের দেশে প্রতিদিন গড়পড়তা ৫০ জনের অধিক লোক সর্প-দংশনে মারা যায়, এ কথা বলেছি। মাত্র জনসাধারণ একটু আত্মসচেতন হলে এ সংখ্যা অন্ততঃ অর্ধেকে পরিণত হয়।

সাপের যথার্থ জ্ঞানের অভাবে সর্পদষ্ট ব্যক্তি এবং তার আশ-পাশের লোকে অত্যধিক ভীত হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে প্রতি এক শ' সর্প-দংশনের মাত্র কুড়িটি মারাত্মক বিষধর সাপের দংশন। আবার মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করলেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি মারা যাবেই বলা যায় না। মারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করেছে, কিন্তু ঠিকমত দংশন করতে পারে নি। ঠিকমত দংশন করতে না পারায় সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে মৃত্যুকর মাত্রায় বিষ প্রবেশ করে নি। এমন

হতে পারে, দংশনের কিছু পূর্বে ঐ সাপটি কয়েকটি শিকারকে দংশন করেছে। তার বিষগ্রন্থিতে মৃত্যুকর মাত্রায় বিষ ছিলই না। সুতরাং সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে মৃত্যুকর মাত্রায় বিষ প্রবেশ করার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। এসব ক্ষেত্রে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পেলেও মানুষটি শেষ পর্যন্ত বেঁচে ওঠে। কখনও কখনও বিষধর সাপ মিথ্যা ছোবল দেয়—মুখ বুজে ছোবল দেয়, দংশনের ভান করে। অমারাত্মক বিষধর সাপে অথবা বিষহীন সাপে দংশন করেছে—হয়তো সাপেই দংশন করে নি, মনে করা হয়েছে সাপে দংশন করেছে, শুধু এই ভয়ে ঐ ব্যক্তির দেহে বিষ-লক্ষণের মত নানা আপাত লক্ষন প্রকাশ পেতে থাকে। ভয় এমনই অঘটন ঘটায়; ভয়ে দেহের উর্ধ্বতন নার্ভ-কেন্দ্রগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শুধু ভয়ে মানুষের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত্যুও হয়। সুতরাং কোন কারণেই অত্যধিক ভীত হওয়া উচিত নয়। সংবাদপত্রে অনেক সময় বিবরণ বেরয়, অমুক স্থানে অতি বিষধর সাপের দংশনে অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। এ ধরনের বিবরণ বিভ্রান্তিকর। লোকটি মারা গেছে, এটুকুই সত্য। কিন্তু সে যে সাপের দংশনেই মারা গেছে, একথা জোর ক'রে বলা চলে না। লোকটিকে হয়তো বিষহীন সাপে কামড়েছিল। কিন্তু সাপে কামড়েছে, এই ভয়েই হয়তো সে মারা গেছে। সাপটাকে তো আর চেনা যায় নি। লোকটি মারা গেছে, সুতরাং ধ'রে নেওয়া হয়েছে সাপটি নিশ্চয়ই "অতি বিষধর" সাপ। কিন্তু এর মধ্যে যে ফাঁক রয়ে যায়, বিবরণদাতার কাছে তা' ধরা পড়ে না।

সাঁওতাল পরগনায় সন্ধ্যার দিকে এক ভদ্রলোক ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি সাপের ওপর পা দিয়ে দেন, লেজের দিকেই পা পড়ে। সাপটা ছিল কেউটে। মুখ ঘুরিয়ে সাপটা তাঁর পায়ের পাতার ওপর ছোবল দেয়। ভদ্রলোক অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পা ঝেড়ে সাপটাকে দূরে ফেলে দেন। ক্ষতস্থান

থেকে বিন্দুবিন্দু রক্ত বেরিয়েছিল। ভদ্রলোকের বিশেষ কিছু হয় নি। সর্পদষ্ট হয়েও ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক সাঁওতাল আদিবাসী তাঁকে বলেছিল—এমন কালে তোকে দংশন করল, আর তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেমন ক'রে! সর্প-দংশন নির্বিশেষে সাধারণ লোক কিরূপ আতঙ্কিত হয়, সাঁওতাল আদিবাসীর এই মন্তব্যে তা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ওঝার বেয়াদবিতে অত্যাচারে সর্পদষ্ট ব'লে গণ্য অথবা সর্পদষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। আদৌ সাপে কামড়ায় নি—সাপে কামড়েছে ব'লে মাত্র সন্দেহ করা হয়েছে, এরূপ বহু ব্যক্তি ওঝার ঝাড়ফুঁকের অত্যাচারে মারা গেছে, তার নজির আছে। যেসব সর্প-দংশনে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করায় অথবা রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ করায় সর্পদষ্ট ব্যক্তি বেঁচে উঠত, সেসব রোগীও ওঝার ঝাড়ফুঁকের অত্যাচারে কখনও কখনও মারা যায়। সর্প-দংশনের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রথম কথা বাঁধন দেওয়া। বাঁধন ঠিকমত দেওয়া হলেও ওঝা এসে অনেক সময় সদম্ভে বলে—আমি মন্ত্রের বাঁধন দিয়েছি, ও বাঁধন খুলে ফেলুন। তার কথামত বাঁধন খুলে ফেলায় সঙ্গে সঙ্গে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে, তারও দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কারান্ধ রোগীর মনে ওঝা সাহস দেয়। এ যুক্তি অনেকের মনে ওঠে। সেক্ষেত্রে ওঝা অথবা ওঝার ছদ্মবেশে কোন ব্যক্তি মন্ত্র আউড়াতে পারে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা কিন্তু ঠিকমত চলা দরকার।

সর্প-দংশনের প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান জনসাধারণের থাকা উচিত। সাপ দংশন করে আকস্মিকভাবে, সর্প-দংশনের চিকিৎসাও খুব দ্রুত হওয়া দরকার। হাসপাতাল বেশ দূরে—রোগীকে নিয়ে যেতে অনেক সময় লাগবে, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে মাত্র প্রাথমিক চিকিৎসাতেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি ভাল হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলি একে একে বলি।

কাউকে সাপে দংশন করেছে অথবা দংশন করেছে ব'লে সন্দেহ হয়েছে। কি করতে হবে? প্রথমে বাঁধন দিতে হবে—যাকে আমরা বলি তাগা বাঁধা। বাঁধন দেওয়ার উদ্দেশ্য, রক্তের সঙ্গে বিষ যাতে হৃৎপিণ্ডের দিকে যেতে না পারে—দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ে। সাধারণতঃ পায়ে বা হাতে সাপে দংশন করে।

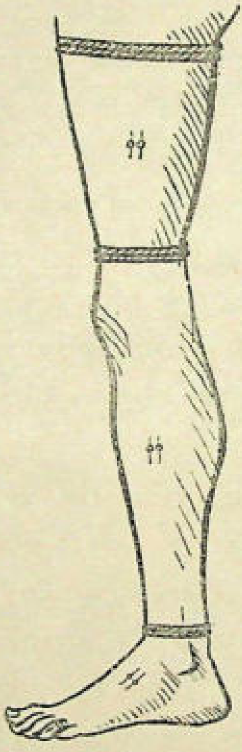

পায়ে বাঁধন

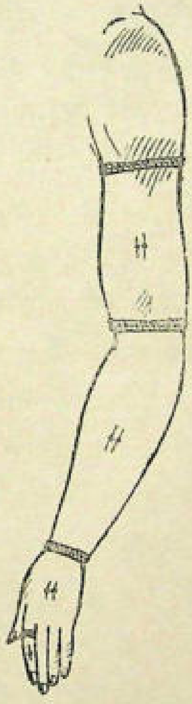

হাতে বাঁধন

সুতরাং বাঁধন দেওয়ার অসুবিধা হয় না। ক্ষতস্থানের ওপর বাঁধন দিতে হয়। কিন্তু এই 'ওপর' কথাটির অর্থ বুঝতে হবে। ক্ষতস্থানের ঠিক ওপরে ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত একটি বাঁধন দেওয়া যেতে পারে—নাও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পায়ের কোন

অংশে দংশন করলে একটি বাঁধন নিশ্চিত ক'রে দিতে হবে উরুতে—হাঁটুর ওপরে। হাঁটুর নীচে দুটি অস্থি আছে। মাত্র হাঁটুর নীচে যদি বাঁধন দেওয়া হয়, তা' হলে রক্তের সঙ্গে বিষের হৃৎপিণ্ডের দিকে যাওয়ার কোন বাধাই থাকবে না। তেমনি কনুইয়ের নীচে আছে দুটি অস্থি। সুতরাং হাতের কোন অংশে সাপ দংশন করলে একটি বাঁধন নিশ্চিত ক'রে দিতে হবে বাহুতে—কনুইয়ের ওপর। মাত্র কনুইয়ের নীচে বাঁধন দিলে রক্তের সঙ্গে বিষের হৃৎপিণ্ডের দিকে যাওয়ার কোন অসুবিধা থাকে না। বাঁধন দেওয়ার এ কথাটি না জানায় অনেক সময় বাঁধন কার্যকর হয় না। পা বা হাতের কোন স্থানে সাপে দংশন করলে একটি বাঁধন হাঁটু বা কনুয়ের ওপর দিতে হবে। হাঁটু বা কনুয়ের ওপর দংশন করলে বাঁধনটি কুঁচকি বা বগলের নীচে দিতে হবে। অতিরিক্ত বাঁধনটি এভাবে দিতে হবে ঃ পা বা হাতের আঙুলে দংশন করলে দষ্ট আঙুলের ঠিক গোড়ায় অতিরিক্ত বাঁধন দিতে হবে ; পা বা হাতের পাতায় দংশন করলে পায়ের গাঁইটের বা হাতের কবজির ঠিক ওপরে অতিরিক্ত বাঁধনটি দিতে হবে ; পায়ের গাঁইট ও হাঁটুর মধ্যবর্তী কোন অংশে অথবা হাতের কবজি ও কনুইয়ের মধ্যবর্তী কোন অংশে দংশন করলে ক্ষতস্থানের ঠিক ওপরে অতিরিক্ত বাঁধনটি দিতে হবে। বাঁধন শক্ত ক'রে বেঁধে দিতে হবে। তা' ব'লে বাঁধন এমন প্রাণপণ শক্ত ক'রে বেঁধে দিতে হবে না যাতে রোগী ঐ বাঁধনের যন্ত্রণাতেই ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার আরম্ভ করে। ধমনীর ভেতর দিয়ে নয়—শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং ধমনীর রক্ত চলাচল নয়—মাত্র শিরার রক্ত চলাচল বন্ধ করা বাঁধন দেওয়ার উদ্দেশ্য। বাঁধনের ব্যাপারে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। বাঁধন দেহে আধ ঘণ্টার ওপর রাখতে হচ্ছে। আধ ঘণ্টার পর এক একটি বাঁধনের ২ সেণ্টিমীটর আন্দাজ ওপর নতুন বাঁধন দিয়ে আগের বাঁধন খুলে ফেলতে হবে।

এরূপ প্রতি আধ ঘণ্টার পর প্রতি বাঁধনের ২ সেন্টিমীটর আন্দাজ ওপর নতুন বাঁধন দিয়ে আগের বাঁধন খুলে ফেলতে হবে। যেখানে আগের বাঁধনের ওপর আর বাঁধন দেওয়ার স্থান না থাকে, সেখানে পনর মিনিট অন্তর অন্তর বাঁধনটি খুলে সামান্য কিছুক্ষণ আলগা ক'রে রেখে আবার শক্ত ক'রে বেঁধে দিতে হবে। নতুবা বাঁধনের নীচে পচ ধরতে পারে। দড়ি, ফিতা, রুমাল, কাপড়, গামছা, নরম গাছের ছাল—হাতের কাছে যা' থাকবে, তা' দিয়েই বাঁধন দিতে হবে। নরম রবারের নলের বাঁধনই সবচেয়ে ভাল।

বাঁধন দেওয়ার পর টিংক্চার আয়োডিন-মেশানো জল অথবা শুধু পরিষ্কার জলে ক্ষতস্থান দু' তিনবার ধুয়ে ফেলতে হবে। বিষধর সাপের দংশনে কখনও কখনও ক্ষতস্থানের আশপাশে বিষ জ'মে থাকে। ক্ষতস্থানে পরিকার জল দিলে ঐ বিষ ধুয়ে যায়।

সর্পদষ্ট লোকটি যেন ভয় না পায়। সে যেন ছুটোছুটি না করে। ছুটোছুটিতে রক্ত চলাচলের গতি যাবে বেড়ে, আর বিষও রক্তের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। সে সম্পূর্ণ স্থিরভাবে বসে থাকবে অথবা শুয়ে থাকবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে হলে তাকে কোলকুঁজো অথবা অন্যভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া উচিত। হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হলে খুব আস্তে আস্তে নিয়ে যেতে হবে।

কাছে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসক আছে কিনা খোঁজ নিতে হবে। যে সাপটা দংশন করেছে, তাকে যদি মারা সম্ভব হয়, তা' হলে তাকে মেরে চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এতে সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার পক্ষে সুবিধা হবে। একটা ধারণা আছে—এবং এই ধারণা ওঝারা পুষ্ট ক'রে থাকে, যে সাপটা দংশন করেছে, তাকে মারা উচিত নয়। তাকে মারলে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আর কোনক্রমেই বাঁচান যায় না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কাছে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসক নেই। দেখতে হবে, সত্যি মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করেছে কিনা। সচরাচর-দৃষ্ট মারাত্মক বিষধর সাপ সাতটি : চক্রধর, শঙ্খচূড়, কালাচ, শাঁখামুটি, চন্দ্রবোড়া, ফুরসা ও গেছোবোড়া। এই সাতটি সাপের মধ্যে শঙ্খচূড় ও ফুরসা বাংলাদেশে কদাচিৎ দেখা যায়। সুতরাং মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করেছে কিনা জানতে হলে বাংলার গণ্ডির মধ্যে বাকী পাঁচটি সাপের কোনটি দংশন করেছে কিনা জানলেই কার্যতঃ হ'ল। এই পাঁচটি সাপের কোনটি দংশন করেছে, বুঝতে হবে মারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করেছে। সাপটিকে দেখতে পাওয়া যায় নি। সেক্ষেত্রে কি করা যাবে? ক্ষতস্থান ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে হবে। বিষধর সাপ দংশন করলে ক্ষতস্থানে থাকে সাধারণতঃ দুটি দাঁতের দাগ। এ দাগ দুটি হ'ল

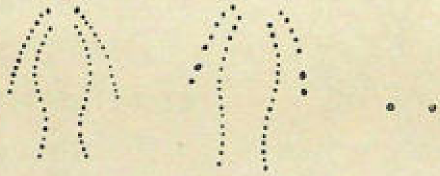

সাপের দাঁতের দাগ

বিষহীন সাপ — পশ্চাৎ বিষদন্তী — সম্মুখ বিষদন্তী

সক্রিয় বিষদাঁতের। দাগ দুটির তফাত থাকে প্রায় ২ সেন্টিমীটর। ঠিকমত কামড়াতে না পারায় বিষধর সাপের দংশনে অবশ্য বিষ-দাঁতের একটি মাত্র দাগ থাকতে পারে। বিষহীন সাপের দংশনে কিন্তু দাঁতের দাগ এরকম হয় না। সাধারণতঃ পরপর কয়েকটি দাঁতের দাগ থাকে। বিষধর সাপের দংশনে কখনও কখনও অন্যান্য দাঁতেরও দাগ দেখা যায়। তবে বিষদাঁতের দাগ অন্যান্য দাঁতের দাগের চেয়ে একটু বেশী গভীর হয়। বিষধর সাপে দংশন করলে কখনও কখনও ক্ষতস্থানের আশপাশে চামড়ার ওপর বিষ

প'ড়ে থাকতে দেখা যায়। শুধু চোখে এসব পার্থক্য ঠিক বোঝা যায় না। বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলে সুবিধা হয়। ক্ষতস্থান ভয়ানক জ্বালা করছে; ক্রমাগত পাতলা রক্ত গড়াচ্ছে, ক্ষতস্থানের মুখে রক্ত জমাট বাঁধছে না। ক্ষতস্থানের আশপাশ কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলে উঠেছে। বুঝতে হবে বিষধর সাপে দংশন করেছে। বিষধর সাপে দংশন করলে কিছুক্ষণ পরে ক্ষতস্থানের চারপাশ কখনও কখনও নীলাভও হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে একটি কথা মনে রাখা যেতে পারে—যে কোন সাপের দংশনের পর দশ মিনিট কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে বিষ-লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। বুঝে নিতে হবে, সে দংশনে ভয়ের কারণ নেই। অপরপক্ষে সর্প-দংশনের পর মুহূর্তেই যদি কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তা' হলে বুঝতে হবে ভয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—তার দেহে বিষ ঢুকতেও পারে, নাও পারে।

বিষহীন সাপে বা অমারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করলে বিশেষ কোন চিকিৎসার দরকার নেই। পরিষ্কার জল অথবা আয়োডিন-মেশানো জলে ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার নেকড়া দিয়ে বেঁধে রাখলেই চলবে। কিন্তু মারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করেছে অথবা দংশন করেছে ব'লে সন্দেহ হয়েছে, কি করতে হবে? ক্ষতস্থান ঢেরা চিহ্নের (×) আকারে প্রায় এক সেন্টিমীটর লম্বা ও এক সেন্টিমীটর গভীরভাবে কেটে রক্ত বের ক'রে দিতে হবে। সাধারণতঃ বিষদাঁতের ছুটি দাগ দষ্টস্থানে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক দাঁতের স্থান অনুরূপভাবে কেটে রক্ত বের ক'রে দিতে হবে। ২০ সেন্টিলীটর—এমন কি অবস্থাবিশেষে তার চেয়ে বেশী রক্ত বের ক'রে দেওয়া যেতে পারে। ক্ষতস্থানে যে বিষ ঢুকেছে, রক্তের সঙ্গে সেই বিষ বের ক'রে দেওয়াই হ'ল রক্ত বের ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্য। খুব ধারাল ছুরি, ক্ষুর, সেফটি-রেজারের ফলা ইত্যাদি দিয়ে ক্ষতস্থান কাটা যেতে পারে। যে অস্ত্রই ব্যবহার করা হ'ক,

ক্ষতস্থান চেরার আগে সে অস্ত্র আগুনে ধ'রে অথবা গরম জলে শোধিত ক'রে নিতে হয়—তাতে যেন কোন অপকারী জীবাণু বা ময়লা না লেগে থাকে। রক্ত-শোষণ যন্ত্র আছে। কাঁচের বা ধাতুর তৈরী একটি ছোট পাত্রের সঙ্গে রবারের পাম্প যুক্ত থাকে। পাত্রটি ক্ষতস্থানের ওপর উপুড় ক'রে রেখে পাম্প টিপলেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে ঐ পাত্রের ভেতর জমতে থাকে।

সর্প-দংশন চিকিৎসার প্রয়োজনে তৈরী রক্তশোষণ যন্ত্রে দু' রকমের পাত্র থাকে: (ক) দেহের কোন সমতল অংশে সাপে দংশন করলে তার জন্যে প্রায় দু' সেন্টিমীটর ব্যাসের গোল মুখ-বিশিষ্ট পাত্র এবং (খ) আঙুল-আদি দেহের কোন গোলাকার অংশে সাপে দংশন করলে তার জন্যে সরু ডিম্বাকার মুখবিশিষ্ট পাত্র। হাতের কাছে রক্ত-শোষণ যন্ত্র আছে। এর সাহায্যে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের করা যেতে পারে। এ যন্ত্র থাকলে ক্ষতস্থান বেশী চেরার দরকার হয় না। আমাদের দেশে বেদেরা শিঙাতে মুখ লাগিয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের করে। রক্ত-শোষণ যন্ত্রের অভাবে শিঙার সাহায্যে রক্ত বের করা যেতে পারে। ক্ষতস্থানে চোঙা বসিয়েও রক্ত বের করা যেতে পারে। কিছুটা রক্ত বের হয়ে যাওয়ার পর বাঁধন খুলে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু তারপরেও রক্ত বের ক'রে দিতে হবে। তবে একটানা রক্ত শোষণ না ক'রে মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া উচিত। বিরতির সময় ক্ষতস্থানের ওপর গাঢ় লবণ-দ্রবণ ভেজানো তুলো বা পরিষ্কার নেকড়া চাপা দিয়ে রাখলে ভাল হয়। তাতে অভিস্রবণে ক্ষতস্থানের ক্ষরণ অক্ষুণ্ণ থাকে। সাপের বিষও সে ক্ষরণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। ক্ষতস্থানে সাপের বিষদাঁত অনেক সময় লেগে থাকে; বলা বাহুল্য তা' তুলে ফেলতে হবে। ক্ষতস্থান যে চিরবে, তার হাতে যেন কোন ঘা না থাকে। ঘা থাকলে তার দেহের রক্তের সঙ্গে বিষ-মিশ্রিত রক্ত মিশে তার ক্ষতি করতে পারে।

পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেট রাসায়নিক দ্রব্য—ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এই জিনিসটি পরিষ্কার জলে গুললে জলের রং হয় বেগুনে-লাল। ক্ষতস্থান চিরে রক্ত বের ক'রে দেওয়ার পর পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের মাত্র কয়েকটি দানা বেশ খানিকটা পরিষ্কার জলে গুলে সেই জল দিয়ে ভাল ক'রে ঐ জায়গাটা ধুয়ে ফেলতে হয়। সাপের বিষ পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের সংস্পর্শে এলে নষ্ট হয়ে যায়। রক্ত বের ক'রে দেওয়ার পরও ক্ষতস্থানে যদি সাপের বিষ থেকে থাকে, তা' হলে তা' পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেট দেওয়ায় ক্ষতস্থানের কলা নষ্ট হয়ে স্তরের মত সৃষ্টি হতে পারে এবং রক্তের সঙ্গে বিষ বের হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে —এই আশঙ্কায় পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহারের কেউ কেউ পক্ষপাতী নন। আমাদের দেশের পল্লী-অঞ্চলের অবস্থা বুঝে পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের ব্যবহারের কথা বললাম। কিন্তু সব সময়ে পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ খুব পাতলা হওয়া দরকার। বেশী দানা দিয়ে গাঢ় দ্রবণ যেন তৈরি করা না হয়। এক শতাংশ পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ তৈরি করতে হবে। পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের দানা সরাসরি ক্ষতস্থানে দেওয়া তো কোনক্রমেই উচিত নয়। এ ভুল অনেকে ক'রে থাকেন। সাপের উপদ্রবের সময় পল্লীবাসীদের গৃহে পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেট বাক্স-বন্দী ক'রে রেখে দেওয়া উচিত। প্রয়োজনের সময় নিজের ও অপরের কাজে আসবে। রবারের নলও খানিকটা যোগাড় ক'রে রেখে দেওয়া উচিত। দংশনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন দেওয়ার সুবিধা হবে। পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেট হাতের কাছে নেই। রক্ত বের ক'রে দেওয়ার পর শুধু পরিষ্কার জলে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে।

তারপর তুলোর ওপর পরিষ্কার নেকড়া জড়িয়ে ছোট পুঁটলি

তৈরি ক'রে ক্ষতস্থানের ওপর বসিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে দিতে হবে। হাতের কাছে ঘা শুকনোর কোন মলম থাকলে পুঁটলি বসাবার আগে লাগিয়ে দিতে হবে। আয়াপানের পাতায় গরম ঘি মাখিয়ে পল্লীবাসীরা ক্ষতস্থানে বসিয়ে দেয়; এতে ক্ষতস্থান শুকিয়ে যায়। কোন মলম হাতের কাছে না থাকলে আয়াপানের পাতা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেওয়া যায়। তারপরও যদি ক্রমাগত রক্ত পড়তে থাকে, তা' হলে কি করতে হবে? ক্ষতস্থান খুব বেশী রকম চেরাতে তা' ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে উরুর বা বাহুর ওপর শক্ত ক'রে বাঁধন দিতে হবে। তাতেই রক্ত পড়া বন্ধ হবে। তারপর ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে।

পা ও হাত ছাড়া দেহের অন্য কোন অংশে সাপে দংশন করলে ঠিকমত বাঁধন দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ক্ষতস্থান অপেক্ষাকৃত গভীরভাবে চিরে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত বের ক'রে দেহের ভেতরের বিষ বের ক'রে দেওয়াই হ'ল একমাত্র পথ। বাঁধন দেওয়াতে বিষ ছড়িয়ে পড়তে পারে না, বেশী রক্ত বের করতেও হয় না। কিন্তু যেখানে বাঁধন দেওয়ার উপায় নেই, সেখানে বেশী রক্ত বের করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় নি। সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে রক্তের সঙ্গে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। চিকিৎসকও এসে পৌঁছয় নি। কি করা যাবে? সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাটে বা পরিষ্কার কোন স্থানে শুইয়ে দিতে হবে। দেহ গরম রাখার উদ্দেশে ক্ষতস্থান আর মুখ ছাড়া সব জায়গায় কাপড়-মুড়ি দিয়ে দিতে হবে। গরম দুধ, চা বা কফি খেতে দেওয়া যেতে পারে। স্মেলিং সল্ট শোঁখানোও যেতে পারে। সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে তাকে শুয়ে থাকতে হবে।

কাউকে সাপে দংশন করলে কি কি প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, সংক্ষেপে পুনরায় তা' বলি—প্রথমতঃ দিতে হবে

বাঁধন। দ্বিতীয়তঃ পরিষ্কার জল বা আয়োডিন-মেশানো জল দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে। তৃতীয়তঃ সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেন ভীত না হয়ে পড়ে—তাকে জোর দিয়ে বলতে হবে মরণের ভয় নেই। চতুর্থতঃ দেখতে হবে, মারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করেছে কিনা। পঞ্চমতঃ ক্ষতস্থান কেটে রক্ত বের ক'রে দিতে হবে। ষষ্ঠতঃ পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে।

এখন কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলি যা' ঠিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-সম্মত না হলেও অবস্থাবিশেষে এমন কি প্রাণও রক্ষা করে।

মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করেছে অথবা দংশন করেছে ব'লে সন্দেহ হয়েছে। ক্ষতস্থানে বাঁধন দেওয়ার উপায় নেই। সেই মুহূর্তেই ক্ষতস্থান চিরে রক্ত বের ক'রে দেওয়ার কোন অস্ত্রও কাছে নেই। অন্য কোন ব্যবস্থাও নেওয়া যাচ্ছে না। কি করা যাবে? হাতের কাছে জ্বলন্ত কয়লা আছে। জ্বলন্ত কয়লাটি সেই মুহূর্তেই ক্ষতস্থানে চেপে ধরা যেতে পারে। তপ্ত লোহাও ক্ষতস্থানে তখনই চেপে ধরা যেতে পারে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ক্ষতস্থান সেই মুহূর্তেই পুড়িয়ে দেওয়াও যেতে পারে। যেসব সাপুড়ে সাপ ধ'রে বেড়ায়, সাপে দংশন করলে তারা সাধারণতঃ এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ক্ষতস্থানে মুখ লাগান সম্ভব। ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে প্রাণপণে চোষা যেতে পারে। চুষে রক্তের সঙ্গে বিষ বের ক'রে দিতে হবে। বারবার চুষতে হবে। একবার চুষে মুখের থুথু বা রক্ত ফেলে দিতে হবে। আবার মুখ লাগিয়ে চুষতে হবে। নিজের পক্ষে ক্ষতস্থানে মুখ লাগান সম্ভব হচ্ছে না। সর্পদষ্ট ব্যক্তির কোন আত্মীয় বা বন্ধু ঝুঁকি নিতে পারে। তার হয়ে তারা ক্ষতস্থান চুষে রক্ত বের ক'রে দিতে পারে। কোনভাবে সাপের বিষ পেটে গেলে মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় না। রক্তের সঙ্গে

মিশলেই তবেই সাপের বিষের বিষত্ব প্রকাশ পায়। তবে ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে যে রক্ত শোষণ ক'রে নেবে, তার ঠোঁটে দাঁতে গলায় বা পাকস্থলীতে যেন ঘা না থাকে। সেক্ষেত্রে সাপের বিষ তার রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। অতীতে আমাদের দেশে স্থানে স্থানে সরকার থেকে মাইনে-করা লোক নিযুক্ত ক'রে রাখা হ'ত। কাউকে সাপে দংশন করলে তারা গিয়ে তার ক্ষতস্থান চুষে দিত।

সর্প-দংশন পেটিকা: আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে প্রতি স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে একটি ক'রে সর্প-দংশন পেটিকা রাখা উচিত। পল্লীর যাঁরা বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি তাঁদেরও উচিত একটি ক'রে সর্প-দংশন পেটিকা রাখা। সর্প-দংশন পেটিকায় এই জিনিসগুলি থাকবে: (ক) কয়েকটি নরম রবারের নল (খ) একপাশ ধারাল গুটিকয়েক ফলা (সেফটি-রেজরের ফলা যেমন) (গ) সর্প-দংশন চিকিৎসার উদ্দেশে তৈরী রক্ত-শোষণ যন্ত্র, অভাবে প্ল্যাসটিকের বা কাঁচের চোঙা (ঘ) পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের দানা (ঙ) টিংক্চার আয়োডিন (চ) খানিকটা পরিস্রুত জল (ছ) ক্ষত শুকনোর মলম (জ) কয়েকটি বন্ধন-পট্টি ও তুলো (ঝ) বিবর্ধক কাঁচ (ঞ) দেশলাই ও মোমবাতি (ট) অন্ততঃ দুটি প্রতিবিষ ওষুধ ইনজেকশন।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন সেবাব্রতী ব্যক্তি বা সরকারী কর্মচারী কাজের প্রয়োজনে পল্লী-অঞ্চলে গেলেন। তাঁকে আর ফিরে আসতে হ'ল না—সাপের দংশনে তাঁর প্রাণ গেল। এই সব সেবাব্রতী ব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারীর উচিত, পল্লী-অঞ্চলে সফরের সময় একটি সর্প-দংশন পেটিকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। তা' হলে হঠাৎ সাপে কামড়ালে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করতে পারবেন।

———

গ্রন্থে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ইংরেজীতে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ

অংশুশির-বোড়া : ত্রিপত্রকম্ অংশুশিরম্ : *Trimeresurus mucros--quamatus*

অংসফলক : shoulder-blade

অঙ্কতল-আঁশ : ventrals

অঙ্গুরিগ্রীব গণ : অঙ্গুরিগ্রীবম্ : ring-necked snakes : Diadophis

অঙ্গুরি-জলসাপ : নারব্যালম্ অঙ্গুরীয়াঙ্কিতম্ : ringed snake : *Natrix natrix.*

অঙ্গুরি-নলক : নলকম্ অঙ্গুরীয়াঙ্কিতম্ : *Anilius scytale*

অণ্ডখাদক উপগোত্র : অণ্ডখাদকে : egg-eating snakes : Dasypeltinae

অণ্ডজ : oviparous

অণ্ডাশয় : ovary

অধিজিহ্বা : epiglottis

অনাক্রম্য : immune

অন্ত্র : intestine

অন্ধ-উভচর : caecilian

অন্ধক গণ : অন্ধকম্ : Typhlops

অন্ধক গোত্র : অন্ধকাঃ : blind snakes : Typhlopidae

অন্ধ-জ্যেষ্ঠী : blind worm : slow worm

অন্য-অকর্ণ বোড়া : অকর্ণম্ অন্যম্ : McMahon's viper : *Eristicophis mcmahoni*

অন্য-ত্রিপত্রক বোড়া : ত্রিপত্রকম্ অন্যম্ : Gray's viper : *Trimeresurus erythrurus*

অন্য-দণ্ডক : দণ্ডকম্ অন্যম্ : *Tarbophis rhinopoma*

অন্ধ-প্রবাল-সাপ : প্রব্যালম্ অন্ধম্ : Macclelland's coral snake : *Callophis macclellandi*

অন্ধ-হেমাভ : হেমাভম্ অন্ধম্ : *Chrysopelea paradisi*

অপচিত গণ : অপচিতম্ : Contia

অপজাত : degenerate

অপর-অন্ধক : অন্ধকম্ অপরম্ : *Typhlops porrectus*

অপর-উপান্ধক : উপান্ধকম্ অপরম্ : Leptotyphlops blanfordi

অপর-ত্রিপত্রক বোড়া : ত্রিপত্রকম্ অপরম্ : Jerdon's viper : *Trimeresurus jerdoni*

অপর-বৃকদন্তী : বৃকদন্তি অপরম্ : Beddome's wolf snake : *Lycodon travancoricus*

অপরাজিত গণ : অপরাজিতম্ : Lachesis

অবনেত্র-আঁশ : subocular scale

অবপুচ্ছ-আঁশ : subcaudals

অবসারণী : cloaca

অবসারণী-আঁশ : anal

অবসারণী-ছিদ্র : vent

অবসারণী-ছিদ্র গ্রন্থি : anal gland

অভিযোজন : adaptation

অভিস্রবণ : osmosis

অমেরুদণ্ডী : invertebrate

অমূজ গণ : অমূজম্ : pseudechis

অ্যানাকণ্ডা : হস্তিপদম্ স্থূলতমম্ : Anaconda : *Eunectes murinus*

অ্যাফ্রিকীয় অণ্ডখাদক : অণ্ডখাদকম্ অ্যাফ্রিকীয়ম্ : African egg-eater : Dasypeltis scaber

অ্যাফ্রিকীয় পাহাড়ী ময়াল : মহাকালম্ অ্যাফ্রিকীয়ম্ : African rock python : *Python seboe*

অর্ককীর গণ : অর্ককরম্ : sand snakes : Psammophis

অর্ধবৃত্ত নালী : semi-circular canal

অশ্বনাল-বোড়া : ত্রিপত্রকম্ নালীয়ম্ : horse-shoe viper : *Trimeresurus strigatus*

অহুস্ব : অহুস্বম্ : Calabaria

আন্দামানীয় বোড়া : ত্রিপত্রকম্ দ্বৈপায়নম্ : Cantor's viper : *Trimeresurus cantori*

আপুরক গণ : আপূরকম্ : Pseudoxenodon

আমেরিকীয় প্রবাল গণ : মনোহারকম্ : American coral snakes : Micrurus

ইনী সাপ : কর্দম্ অপরম্ : Siebold's water-snake : *Enhydris sieboldi*

ইরানীয় উপশৃঙ্গী বোড়া : উপশৃঙ্গি ইরানীয়ম্ : Perso-Baluch horned viper : *Pseudocerastes persicus*

উগ্রবিষ সামুদ্র-সাপ : বারীশসর্পম্ খরবিষম্ : *Enhydrina schistosa*

উড়ুক্কু সাপ : flying snake

উদ্বায়ী : volatile

উন্নতনাসা উপান্ধক : উপান্ধকম উন্নতনাসিকম্ : *Leptotyphlops macrorhynchus*

উপকাল উপগোত্র : মহোরগে : boas : Boinae

উপকাল গণ : মহোরগম্ : Boa

উপগোত্র : subfamily

উপনাগ গণ : উপনাগম্ : Pseudohaje

উপপ্রজাতি : subspecies

উপফণী গণ : উপফণি : Macropisthodon

উপবৃত্তাকার : elliptical

উপমাংসী উপগোত্র : আঁচিল উপগোত্র : উপমাংসলে : wart snakes : rasp-skinned snakes : Acrochordinae

উপান্ধক গণ : উপান্ধকম্ : Leptotyphlops

উপান্ধক গোত্র : উপান্ধকাঃ : Leptotyphlopidae

উভচর : amphibian

উরঃফলক : breast-bone

উরগ গণ : উরগম্ : chicken snakes : Elaphe

উষ্ণমণ্ডল : গ্রীষ্মমণ্ডল : tropics : torrid zone

উর্ধ্বাক্ষিকা অস্থি : supraorbital bone

উর্ধ্ব-ওষ্ঠ-আঁশ : supralabials : upper-lip-shields

উর্ধ্বনেত্র আঁশ : supra-ocular scales

একক-প্রবাল-সাপ : প্রব্যালন্ একক‌ম্ : Bibron's coral snake : Callophis bibroni

একক-বেলন বোড়া : বেল্লনম্ এককম্ : Fea's viper : *Azemiops feae*

এড়ো : transverse

এড়োরেখা নাগ : নাগম্ সামান্তম্ রেখাদি : *Naja naja oxiana*

এলাপত্রক গণ : এলাপত্রকম্ : Liopeltis

কপাটিকা : valve

কম্বল : কম্বলম : Charina

কম্বোজ : molusc

করেত গণ : কিরাতম্ : kraits : Bungarus

কর্কোটক গণ : কর্কোটকম্ : Echis

কর্দম-সাপ গণ : কর্দম্ : Enhydris

কর্ণপটহ : eardrum

কর্ণমূল গ্রন্থি : parotid gland

কলা : tissue

কশেরুকা : vertebra

কাকার : barking deer

কাকোদর : কাকোদরম্ : Dryocalamus

কাঁকনবালা : কিরাতম্ এককম্ : north-eastern hill krait : Bungarus bungaroides

কাড : বৈড়ালম্ সামান্তম্ : common Indian cat snake : Indian gamma snake : *Boiga trigonata*

কাণ্ডকার : কাণ্ডকারম্ : Pacific boas : Enygrus

কালনাগিনী : হেমাভম্ অলংকৃতম্ : ornate snake : *Chrysopelea ornate*

কালাচ : কিরাতম্ সামান্যম্ : common krait ; Bungarus caeruleus

কাশ্মীরী-বোড়া : বোড্রম্ কাশ্মীরীয়ম : Levantine viper : *Vipera lebetina*

কীলক : spine

কীলক-পাত : wedge shield

কুকরি গণ : অপদস্থি : kukri snakes : Oligodon

কুকুরমুখী গণ : সারমেয়ম্ : Cerberus

কুব্জনাসা-বোড়া : পিঠরকম্ কুব্জনাসিকম্ : hump-nosed viper : *Ancistrodon hypnale*

কুব্জপৃষ্ঠ সাপ : keel-backs

কুম্ভোদর : কুম্ভোদরম্ : Pseudoboa

কুলক গণ : কুলকম্ : green snakes : Opheodrys

কুলিক গণ : কুলিকম্ : Epicrates

কূলবর্তী-সাপ উপগোত্র : কূলজে : Laticaudinae

কৃশ-প্রবাল-সাপ : প্রব্যালম্ কৃশম্ : slender coral snake : *Callophis melanurus*

কৃষ্ণ করেত : বড় কৃষ্ণ করেত : কিরাতম্ কৃষ্ণম্ : black krait : greater black krait : *Bungarus niger*

কৃষ্ণপীত অন্ধক : অন্ধকম্ কৃষ্ণপীতম্ : *Typhlops punctatus*

কেউটে : নাগম্ সামান্যম্ কৃষ্ণাদি : monocled cobra : *Naja naja kaouthia*

কেশকীট : hair-worm ; Gordius worm

কৈলাসক গণ : কৈলাসকম্ : Sibynophis

কোটরক গণ : কোটরকম্ : Lexocemus

কোটরসন্ধি : ball and socket joint

কোষ : cell
কোষ প্রাচীর : cell wall
ক্রিয়াশীল প্রত্যঙ্গ : functional limb
ক্ষারীয় : alkaline
ক্ষিপ্রক গণ : ক্ষিপ্রকম্ : Demansia
ক্ষুপ গণ : ক্ষুপম্ : Acanthophis
ক্ষেমক গণ : ক্ষেমকম্ : Zaocys
খর্ব অন্ধক : অন্ধকম্ খর্বম্ : *Typhlops oligolepis*
খাঁজকাটা : grooved
খাঁজকাটা বিষদন্তী সাপ : opisthoglypha
খাড়া : vertical
খাতগর্ত : canaliculate
খাসীয় ভিন্নচর্মক : পুচ্ছানুলিতম্ খাসীয়ম্ : *Stoliczkaia khasiensis*
খোলকধারী গেঁড়ি : snail
খোলকহীন গেঁড়ি : slug
গণ : genus
গাঢ়তা : density
গিরগিটি-আদি প্রাণী : lizard
গিরিবাসী বোড়া : ত্রিপত্রকম্ গিরিবাসি : mountain pit viper : large-spotted viper : *Trimeresurus* monticola
গিরিবাসী শম্বুকখাদক : পরমুণ্ডম্ গিরিবাসি : *Pareas monticola*
গেছোবোড়া : ত্রিপত্রকম্ দূর্বীয়ম্ : common green tree viper : bamboo pit viper : *Trimeresurus gramineus*
গোখরো : নাগম্ সামান্যম্ সামান্যম্ : spectacled cobra : *Naja naja naja*
গোত্র : family
গোল দ্বীপ : Round Island
গ্রাসনালী : gullet
গ্রীষ্মমণ্ডল : torrid zone : tropics

গ্রীষ্মতন্দ্রা : গ্রীষ্মনিদ্রা : aestivation

ঘণ্টাকৃতি-পাত্র : bell jar

ঘরচিতি : বৃকদন্তি সামান্যম্ সামান্যম্ : common wolf snake : *Lycodon aulicus aulicus*

চক্রধর সাপ : নাগম্ সামান্যম্ : common Indian cobra : *Naja naja*

চঞ্চু-আঁশ : rostral : beak-shield

চণ্ড : চণ্ডম্ : Aspidites

চন্দ্রবোড়া : বোড়ম্ চান্দ্রম্ : Russel's viper : *Vipera russelli*

চাবুক-সাপ গণ : উগ্রতনাসা গণ : উগ্রসম্ : whip snakes : Dryophis

চিত্র-ময়াল : মহাকায়ম্ চিত্রিতম্ : reticulated python : Python reticulatus

চিবুক-আঁশ : mental : chin-shield

চিবুক-খাঁজ : mental groove

চিবুক-দাঁত : mandibular teeth

চিমনি (ইলেকট্রিক) : bulb

চোঙা : funnel

চোয়াল : jaw

ছেদক দন্ত : canine teeth

ছোট কৃষ্ণ করেত : কিরাতম্ অসিতম্ : lesser black krait : Bungarus lividus

জম্ভিকা-দাঁত : maxillary teeth

জরায়ুজ : viviparous

জলঢোঁড়া : নারব্যালম্ মীনখাদকম্ মীনখাদকম্ : checkered keelback : *Natrix piscator piscator*

জলসাপ গণ : নারব্যাল গণ : নারব্যালম্ : water snakes : Natrix

জাতিরূপ : type

জাভীয় ভিন্নচর্মক : ভিন্নচর্মকম্ জাভীয়ম্ : *Xenodermus javanicus*

জালক : capillaries

জালক গণ : জালকম্ : Notechis

জ্যাকবসন-অঙ্গ : Jacobson's organ

ঝিল্লী : membrane

ঝুমঝুমি গণ : সবিবরম্ : rattle snakes : Crotalus

ঝুমঝুমি সাপ : rattle snake

ডিম-দাত : egg-tooth

ডোরাবন্ধ-কুকরি : অপদন্তিনম্ সামান্যম্ : common kukri snake : banded kukri snake : *Oligodon arnensis*

ঢাল : shield

ঢেমনা : দৃঢ়াঙ্গম্ মূষকাশি : Indian rat snake : *Ptyas mucosus*

তরুণাস্থি : cartilage

তাপগ্রাহী : অনুষ্ণশোণিত : endothermic : cold-blooded

তাপমোচী : উষ্ণশোণিত : exothermic : warm-blooded

তালব-দাত : palate teeth

তালু : palate

তীক্ষ্ণচঞ্চু অন্ধক : অন্ধকম্ তীক্ষ্ণম্ : beaked blind snake : *Typhlops acutus*

তীক্ষ্ণদন্ত : rodent

তীক্ষ্ণনাসা বোড়া : পিঠরকম্ তীক্ষ্ণম্ : *Ancistrodon acutus*

ত্রিপত্রক গণ : ত্রিপত্রকম্ : Trimeresurus

তেঁতুলে-বোড়া : পিঠরকম্ হিমাচলীয়ম্ : common Himalayan viper : *Ancistrodon himalayanus*

দংশক গণ : দংশকম্ : Bitis

দণ্ডক গণ : দণ্ডকম্ : Tarbophis

দর্ভময় গণ : দর্ভময়ম্ : Atretium

দানাদার-গাত্র সাপ : জেব্রা-সাপ : উপমাংসলম্ কণাকারম্ : rasp-skinned water snake : *Acrochordus granulatus*

দীর্ঘ অন্ধক : অন্ধকম্ লম্বিতম্ : *Typhlops dinga*

দীর্ঘক : দীর্ঘকম্ : ringed pythons : Bothrochilus : Nardoana

দীর্ঘগ্রন্থি গণ : দীর্ঘগ্রন্থি : Maticora

দীর্ঘশল্ক গণ : দীর্ঘশকলি : Haplopeltura

দৃঢ়াঙ্গ-সাপ গণ : দৃঢ়াঙ্গম্ : rat snakes : Ptyas

দ্বি-উপশৃঙ্গী বোড়া : উপশৃঙ্গি দ্বি : two-horned viper : Smith's viper : *Pseudocerastes bicornis*

দ্বিনেত্র দৃষ্টি : binocular vision

দ্বিপদ নামকরণ : binominal nomenclature

দ্রবণ : solution

ধমনী : artery

নলক গণ : নলকম্ : Anilius

নলক গোত্র : নলকাঃ : Anilidae

নাগ গণ : নাগম্ : cobra : Naja

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল : temperate zone

নাসা-আঁশ : nasals

নাসানেত্র-আঁশ : loreals

নাসামধ্য-আঁশ : internasals

নিকোবরীয়-বোড়া : ত্রিপত্রকম্ নিকোবরীয়ম্ : *Trimeresurus labialis*

নিম্ন-ওষ্ঠ-আঁশ : infralabials ; lower-lip-shields

নিরক্ষরেখা : equator

নিরেট দাঁত : solid tooth

নিরেট-দাঁত সাপ : aglypha

নীরবাসী উপগোত্র : নীরবাসিনি : freshwater snakes : Homalopsinae

নীরবাসী গণ : নীরবাসি : Homalopsis

নীলডোরীয় সামুদ্র-সাপ : সিন্ধুজম্ নীলডোরীয়ম্ :. *Hydrophis cyanocinctus*

নীললোহিত মহাসর্প : মহাসর্পম্ নীললোহিতম্ : Amethystine snake : *Liasis amethistinus*

পঞ্জরাস্থি : rib

পট্টপুচ্ছক গণ : পট্টপুচ্ছকম্ : Uropeltis

পট্টপুচ্ছক গোত্র : পট্টপুচ্ছকাঃ : shield-tailed snakes : Uropeltidae

পন্নগ উপগোত্র : পন্নগে : Colubrinae

পন্নগ গণ : পন্নগম্ : racers : Coluber

পন্নগ গোত্র : পন্নগাঃ : colubrid snakes : Colubridae

পরনাগ গণ : পরনাগম্ : Boulengerina

পরমুণ্ড গণ : পরমুণ্ডম্ : Pareas

পরিগ্রাহী : prehensile

পর্ব : phylum

পশ্চাৎ-নেত্র-আঁশ : post-ocular scales

পশ্চাৎ-বিষদন্তী : rear-fanged

পশ্চাৎ-বিষদন্তী সাপ : rear-fanged snake : Opisthoglypha

পশ্চাৎ-মস্তক-আঁশ : পশ্চাৎ-ললাট-আঁশ : occipitals

পাকস্থলী : stomach

পাখনাওলা সাপ : সর্পকম্ পক্ষযুক্তম্ : tentacled snake : *Herpeton tentaculatum*

পাত : plate

পাথরে করেত : কিরাতম্ অন্যম্ : Wall's krait : *Bungarus walli*

পার্শ্ব-আঁশ : dorsals : costals

পিচকারি : syringe

পিঠরক গণ : পিঠরকম্ : Ancistrodon

পিণ্ড উপগোত্র : পিণ্ডে : Bolyerinae

পিণ্ড গণ : পিণ্ডম্ : Bolyeria

পিণ্ডারক গণ : পিণ্ডারকম্ : Psammodynastes

পুঁয়ে সাপ : অন্ধকম্ সামান্যম্ : common blind snake : *Typhlops braminus*

পূর্বাঞ্চলীয় বৈড়াল-সাপ : বৈডালম্ বিশেষম্ : eastern gamma snake : *Boiga gokool*

পূর্বাঞ্চলীয়-বোড়া : ত্রিপত্রকম্ পূর্বাঞ্চলীয়ম্ : *Trimeresurus popeorum*

পৃষ্ঠ্য-আঁশ : vertebrals : spinals

পৃষ্ঠ্য-গ্রন্থি : dorsal gland

প্রকার : variety

প্রজনন ঋতু : breeding season

প্রজাতি : species

প্রতিবর্তী ক্রিয়া : reflex action

প্রতিবিষ ওষুধ : antivenin

প্রতিবিষ মস্ত : antivenin serum

প্রবাল গণ : প্রব্যালম্ : coral snakes : Callophis

প্রস্থশীর্ষ গণ : প্রস্থশীর্ষম্ : Dipsas

প্রাক্-ঊর্ধ্বিকা : pre-maxillary

প্রাগ্‌নেত্র-আঁশ : preocular scales

প্রাগ্‌ললাট-আঁশ : prefontal

প্রাথমিক চিকিৎসা : first aid

ফুৎকারা সাপ : দংশকম্ ফুৎকারি : puff adder : *Bitis arietans*

ফুরসা : কর্কোটকম্ বিবর্ণম্ : saw-scaled viper : *Echis carinatus*

ফুসফুস-ধমনী : pulmonary artery

বড়-আঁশ বোড়া : ত্রিপত্রকম্ বৃহৎশকলি : large-scaled viper : *Trimeresurus macrolepis*

বন্ধন-পট্টি : bandage

বর্গ : order

বহুপট্টিত করেত : কিরাতম্ পট্টিতম্ : many-banded krait : *Bungarus multicinctus*

বর্ণবিকাশী সাপ : ভিন্নশল্কম্ চকমকম্ : sunbeam snake : iridescent earth-snake : *Xenopeltis unicolor*

বর্ণসংকর : hybrid

বাগযন্ত্র : larynx

বাদামী চাবুক-সাপ : উন্নতম্ পীতধূসরম্ : brown whip-snake : *Dryophis pulverulentus*

বামন ঝনঝনী গণ : ঝনকম্ : Sistrurus

বালিশিথ গণ : বালিশিথম্ : Lytorhynchus

বালু-উপকাল : বালু-সাপ : সিকতিলম্ : sand boas : Eryx

বালু-বোড়া : সিকতাচরম্ : Cerastes

বিচিত্র চাবুক-সাপ গণ : উরসম্ আহরিতম্ : *Dryophis prasinus*

বিচিত্রশল্কক গোত্র : ভিন্নশল্ককাঃ : Xenopeltidae

বিনাগ গণ : বিনাগম্ :Hemachatus

বিবরক গণ : বিবরকম্ : gopher snakes : indigo snakes : Drymarchon

বিবরহীন বোড়া উপগোত্র : বোড্রে : true vipers : Viperinae

বিবর্ধক কাঁচ : magnifying glass

বিয়োজন : decomposition

বিরাম-ঘড়ি : stop-watch

বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা : World Health Organisation

বিষগ্রন্থি : poison gland

বিষদাঁত : poison fangs

বিষনালী : duct

বিষহীন সাপ : non-poisonous snakes : Aglypha

বিস্তৃত-সামুদ্র-সাপ : হগরম্ বিস্তৃতম্ : *Pelamis platurus*

বীক্ষণাগার : laboratory

বৃকদন্তী গণ : বৃকদন্তি : wolf snakes : Lycodon

বৃক্ষবাসী বোড়া গণ : বৃক্ষবাসি : Atheris

বৃত্তক গণ : বৃত্তকম্ : Oxyuranus

বৃত্তচিহ্নিত পট্টপুচ্ছক : পট্টপুচ্ছকম্ বৃত্তচিহ্নিতম্ : *Uropeltis ocellatus*

বেতআছড়া : ব্রঞ্জপৃষ্ঠম্ বিশেষম্ : painted bronze-back : *Ahaetulla ahaetulla*

বেত্রক গণ : বেত্রকম্ : Masticophis

বেলেসাপ : সিকতিলম্ ভুগ্নপুচ্ছম্ ভুগ্নপুচ্ছম্ : John's earth snake : John's sand boa : Eryx johni johni

বেষ্টক গণ : বেষ্টকম্ : garter snakes : Thamnophis

বৈড়াল সাপ গণ : বৈড়ালম্ : cat snakes : broad-headed tree snakes : Boiga

বোড়া গণ : বোড়ম্ : viper : Vipera

বোড়া গোত্র : বোড়াঃ : solenoglypha : Viperidae

ব্রঞ্জপৃষ্ঠ-সাপ গণ : ব্রঞ্জপৃষ্ঠম্ : bronze-backs : Ahaetulla

ভারতীয় অণ্ডখাদক : কুটরম্ ভারতীয়ম্ : Indian egg-eater : *Elachistodon westermanni*

ভিন্নচর্মক উপগোত্র : ভিন্নচর্মকে : Xenodermine snakes : Xeno-derminae

ভুজঙ্গ গণ : ভুজঙ্গম্ : Elaps

ভুজঙ্গ গোত্র : ভুজঙ্গাঃ : proteroglypha : Elapidae

ভূনিম্নবাসী : burrowing

ভূনিম্নবাসী বোড়া গণ : বিবরস্থি : burrowing vipers : Atractas-pis

ভূমিবাসী উপকাল : ভৌমিকম্ : ground boas : Tropidophis

ভেক : frog

মণ্ডূক : toad

মধ্যললাট-আঁশ : মধ্যকপাল-আঁশ : parientals

ময়াল : মহাকালম্ ভারতীয়ম্ : Indian python : rock python : Python molurus

ময়াল গণ : মহাকালম্ : Python

মরণ-সংকোচ : rigor mortis

মস্তু : রক্তমস্তু : serum

মহাকাল উপগোত্র : মহাকালে : pythons : Pythoninae

মহাসর্প : মহাসর্পম্ : Liasis

মহোরগ গোত্র : মহোরগাঃ : Boidae

মাড়ি : gum

মারাত্মক বিষধর : deadly venomous

মালয়েশীয় বোড়া : পিঠরকম্ মালয়েশীয়ম্ : Malayan pit viper : *Ancistrodon rhodostoma*

মালাবারীয় বোড়া : ত্রিপত্রকম্ মালাবারীয়ম্ : *Trimeresurus malabaricus*

মাল্যপিণ্ডক গণ : মাল্যপিণ্ডকম্ : Coronella

মুখাবয়ব বিবর : facial pit : loreal pit

মৃত্তিকা সাপ : earth snakes

মৃত্যুকর মাত্রা : lethal dose

মেক্সিকীয় বোড়া : পিঠরকম্ দ্বিরেখম্ : Mexican moccasin : *Ancistrodon bilineatus*

মেটেলি সাপ : কলম্ সামান্যম্ : Schneider's water-snake : *Enhydris enhydris*

মেরুদণ্ডী : vertebrate

ম্যাম্বা গণ : বিটপম্ : Dendroaspis

যকৃৎ : liver

রক্তবংশী : উরগম্ দণ্ডরেখম্ : copperheaded rat snake : *Elaphe radiata*

রক্তকণিকা : blood corpuscle

রক্তক্ষরণ : hemorrhage

রক্ততঞ্চন : clotting of blood

রক্তপুচ্ছ নলক : মণ্ডলম্ রক্তপুচ্ছম্ : red-tailed pipe snake : *Cylindrophis refus*

রক্ত-সংবহন : blood circulation

রক্তবাহ নালী : blood-vessel

রজ্জু : রজ্জু : Denisonia

রাজা-সাপ : রাজকম্ অরিবিনাশি : king snake : *Lampropeltis getulus*

রাজা-সাপ গণ : রাজকম্ : king snakes : Lampropeltis

রাত্রিচর বোড়া গণ : নিশাচরম্ : night adders : Causus

লপ্ত : লপ্তম্ : Morelia

লম্বাকার : elongate

ললাট-অাংশ : frontal

লাউডগা : উগ্রসম্ সামান্যম্ : common green whip snake : *Dryophis nasutus*

লাক্ষণিক : symptomatic

লালা : saliva

লেলিহান গণ : লেলিহানম্ : Dispholidus

শঙ্কু : cone

শঙ্কুপুচ্ছ-বেলেসাপ : সিকতিলম্ শঙ্কুপুচ্ছম্ : rough-scaled sand boa : Russel's earth snake : common earth snake : *Eryx conicus*

শঙ্খচূড় : নাগম্ উগ্রম্ : king cobra : hamadryad : *Naja hannah*

শম্বুকখাদক উপগোত্র : প্রস্থশীর্ষে : snail-eating snakes : blunt-headed snakes : Dipsadinae

শাখামুটি : কিরাতম্ বিশেষম্ : banded krait : *Bungarus fasciatus*

শিথিল-ভিন্নচর্মক : ব্যতিক্রমকম্ শিথিলম্ : *Nothopsis rugosus*

শির-করা : keeled

শিরা : vein

শীতস্তম্ভ : শীতনিদ্রা : hibernation

শূক : larva

শূকরনাসা গণ : বক্রনাসম্ : hog-nosed snakes : Heterodon

শৃঙ্গী ঝুমঝুমি : সবিবরম্ শৃঙ্গি : horned rattlesnake : sidewinder : *Crotalus* cerastes

শোষকাধার : desiccator

শ্বাসনালী : wind-pipe

শ্বেতওষ্ঠ বোড়া : শ্বেতওষ্ঠ ত্রিপত্রক বোড়া : ত্রিপত্রকম্ শ্বেতওষ্ঠম্ : *Trimeresurus albolabris*

শ্রোণীচক্র : pelvis

ষাঁড়-সাপ : গর্জকম্ : bull snakes : Pituophis

সংপীড়ক উপকাল : সংপীড়কম্ সংপীড়কম্ : boa constrictor : *Constrictor constrictor*

সংপীড়ক গণ : সংপীড়কম্ : Constrictor

সংবেদজ : sensory

সক্রিয় বিষদাঁত : functional poison fangs

সবুজ বোড়া : ত্রিপত্রকম্ দ্বিবর্ণম্ : green palm viper : *Trimeresurus bicolor*

সবিবর বোড়া উপগোত্র : সবিবরে : pit vipers : Crotalinae

সরীসৃপ : reptile

সর্প-দংশন পেটিকা : snake-bite kit

সাধারণ প্রবাল-সাপ : প্রব্যালম্ সামান্যম্ : common Indian coral snake : *Callophis nigrescens*

সামুদ্র-সাপ গোত্র : সিন্ধুজাং : sea-snakes : Hydrophiidae

সাহজিক প্রবণতা : instinct

সিংহলী কুব্জনাসা বোড়া : পিঠরকম্ সিংহলীয়ম্ : Ceylon hump-nosed viper : *Ancistrodon nepa*

সিতওষ্ঠ কুলক : কুলকম্ সিতওষ্ঠম্ : *Opheodrys* doriae

সিতপ্রান্ত উপান্ধক : উপান্ধকম্ সিতপ্রান্তম্ : *Leptotyphlops albifrous*

সিন্ধু-সাপ উপগোত্র : সিন্ধুজে : Hydrophiinae

সোনালী-বেতআছড়া : ব্রঞ্জপৃষ্ঠম্ ভারতীয়ম্ : common Indian bronze-back : *Ahaetulla* tristis

স্থূর : স্থূরম্ : Casarea

স্তন্যপ : mammal

স্নায়ু : ligament

স্বাদুজল : fresh water

স্বাদুজলবাসী সামুদ্র-সাপ : সিন্ধুজম্ অম্বুবাসি : *Hydrophis semperi*

হরিৎ মহাকাল গণ : আমহাকালম্ : green pythons : Chondropython

হস্তী-পদ গণ : হস্তিপদম্ : Eunectes

হস্তী-শুণ্ড সাপ : উপমাংসলম্ জাভীয়ম্ : elephant's trunk snake : Java wart snake : karung : *Acrochordus javanicus*

হিমমণ্ডল : frigid zone

হীরক-মহাকাল : লম্বম্ হীরকখচিতম্ : diamond python : carpet python : Morelia argus

হেমাভ-সাপ গণ : হেমাভম্ : Chrysopelea

হেলে : নারখ্যালম্ বিচিত্রম্ : striped keelback : Natrix stolata

ZOOLOGICAL GARDEN
CALCUTTA-27
ALIPORE

NO. 222(ZN)

প্রধান প্রধান সাপের নামের নির্ঘণ্ট

অ্যানাকণ্ডা—১৩, ৭৯, ১৮৪, ২০০

ইনী সাপ—২১৭

কাঁড় সাপ—২১২

কালনাগিনী—২৮, ৫৮, ৭২, ১০৫, ২০৮

কালাচ—২৮, ৩৯, ৭০, ১৫৭, ২০৯, ২৭০

কেউটে—৪৫, ৯০, ১৪৭, ২০৯

গোখরো—১৭, ২৮, ৩৯, ৮৯, ১৪৫

গেছোবোড়া—১৭৬, ২৭০

ঘরচিতি—৬, ২২, ২৪, ২৭, ৬৯, ২৩৩

চক্রধর—৩৭, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৭২, ৭৫, ৮০, ৮২, ৯০, ১৩৪, ২২৭, ২৫৫, ২৭০

চিত্র-ময়াল—৭৩, ১৮৪, ১৮৭, ২০১

চন্দ্রবোড়া—১৭, ২৮, ৩৭, ৫৪, ৬১, ৭৫, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ১৬৮, ২৭০

জলঢোঁড়া—৩, ৪, ২৪, ২৫, ৮৪, ২১৯

ঢেমনা—৬, ২৭, ৩৭, ৭২, ৭৩, ৮২, ৯০, ৯৫, ১৫১, ২২৪

পুঁয়ে—১৩, ৩৭, ৯৪, ২৪১

ফুৎকারী সাপ—৬১

ফুরসা—১৭৪, ২৭০

বেতআছড়া—৫৮, ৭২, ২১৫

বেলেসাপ—৭২, ২৩৭

ময়াল—২৪, ৫১, ৫৪, ৬১, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৫, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ৯৪, ১৮৪, ১৮৫

মেটেলি—৭২, ৭৩, ২১৭

রক্তবংশী—২৩২

লাউডগা—৬, ১২, ২৮, ৩৭, ৭২, ২০৪

শঙ্খচূড়—৭২, ৭৩, ১৪৮, ২৭০

শাঁখামুটি—৬, ৭, ১২, ২৩, ৭২, ১০৫, ১৬২, ২৭০

শৃঙ্গী ঝুমঝুমি সাপ—২২

হেলে—৬, ২৫, ২২২

ZOOLOGICAL
BOO